বিজ্ঞানী শতক

দেবব্রত রায় চৌধুরী

বিজ্ঞানী শতক

দেবব্রত রায়চৌধুরী

এ পি পি

১১৭ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

100 Great Scientists

by Debabrata Roy Chowdhury

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ : অশোকদীপক

অশোক রায় কর্তৃক এপিপির পক্ষে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এ পি প্রেস
১১৭ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

পঁচিশ টাকা

বিজ্ঞানী শতক

............হিপোক্রেটিস ....

(খ্রীঃ পূঃ ৪৬০—খ্রীঃ পূঃ ৩৭০)

গ্রীক পুরাণে, অ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসার দেবতা। অ্যাসক্লেপিয়াস ছিলেন তারই পুত্র। ফলে চিকিৎসা-শাস্ত্রে তিনি প্রচুর যশ ও ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনিই চিকিৎসকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হার্মিসের বা তার দণ্ডই চিকিৎসা-বৃত্তির প্রতীক। প্রাচীন গ্রীসে তাঁর সম্মানে মন্দির তৈরি হয়। সেখানে অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ লোকেরা তাঁর উদ্দেশ্যে শুয়োর বা ভেড়ার ছানা উৎসর্গ করত এবং তাদের আরোগ্য লাভের জন্য তাঁর শুভ প্রার্থনা করত। সেই সমস্ত মন্দিরের পুরোহিতরা মিলে একটা পুরোহিত-চিকিৎসকের শক্তিশালী সংঘ গড়ে তুলেছিল। তাদেরকে বলা হোত অ্যাসক্লেপিয়াড। সে সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল। তাকে তখন পবিত্র গুপ্ত তথ্যের মত রক্ষা করা হোত এবং শুধুমাত্র পিতার থেকে তার সন্তানে তা হস্তান্তরিত হোত।

হার্মিসের দণ্ড

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম এবং চতুর্থ শতাব্দী গ্রীক সভ্যতার একটা সুবর্ণ যুগ। সেই সময় সক্রেটিস, সফোক্লিস এবং প্লেটোর মত মহান দার্শনিক গ্রীসের আকাশে সূর্যের মত ভাস্বর ছিলেন। তাঁরা তখন মানুষ এবং বিশ্বের প্রকৃতির গবেষণায় মগ্ন। সেই সময়েই চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে তার প্রাচীন কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আনবার জন্য গ্রীসের আকাশে আরও এক তারকার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরই নাম হিপোক্রেটিস।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস কিন্তু ভগবান নন একজন মানুষ মাত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে অ্যাপিয়ান সাগরের কস দ্বীপের এক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রকৃত ভাবে খুব কমই জানা যায়। আপাত ভাবে তাঁর বাবা ছিলেন কসের এক জমকালো মন্দিরের পুরোহিত-চিকিৎসক সংঘের একজন সদস্য। প্রথা অনুযায়ী হিপোক্রেটিস তাঁর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুপ্ত তথ্যগুলো শিক্ষালাভ করেছিলেন। শিক্ষালাভের সময়েই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। এজন্য তাঁর বাবা তাঁর উৎকৃষ্ট

শিক্ষালাভের জন্য সাধ্যমত সেরা সেরা শিক্ষকদের নিযুক্ত করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ডেমোক্রিটাস ছিলেন একজন।

তাঁর শিক্ষকের মতোই তরুণ হিপোক্রেটিস প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি এথেন্সেও বহু বছর কাটান। এথেন্সে থাকা কালীন সময়ে তিনি নিজে চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চা করতেন এবং অপরকে তা শেখাতেন। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর সাথেও সাক্ষাত করেন। প্লেটো তাঁর লেখায় হিপোক্রেটিসকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন মহান শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই সম্বন্ধে একটা উক্তিও লিখে রেখে গেছেন, "শরীরের সম্পূর্ণ প্রকৃতি না জেনে কেউ শরীরের একটা অংশের প্রকৃতি জানতে পারে না।"

হিপোক্রেটিস জোর দিয়ে বললেন যে ডাক্তারদের উচিৎ, রোগ নয়, রোগীকে পরীক্ষা করা। সঠিক ডায়াগনোসিসের জন্য ডাক্তারদের অবশ্যই রোগীর সমস্ত কিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ জানা প্রয়োজন ; যেমন, রোগীর দৈনন্দিন জীবন, তার পেশা, তার পারিবারিক ইতিহাস, তার পরিবেশ ইত্যাদি। রোগীকে সুস্থ করতে, চিকিৎসকদের কর্তব্য (সব রকম ভাবে) তার প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। এই সমস্ত মতবাদ প্রচলন করে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সেই কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, ভ্রান্ত, মনগড়া, এলোমেলো চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মূলে কুঠারাঘাত করে আজকের আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজ বপন করেন।

হিপোক্রেটিস সেই সময়কার মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত ও চিকিৎসার প্রায় সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ বাতিল করে, হিউমোরাল (জীবদেহ নিঃসৃত রস সংক্রান্ত) মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে কোন মানুষের ভগ্নোদ্যম বা উৎসাহী, বদমেজাজী বা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ তার দেহে কি ধরণের হিউমোর (জীবদেহ নিঃসৃত রস) আছে—ঠাণ্ডা না গরম না শুষ্ক না আর্দ্র। তাঁর মতে মানুষের অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহার, অসুস্থতা, এমন কি তার মৃত্যুর কারণই হচ্ছে তার দেহের হিউমোরের কোন বড়-সড় পরিবর্তন—হয় বাড়া না হয় কমা।

এই হিউমোরাল মতবাদই দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেনের চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত মতবাদের ভিত হয়ে উঠেছিল এবং বহুকাল ধরে এটাই সর্বজন স্বীকৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস দৃঢ় ভাবে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রত্যেক রোগের একটা বিশেষ কারণ আছে এবং সেইমত তার বিশেষ চিকিৎসাও আছে। তিনি সর্বসমক্ষে গ্যালেনের লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলে হিউমোরাল থিয়োরীর উপর তাঁর ঘৃণা প্রদর্শন করেন। তবুও তার তিন'শ বছর পরেও মহান ফরাসী শরীরতত্ত্ববিদ্ ক্লড বারনার্ড, দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখতে হিউমোরের ভূমিকার কথা দৃঢ় ভাবে

প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং আজকের দিনেও এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং সুস্থতার জন্য রক্ত, লিম্ফ (লসিকা) এবং কোষাভ্যন্তরের তরল পদার্থ রাসায়নিক পদার্থগুলোর ডাইনামিক (গতীয়) সমতার প্রয়োজন। এইভাবে, রসায়ন শাস্ত্রের কোন জ্ঞান ছাড়াই হিপ্পোক্রেটিস চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর যে মতবাদের বীজ বুনেছিলেন দু' হাজার বছর পরে আজ তা ফলপ্রসূ হল।

যেহেতু প্রাচীন গ্রীসে শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য তখনকার দিনে অ্যানাটমি (অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা), ফিজিওলজি (শরীরতত্ব) এবং প্যাথোলজির (রোগবিদ্যা) জ্ঞান ছিল খুবই ভাসাভাসা। এসব সত্বেও হিপ্পোক্রেটিসের ফ্র্যাকচারস (অস্থি ভঙ্গ) এবং ডিসলোকেশনস (গ্রন্থিচ্যুত)-এর উপর লেখা বইগুলো থেকে হাড়, লিগামেন্ট (অস্থি-সন্ধি), পেশী এবং কন্ডরার আকৃতি এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে অসাধারণ আধুনিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিস্ময়কর ভাবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মত তিনিও হাড় ভাঙ্গা বা সরে যাওয়ার বেলায় ব্যান্ডেজ করা এবং স্প্লিনটিং (ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য কাঠের টুকরো দিয়ে বাঁধা) করার কথা নির্দেশ দেন। তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ শল্য-চিকিৎসার ওপরে একটা বইতে তিনি নিবীজতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে হিপ্পোক্রেটিস ও তাঁর ছাত্রদের লেখা বহু ডাক্তারী বই আলেকজান্দ্রিয়ার একটা লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সংগ্রহকে বলা হোত হিপ্পোক্রেটিক সংগ্রহ। বই-এর সংখ্যা ছিল সাতাশী। এই বইগুলো ডাক্তারী শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা ছিল।

হিপ্পোক্রেটিসের লেখা "অন দি স্যাক্রেড ডিসিস" বই থেকে মৃগীরোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তখনকার দিনে অনেক অজ্ঞ চিকিৎসকই মনে করতেন যে মৃগীরোগ মানেই তার ওপর কোন অসন্তুষ্ট ঈশ্বর বা শয়তান ভর করেছে। কিন্তু হিপ্পোক্রেটিস তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে মৃগীরোগ একটা রোগ এবং যতই ভয়ংকর হোক না কেন তার পেছনে একটা স্বাভাবিক কারণ আছে।

হিপ্পোক্রেটিস তার বইতে ডাক্তারদের কর্মবিধি সম্বন্ধে কতগুলো নিয়ম লিপিবদ্ধ করে যান। এগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান ছিল। বইয়ের ভূমিকায় লেখা ছিলঃ "জীবন খুব ছোট, কিন্তু বিদ্যা [চিকিৎসা] বিরাট; [রোগের প্রতিকারের] সুযোগ ক্ষণস্থায়ী; গবেষণা বিপজ্জনক এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব অসুবিধাজনক।" কিছু কিছু বাণী এখন যা আমরা দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহার করে থাকিঃ "একজনের কাছে যা অমৃত অপর একজনের কাছে তাই গরল।"

কিছু কিছু পদ্ধতিও এমন ছিল যা আজকের দিনেও আমাদের মায়েরা বাড়ীতে ব্যবহার করে থাকে, যেমন—হিক্কা বন্ধ করা।

হিপোক্রেটিসের মতেঃ "সকল কলার মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রই সবচেয়ে মহান। কিন্তু কিছু কিছু অজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্যই এটা সমস্ত বিদ্যার পেছনে রয়েছে।" তাঁর ছাত্রদের তাঁর কাছে একটা গোপন অঙ্গীকার করতে হোত। এই শপথ পরে "হিপোক্রেটিস শপথ" নামে পরিচিত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে আজও তা চলে আসছে! অদ্যাবধি ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করার পর নতুন ডাক্তারদের সর্বসমক্ষে এই শপথবাক্য উচ্চারণ করতে হয় এই বলে যে "সে তার জীবন এবং তার পেশাকে (ডাক্তারী) পবিত্র, নির্মল ও সুন্দর করে রাখবে।"

............অ্যারিস্টোটল............

(খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—খ্রীঃ পূঃ ৩২২)

লাইসিয়াম বাগানের গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অ্যারিস্টোটল খবরটার ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন। তাঁর শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত মুখের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কিন্তু তাঁর ভেতরে দুঃখ, তিক্ততা এবং ক্রোধের একটা মিশ্র অনুভূতির ঝড় বয়ে গেল। খবরটা ছিল এই রকম যে তাঁর এক সময়ের ছাত্র ম্যাসিডনের গ্রেট আলেকজাণ্ডার মারা গিয়েছেন। ফলে তখন ম্যাসিডোনিয়ান দাসত্বের বিরুদ্ধে এথেন্সে একটা বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছিল।

অ্যারিস্টোটল আবার চিঠির লেখাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগলেনঃ "প্রিয় বন্ধু", তিনি পড়তে লাগলেন, "এখানে এথেন্সে তোমার বিষম বিপদ। তোমার শত্রুরা জনগণকে ভীষণ ভাবে তোমার বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে যেহেতু তুমি আগে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলে। মনে রেখো, সক্রেটিসকেও কি রকম অন্যায় ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই জন্যই বলছি তুমি এখনই এথেন্স থেকে পালিয়ে যাও।"

ঘটনাটা খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ সালের। অ্যারিস্টোটলের বয়স তখন বাষট্টি। তিনি তখন তাঁর প্রিয় বিদ্যালয় ছেড়ে, যেখানে তিনি এক সময় তখনকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিছু দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ ইউবোয়িয়াতে পালিয়ে গেলেন।

অ্যারিস্টোটল খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ সালে স্ট্যাগিরায় জন্মগ্রহণ করেন। স্ট্যাগিরা

একটা ছোট্ট শহর, অ্যাপিয়ান সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তাঁর বাবা গ্রেট আলেকজাণ্ডারের পিতামহ ম্যাসিডনের রাজা অ্যামিনতাসের সভা-চিকিৎসক ছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর অভিভাবক এবং গৃহ-শিক্ষকের কাছ থেকে তখনকারের প্রচলিত গ্রীক শিক্ষাই লাভ করেন। বাবার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিকটবর্তী অ্যাপিয়ান সাগরের তীর থেকে জলজ জীবের বিভিন্ন রকমের নমুনা সংগ্রহ করতেন।

সতেরো বছর বয়সে এথেন্সের অ্যাকাডেমী থেকে তাঁর উচ্চতর শিক্ষা শুরু। সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন মহান দার্শনিক প্লেটো। প্লেটো অ্যারিস্টোটলের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তাঁহার নাম দেন "দি মাইন্ড অফ দি স্কুল" (বিদ্যালয়ের প্রতিভা)। পরের কুড়িটা বছর তিনি জ্ঞান লাভের জন্য প্লেটোর অ্যাকাডেমীতেই থেকে যান। অ্যাকাডেমীতে ছাত্ররা শুধুমাত্র এথেন্সের দর্শন, থিয়োরী এবং ধ্যান-ধারণাই নয় অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং নানান বৈজ্ঞানিক বিষয়ও চর্চা করত। প্লেটোর অন্যতম বিশিষ্ট কৃতি ছাত্র অ্যারিস্টোটল। কিন্তু প্লেটো এবং অ্যারিস্টো-টলের চিন্তাধারা ছিল বিপরীতমুখী। প্লেটো অংকশাস্ত্র এবং অবাস্তব চিন্তা-ধারায় বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জগত ছিল সম্পূর্ণ ভাবে স্থির, নিশ্চল। অপরদিকে অ্যারিস্টোটল অবাস্তব চিন্তাধারার বিরোধী তো ছিলেনই, উপরন্তু ভীষণ রকম বাস্তববাদী। তিনি দৃশ্যমান বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণে এবং জীব জগতের শ্রেণী বিভাগে বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জগত ছিল অপেক্ষাকৃত কম স্থির, কিন্তু বেশী গতিশীল এবং বেশী বিবর্ধিত।

খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ সালে, প্লেটোর মৃত্যুর পর অ্যারিস্টোটল, ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণে আলেকজাণ্ডারের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তখন আলেকজাণ্ডারের বয়স মাত্র চোদ্দ। অ্যারিস্টোটল ম্যাসিডোনে সাত বছর ছিলেন, কারণ তার পরেই তাঁর ছাত্র একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর গ্রেট আলেকজাণ্ডার রূপে পরিচিত হন।

অ্যারিস্টোটোলের ম্যাসিডোনিয়ায় চাকরী তাঁকে কিন্তু একটা বিরাট সুফল দান করে। অ্যালেকজাণ্ডার তাঁর জন্য বিরাট অংকের অর্থ মঞ্জুর এবং কিছু লোকও বহাল করেছিলেন যারা সারা রাজ্য ঘুরে জীব জগতের নমুনা সংগ্রহ করত এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর অ্যারিস্টোটলের কাছে প্রদান করত। তাদের এইসব বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই অ্যারিস্টোটল জীব বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি জীবদের আকারের জটিলতা, বংশ বৃদ্ধির পদ্ধতি এবং রক্তের প্রকৃতি বিচার বিবেচনা করে খুব সহজেই জীব

জগতের প্রজাতিগুলোকে আলাদা আলাদা করে ফেলতেন। তিনি জীব জগতের প্রায় একশ প্রজাতির জীবনের খুঁটিনাটির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি জীবদের আকার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানকে বাড়ানোর জন্য তাদের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করতেন। আঠারো শতাব্দীতে লিননেইয়াসের আগে পর্যন্ত অ্যারিস্টোটলের শ্রেণী বিভাগকেই অভ্রান্ত বলে গণ্য করা হোত। জীব বিজ্ঞানের ওপর অ্যারিস্টোটলের লেখা বই: "অন দি পার্টস অফ অ্যানিম্যালস" এবং "হিস্টোরী অফ অ্যানিম্যালস"।

ভূ-বিদ্যাতে, পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত আজও মোটামুটি যুক্তি সঙ্গত বলে গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মত: পর্যায়ক্রমে মাটির ওপরে পর্বতের সৃষ্টি, ক্ষয়, অনুভূমিক হওয়া এবং সাগরে মিশে যাওয়া।

আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসার পরে, অ্যারিস্টোটল আবার এথেন্সে ফিরে আসেন। এথেন্সে লাইসিয়ামে আজকের কলেজের মতো একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে সমান সমান ব্যবধানে তরুশ্রেণী এবং বাগান ছিল। তার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অ্যারিস্টোটল এবং তাঁর ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন। সেইজন্যে বিদ্যালয়টির নাম গ্রীক শব্দ "পেরিপেটোস" অর্থাৎ চলা এর অনুকরণে রাখা হয়েছিল "পেরিপেটেটিক স্কুল" (ইতস্ততঃ ভ্রমণরত বিদ্যালয়)।

মানবজাতির ইতিহাসে অ্যারিস্টোটলের মত বহুমুখী প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়। তিনি যুক্তি তর্কের বিজ্ঞানও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নাম "সিল্যাজিসম" (ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারা বিশেষ)। তাঁরই লেখা "অরগ্যানোন"-এ এগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তিনি মনস্তত্ব বিজ্ঞানকেও একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাপিত করেন। তার মধ্যে বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মানসিক চেতনা, স্বপ্ন ইত্যাদির বিশ্লেষণ ছিল।

অ্যারিস্টোটল প্রায় এক হাজার বই রচনা করেন। এগুলোর অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখা যা কিছু পাওয়া যায় তা অধিকাংশই তাঁর পেরিপেটিক স্কুলে দেওয়া বক্তৃতার টীকা অথবা স্মারকলিপি।

তাঁর সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রের উপর। এদের উপর তাঁর লেখা বইগুলো যথাক্রমে মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা) ও নিকোমেচিয়ান ইথিক্স (নীতিশাস্ত্র)। বইগুলোতে তিনি জীবন সম্বন্ধে তাঁর গতিশীল ধারণার মতই প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জীবন বিকাশের মাধ্যম দিয়েই একটা নির্দিষ্ট সীমার দিকে এগিয়ে যায়। এই একই রকম চিন্তাধারা

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর লেখা বই "পলিটিক্স"-এ প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞানেও বৃদ্ধি এবং বিবর্তনের থিয়োরী তাঁর বই "ফিজিক্স"-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্যেও বেশ প্রতিভা ছিল। আজকের দিনেও তাঁর কাব্যগুলো পড়ান হয়।

তাঁর জীব বিজ্ঞানের উপর তথ্যগুলো আজকের দিনেও স্থায়ী এবং সিদ্ধ, যেহেতু সেগুলোর ভিত ছিল বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা এবং পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা নিরীক্ষায় না গিয়ে তিনি কতকগুলো অযৌক্তিক ধারণা এবং খুব সীমাবদ্ধ কয়েকটা পর্যবেক্ষণের উপর যুক্তি দিয়ে তাঁর তথ্যগুলো খাড়া করেছিলেন।

অ্যারিস্টোটল এবং অন্যান্য গ্রীক বিজ্ঞানীরা কোন ঘটনাকে সূক্ষ্মভাবে না পর্যবেক্ষণ করেই তাঁরা ঘটনাটা কেন ঘটছে তার ওপর জোর দিতেন। সেই জন্যই অ্যারিস্টোটল স্বীকার করে নিলেন যে একটা ভারী বস্তু একটা হাল্কা বস্তুর থেকে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে মাটিতে পড়বে! তিনি এ বিষয়ে তাঁর তথ্যে বললেন যে সমস্ত ভারী বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়বার সময় একটা "স্বাভাবিক জায়গার" অনুসন্ধান করে এবং সেই "স্বাভাবিক জায়গায়" বস্তুটা খুব দ্রুত গতিতে পড়তে থাকে। কিন্তু কয়েকশো বছর পরে গ্যালিলিও পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন সকল বস্তুই (ভারীই হোক বা হাল্কাই হোক) অবাধ পতনকালে একই দ্রুততায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। অ্যারিস্টোটলের মতে শূন্যস্থান ছিল অসম্ভব, কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরে শূন্যস্থান তৈরি করতেও সাফল্য লাভ করেন। তাঁর মতে যে কোন বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির থাকে এবং গতিশীল করতে কোন বলের প্রয়োজন। কিন্তু পরে নিউটন প্রমাণ করেন যে, গতিশীল বস্তু সর্বদাই সমবেগে সরলরেখা অবলম্বন করে চলে। অ্যারিস্টোটল বিশ্বাস করতেন জগৎ চারিটি বস্তু (দৃশ্যমান) দ্বারা তৈরি ঃ জল, মাটি, বাতাস ও আগুন। কিন্তু পরে শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরীক্ষায় জানা যায় যে জগতের গঠন কত জটিল।

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। যেহেতু তাঁর পর্যবেক্ষণ-গুলোই ছিল ভুল, সেজন্য তার সিদ্ধান্তগুলোও ছিল বেঠিক। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুগুলো একধরণের জ্যামিতিক পথে ঘুরছে। চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কয়েক শতাব্দী পরে গ্যালিলিও, কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে এবং চাঁদ থেকে সূর্যের প্রতিফলিত আলোই পাওয়া যায়। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই।

অ্যারিস্টোটলের মেটাফিজিক্সের প্রথম উদ্ধৃতিই : "সমস্ত মানুষেরই প্রকৃতি অজানাকে জানার ইচ্ছে", এই ইচ্ছে তাঁর ভেতরেও ছিল এবং বিভিন্ন বিভাগেই তিনি জ্ঞানের সন্ধান করতেন। তাঁর বিরাট প্রতিভার জন্য, তাঁর তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলো (বেঠিক বা সঠিক যাই হোক না কেন) প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষ সেগুলোকে অভ্রান্ত এবং সঠিক বলে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। কোন সন্দেহই নেই যে তাতে জীব বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলোর প্রগতিকে খুব ব্যাঘাত করে। যাইহোক এটা অ্যারিস্টোটলের দোষ নয় যে মানুষ বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতে তাঁর মতবাদগুলো মেনে নিয়েছিল। যদি তাঁর আদর্শ বা উদাহরণের—"জানার ইচ্ছে", প্রতি মনোযোগী হোত তাহলে তারা তাঁর চরম সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে না নিয়ে, সেগুলোকে সংশোধন, পরিশোধন এবং বিবর্ধন করতে পারত।

............ইউক্লিড............

(খ্রীঃ পূঃ ৩৩০—খ্রীঃ পূঃ ২৭৫)

> Euclid alone has looked on Beauty bare............
> Let all who prate of Beauty hold their" peace........

উক্তিটা বিখ্যাত আমেরিকান কবি এডনা সেণ্ট ভিনসেণ্ট মিলে'র। কবি সমস্ত বিশ্ব এবং অসীম সৃষ্টির মধ্যে থেকে একমাত্র ইউক্লিডকেই পছন্দ করেছিলেন। তাঁকেই তিনি সৌন্দর্য্যের নির্যাস হিসেবে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। তিনি তাঁর কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এমন একজন মনীষীকে যিনি ছিলেন যুক্তি-বিদ্যার সৌন্দর্য্য, যিনি ছিলেন অংক শাস্ত্রের জগতের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যাঁর চিন্তাধারা ছিল ভীষণ যুক্তিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট। ক্ল্যাসিকাল গ্রীক সভ্যতা তার সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যবোধের জন্যই শ্রেষ্ঠ, যেমন তার ভাস্কর্য্য শিল্প, ঠিক তেমনই তার দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণাও। ইউক্লিডও ছিলেন এঁদেরই একজন যিনি অবরোহণ পদ্ধতিতে তথ্যগুলোকে বিন্যস্ত করবার সর্বোচ্চতম প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

ইউক্লিডের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। সম্ভবতঃ তিনি এথেন্সেই জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তারপরে মিশরের আলেক-জান্দ্রিয়ায় চলে যান। তখন আলেকজান্দ্রিয়া ছিল সভ্যতার একটা মহান কেন্দ্র।

সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং জ্যামিতির তত্ত্বগুলো শেখাতে থাকেন, যেগুলো আজও আমরা অনুসরণ করি। (আর্কিমিডিসের শিক্ষক কনোন তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন)। প্রাচীন লেখকেরা ইউক্লিডকে "একজন ভদ্র ও দয়ালু বৃদ্ধ লোক" হিসেবে উল্লেখ করেন।

তাঁর ছাত্রেরা তাঁর সহিষ্ণুতা এবং সদাশয়তার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তবুও তিনি কখনও কখনও দৃঢ়, স্থির সংকল্পও হতে পারতেন—এমন কি রাজার বেলায়ও। একবার ইজিপ্টের রাজা প্রথম টলেমি ইউক্লিডের জ্যামিতির পাঠ্য বই "এলিমেন্টস" পড়তে গিয়ে ভীষণ অসুবিধেয় পড়েছিলেন। তাঁর কাছে সবটাই কেমন দুর্বোধ্য লাগছিল। রাজা ইউক্লিডকে জিজ্ঞেস করেন, রাজাদের জ্যামিতি পড়বার এবং শেখবার কোন সহজ রাস্তা নেই? এর উত্তরে ইউক্লিড বলেছিলেন: "সম্রাট, জ্যামিতির দিকে রাজা দর যাবার আলাদা কোন রাজপথ নেই।"

ইজিপ্টবাসীরা তাদের জমি মাপতে এবং জরিপ করতে জ্যামিতি ব্যবহার করত। কারণ প্রত্যেক বছরেই নীলনদের বন্যায় তাদের জমির সীমানা ধুয়ে মুছে যেত। জ্যা শব্দের অর্থ ভূ অর্থাৎ পৃথিবী এবং মিতি শব্দের অর্থ পরিমাপ। সুতরাং জ্যামিতি শব্দের অর্থ পৃথিবীর পরিমাপ। অপরদিকে গ্রীকরা জ্যামিতির ব্যবহারিক প্রয়োগে আগ্রহী ছিল না। তারা যুক্তি এবং অবরোহন পদ্ধতির চর্চা হিসেবে জ্যামিতির উপপাদ্য ও তাদের প্রমাণগুলোই শিখত। একবার ইউক্লিডের এক ছাত্র তাঁকে অভিযোগ করল যে জ্যামিতি শিখে কোন বাস্তব সুবিধা বা লাভ হয় না। এই কথা শুনে ইউক্লিড তাঁর একজন চাকরকে রেগে বললেন, "এই বেটাকে কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে দাও এবং তাহলেই সে যা শিখেছে তার জন্য অবশ্যই উচিত মূল্য লাভ করবে।"

অংকশাস্ত্রে ইউক্লিডের দান অসামান্য। তিনি জ্যামিতিক সংস্করণ এবং পরিশোধন করে একটা সুবিন্যস্ত সুনিয়ন্ত্রিত আকার দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের পৃথক পৃথক তত্ত্বগুলোকে সহজ, সরল এবং পুনর্নবীকরণ করেন। তিনি জ্যামিতির উপপাদ্য এবং প্রমাণগুলোকে সুদৃঢ় যুক্তির ওপর খাড়া করেছিলেন। পুরোনো প্রমাণগুলোর সংস্করণ, নতুন নতুন প্রমাণের প্রচলনও করেছিলেন। তিনি, চাওসের হিপ্পোক্রেটস, থেলস এবং পিথাগোরাসের মত পূর্বসূরীদের তত্ত্বগুলোরও উন্নতি সাধন করেন।

ইউক্লিডের বই "এলিমেন্টস" প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। প্রায় দু' হাজার বছরেরও ওপর এই বইটাই জ্যামিতির ভিত্তিমূলক পাঠ্যবই হিসেবে পরিগণিত হোত। ১৫৭০ সালে স্যার হেনরী বিলিংসলী প্রথম এর ইংরজী অনুবাদ করেন।

"এলিমেণ্টস" তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। স্কুল-পর্যায়ে সাধারণত এর ছয়টি খণ্ডই পড়ান হয়। এলিমেণ্টসের" কিছু কিছু অংশ তাঁর ছাত্রেরা রচনা করেন। কিন্তু বেশীর ভাগটাই তাঁর রচনা। এছাড়াও সমস্তটার নির্দেশ এবং পরিকল্পনাও তাঁরই।

ইউক্লিড শুরু করেন অপরিহার্য রাশিগুলোর সংজ্ঞা দিয়ে, যেমন "সরলরেখা (দুই বিন্দুর মাঝের ন্যূনতম দূরত্ব), "বিন্দু", "ত্রিভুজ" প্রভৃতি। তারপর তিনি এই সম্বন্ধে চরম সত্য তত্ত্ব বা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলো আজও নির্দ্ধিধায় প্রত্যেক বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। যেমন ঃ "সমগ্র তার যে কোন অংশের থেকে বড়" ; "যে কোন দুই বিন্দুকে যোগ করে একটা সরলরেখা আঁকা সম্ভব", "এলিমেণ্টস" এ স্বতঃসিদ্ধগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এই স্বতঃসিদ্ধগুলোকেই ভিত্তি করে ইউক্লিড যুক্তির মাধ্যমে, তিনি বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্সাগুলোর ধর্ম বিবৃত করেছিলেন, যে নক্সাগুলো রুলার এবং কম্পাস দিয়েই আঁকা যায়।

"এলিমেণ্টসের" প্রথম চারটি খণ্ডে সহজ সরল জ্যামিতিক নক্সাগুলোরই ধর্ম বিবৃত আছে। যেমন ত্রিভুজ, বৃত্ত, বহুভুজ, সমান্তরাল সরলরেখা প্রভৃতির ধর্ম এবং পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রয়োগ। পঞ্চম খণ্ডে অনুপাতের সূত্র। যেমন ঃ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ । ষষ্ঠ খণ্ডে অনুপাতেরই বিস্তৃত আলোচনা। সপ্তম থেকে নবম খণ্ড পর্যন্ত রয়েছে অখণ্ড সংখ্যাগুলোর ধর্ম। দশম খণ্ডে আছে জটিল অমূলদ সংখ্যার আলোচনা। এগার, বার এবং তের খণ্ডে আছে ঘন জ্যামিতি ; যেমন, পিরামিড, শঙ্কু, চোঙ, গোলক প্রভৃতি।

"এলিমেণ্টস" ছাড়াও ইউক্লিড আরো অনেক বই লিখেছিলেন। তার অধিকাংশই পাওয়া যায় নি। কিন্তু যেগুলো পাওয়া গিয়েছে তা হ'ল "অপটিকস্", "ফেনোমেনা", "ডাটা"। "ফেনোমেনা" বইটি গোলক নিয়ে। "ডাটা"-তে চুরানব্বইটা সূত্র ছিল যাতে কোন চিত্রে যদি কোন একটি নির্দিষ্ট উপাদান দেওয়া থাকে, তাহলে অপরাপর উপাদানগুলিও নির্ণয় করা সম্ভব।

ইউক্লিডের কার্যাবলীর প্রভাব জ্যামিতি ছাড়িয়ে সুদূরেও প্রসারিত হয়েছিল। বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকরাও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁরা জানলেন কিভাবে অবরোহন পদ্ধতিতে কোন যুক্তিতে আসা যায় এবং কিভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে হয়। যদিও আজকের মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রাচীন গ্রীসের থেকে অনেক অনেক ব্যাপক তবুও খুব অল্প সংখ্যক প্রাচীন মনীষি আজও আজকের বিজ্ঞানে তাদের সাফল্যপূর্ণ দানের জন্য অমর হয়ে আছেন এবং এই

অল্প সংখ্যক প্রতিভাধরদের মধ্যে অংকশাস্ত্রের জগতের ইউক্লিড একজন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু কিছু ছোটখাটো ত্রুটি ইউক্লিডের "এলিমেণ্টস" বইতে পাওয়া গেছে। যেমন, ভুল সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি। এগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এগুলো পরিশোধন হয়ে বই-এর নতুন সংস্করণও হয়েছে। কিন্তু এলিমেণ্টসের মূল বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় নি।

আর্কিমিডিস

(খ্রীঃ পূঃ ২৮৭—খ্রীঃ পূঃ ২১২)

জাহাজ ঘাটে লোকে লোকারণ্য। ঘাটের কিছু দূরেই জলের তলায় ডুবন্ত একটা প্রকাণ্ড মালবাহী জাহাজ। জনগণের খুব সামান্য অংশের ধারণা যে, উঠতি তরুণ ছেলেটা, যে নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে পরিচয় দেয়, হয়ত তার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে, না, তা হবে না। তাদের গলায় অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার সুর। এটা কি একটা মরণশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব যে সে হাতে করে একটা মাল-বোঝাই, হাজার হাজার পাউণ্ড ভারী জাহাজকে জলের উপরে টেনে তুলবে? সম্রাট হিয়েরো লম্বা লম্বা পা ফেলে জাহাজের দিকে এগোতে লাগলেন। অবিশ্বাসী জনতা নীরব, নিশ্চুপ। সম্রাট এগিয়ে গিয়ে বিজ্ঞানীর নির্মিত পুলির দড়ির একপ্রান্ত দু হাত দিয়ে ধরলেন। দড়িটার অপরপ্রান্ত জাহাজটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। সম্রাট অল্প আয়াসে পুলির দড়িটা ধরে টান দিলেন। কিছুই ঘটল না। "সম্রাট, আবার একবার টানুন", বিজ্ঞানী সনির্বন্ধ মিনতি করে অনুরোধ করলেন। আরও একবার সম্রাট দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে বারবার টানতে লাগলেন। জনগণের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা চাপা রব উঠল। দেখা গেল যেন কোন যাদু-বিদ্যায় জাহাজের মাস্তুলটা জলের উপরে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। যতই জাহাজটা ক্রমে ক্রমে আরো বেশী করে জলের ওপরে জেগে উঠছে, ততই জনগণের চাপা রব জয়ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে। তখন সম্রাট ঘুরে তাঁর পাশের তরুণ বিজ্ঞানীকে অভিনন্দন জানালেন, কারণ পুলি এবং দড়ির এই পরীক্ষার ব্যবস্থা সেই বিজ্ঞানীই করেছিলেন। সম্রাট খুশী হয়ে বললেন "আর্কিমিডিস, তুমি আবার বাজীমাৎ করলে হে! বিজ্ঞানের বিস্ময় সত্যিই সীমাহীন।"

এই হচ্ছে আর্কিমিডিস, মহান বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস। যদিও তিনি পিওর (অব্যবহারিক) বিজ্ঞানে প্রথমদিকে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু পরে তিনি নানারকম যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রগুলো যুদ্ধের কালে ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে এবং স্বাভাবিক শান্তির সময়ে বাস্তব গঠনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং এই সমস্ত যন্ত্রের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীদের অগ্রদূত ছিলেন মহান আর্কিমিডিস।

আর্কিমিডিস সিসিলির সাইরাকিউসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ফেইদিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ্। কৈশোরে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্দ্রিয়া তখন ছিল জ্ঞান ও সভ্যতার পীঠস্থান। অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষ করে জ্যামিতিতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন স্যামোসের কনোন, যিনি "জ্যামিতির জনক" মহান ইউক্লিডের একজন শিষ্য। সে সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার বসন্তকাল। তখন পাশ্চাত্য জগত পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি, দূরত্ব এবং আরও বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তাদের কাছে তখন পৃথিবী, বিশ্বের আর এক রূপ।

আর্কিমিডিস নিজেকে একজন দার্শনিক গণিতজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে সুদূর প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবেশ তাঁকে অন্যদিকে চালিত করে। ফলে, তাঁর প্রতিভা এবং সময়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছিল আরো বেশী বাস্তব এবং পার্থিব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে।

আর্কিমিডিসের আত্মীয়, সাইরাকিউসের রাজা হিয়েরো একবার তাঁর নিজের জন্য একটা সোনার মুকুট তৈরি করবার আদেশ দেন। স্বর্ণকারের সততায় রাজার সন্দেহ হয় এবং সেজন্য তিনি মুকুটটা সত্যি সত্যিই সম্পূর্ণ সোনার কিনা তা যাচাই করতে আর্কিমিডিসকে বলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেও আর্কিমিডিস ব্যর্থ হন। হঠাৎ, একদিন যেই তিনি জলভর্তি একটা স্নানের টবে স্নানের জন্য নেমেছেন তখনই টব থেকে কিছু জল উপচে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো তাঁর মনে সমাধানের একটা উপায় খেলে গেল। শোনা যায় তিনি আবিষ্কারের আনন্দে এতই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে নগ্ন অবস্থায় সাইরাকিউসের রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে তিনি চিৎকার করতে থাকেন, "ইউরেকা! ইউরেকা!" (আমি পেয়েছি)। তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল নিম্নরূপ: মুকুটের সমান ওজনের এক টুকরো বিশুদ্ধ সোনা একটা জলভর্তি পাত্রের মধ্যে ফেলে দেন। ফলে কিছু জল উপচে পড়ে, এবং তিনি ঐ উপচে পড়া জল পরিমাপ করেন। দ্বিতীয়বার সোনার মুকুটটা তিনি ঐ জলভর্তি পাত্রে আবার ফেলে দেন

এবং দ্বিতীয়বারে উপচে পড়া জলও তিনি যথারীতি পরিমাপ করেন। তিনি দেখেন প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বারের উপচে পড়া জলের আয়তন ভিন্ন। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে মুকুটটা সম্পূর্ণ সোনার নয়। এই রকম ভাবে সম্ভাবনা ও বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণের মিশ্রিত ভিত্তিতে তিনি আপেক্ষিক গুরুত্বের ফিজিক্যাল 'ল (ভৌতিক সূত্র) আবিষ্কার করেন। যা আজও আর্কিমিডিসের সূত্র নামে বিখ্যাত। আর্কিমিডিসের নীতি বলে, "কোন অদ্রাব্য বস্তুকে কোন স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত করিলে, বস্তুর ওজনের আপাত-হ্রাস হয় এবং ঐ হ্রাস বস্তু কর্তৃক অপসারিত সমআয়তন তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।"

সম্রাট হিয়েরোঁর অধীনে এবং তাঁর নির্দেশে আর্কিমিডিস প্রায় চল্লিশ রকমের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। যন্ত্রগুলো হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অথবা যুদ্ধের
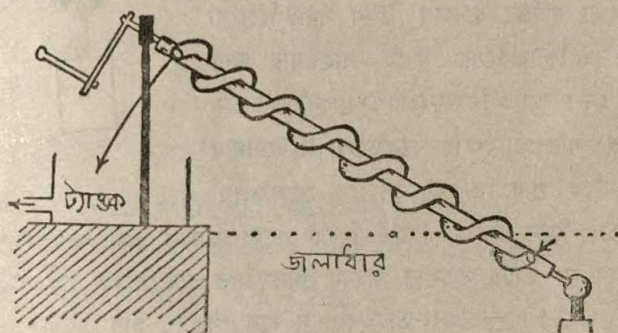
সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহৃত হোত। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর মধ্যে একটা ঃ "আর্কিমিডিসের স্ক্রু"—যা আজকেও নীচু জলাভূমি থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা একটা বড় ফাঁপা কর্ক-স্ক্রু। একপ্রান্ত জলে ডোবান থাকে। যখন কর্ক-স্ক্রুটা আনত হয়ে ঘুরতে থাকে, তখন এটার মধ্যে দিয়ে জল ঢুকে অপরপ্রান্তের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর্কিমিডিসের সময় জাহাজের খোল থেকে জল বের করা এবং ইজিপ্টের শুষ্ক জমিতে জল সেচের জন্য তাঁর নির্মিত 'স্ক্রু' ব্যবহৃত হোত। পাম্প (নিষ্কাশন যন্ত্র) আবিষ্কারের পূর্বে "আর্কি-মিডিসের স্ক্রু" নিষ্কাশন কাজে ব্যবহৃত হোত।

প্রাচীন ইজিপ্টে পিরামিড তৈরি করতে বিরাট বিরাট গ্রানাইট পাথরের চাঁই লাগত এবং লোকবল দিয়ে অর্থাৎ লোকেদের কাঁধে করে সেগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোত। আর্কিমিডিস তখন পুলি (কপিকল) এবং লিভারের আবিষ্কার করেন। তিনি লোকেদের পুলি এবং

লিভারের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত করান। তিনি যন্ত্র নির্মাণ বিদ্যায় একজন প্রবর্তক। কথিত আছে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে দাঁড়াবার একটা জায়গা দাও, তাহলেই আমি পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেব।" এই বলে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে অল্প শক্তি দিয়েই পুলি বা লিভারের সাহায্যে কোন বিশাল বস্তুকে নড়ান-চড়ান যায়ঃ যেটা তিনি রাজা হিয়েরোর নির্দেশে, পূর্বে আলোচিত, মালবাহী জাহাজ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।
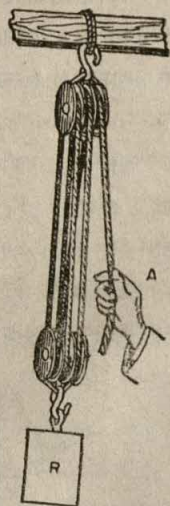
কিছুদিন পরেই রোমের সেনাপতি মার্সেলাস তার সৈন্যবাহিনী এবং প্রায় গোটা ষাটেক ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে সাইরাকিউসের প্রাচীর-সীমান্তে যুদ্ধের জন্য হাজির হলেন। তখন সম্রাট হিয়েরো বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কাছে সাহায্যের জন্য শরণাপন্ন হন। আর্কিমিডিস তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় এমন কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা রোমান সৈন্যবাহিনীকে প্রায় তিনবছর ঠেকিয়ে রেখেছিল। কথিত আছে, তিনি একবার বিরাট বিরাট ধাতব আয়না এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন যে তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে রোমান যুদ্ধ জাহাজ-গুলোতে (কাঠের) পড়ত এবং তাতে আগুন ধরে যেত। আর একবার, এমন বিশাল আকৃতি নোঙরের মত লোহার আঁকশি এবং ক্রেন তৈরি করেছিলেন যে সেগুলো দিয়ে সাইরাকিউসের প্রাচীর টপকানোর জন্য রোমানদের নির্মিত কাঠের বড় বড় দুর্গ ভেঙ্গে, গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেয়া হোত। বিজ্ঞানী-যাদুকর হিসেবে আর্কিমিডিসের এমনই খ্যাতি ছিল যে, প্লুটার্চের কথায়—রোমানরা তাঁর এক একটা যন্ত্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেত।

কিন্তু পরে একরাত্রে সাইরাকিউসের সৈন্যরা, রোমানরা পালিয়ে গেছে ভেবে, আনন্দ উৎসব করছিল এবং উৎসব শেষে ঘুমিয়েও পড়েছিল। সেই রাত্রেই তাদের এই অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে রোমান সৈন্যরা সাইরাকিউসের প্রাচীর টপকিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং নির্দ্বিধায় গণহত্যা চালাল। এই গণহত্যায় আর্কিমিডিস একজন রোমান সৈন্যের হাতে নিহত হন, যদিও মার্সেলাস তাঁকে হত্যা না করার আদেশ দিয়েছিলেন। কথিত আছে, হত্যাকারী সৈনিক যখন আর্কিমিডিসকে হত্যা করতে যায় তখন তিনি বালির ওপর গণিত সংক্রান্ত কিছু

আঁকাজোকা করছিলেন। তিনি সৈনিকটির কাছে অন্তিম মিনতি করেন যে, যেন তাঁকে সে তাঁর অংকটা শেষ করতে দেয়।

আর্কিমিডিসের অনুরোধে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে একটা চোঙের ভেতর একটা গোলক খোদাই করা আছে। কারণ তাঁর মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—একটা চোঙের এবং তার মধ্যেকার একটা গোলকের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের মধ্যেকার সম্পর্ক। আবিষ্কারের জন্য তিনি একটা চোঙ নির্মাণ করেন, যার উচ্চতা এবং ব্যাস সমান, এবং তার মধ্যে একটা গোলককে যতটা সম্ভব দৃঢ় করে স্থাপন করলেন। তিনি চোঙটাকে জলপূর্ণ করলেন এবং তার মধ্যে গোলকটাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিলেন। ফলে কিছুটা জল উপচে পড়ল। উপচে পড়া জলের আয়তন এবং প্রথম অবস্থায় থাকা জলের আয়তন দুটোকে তুলনা করে তিনি প্রমাণ করেন যে দৃঢ় ভাবে বসান গোলকের আয়তন, চোঙের আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ।

আর্কিমিডিসের গণিত সংক্রান্ত দানগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

১) বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত $৩\frac{১০}{৭১}$ ও $৩\frac{১}{৭}$ এর মধ্যে অবস্থিত;

২) অধিবৃত্তীয় অংশগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয়;

৩) শঙ্কুকৃতি এবং গোলাকাকৃতি বস্তুর সম্বন্ধে ৩২টি প্রতিজ্ঞা;

৪) বলবিদ্যার তত্ত্বের ভিত হিসেবে সমতল ক্ষেত্রের সাম্যতা সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয়।

৫) সমান ভূমি এবং উচ্চতা বিশিষ্ট ত্রিভুজ এবং অধিবৃত্তের অংশের মধ্যেকার সম্বন্ধ নির্ণয়। এ ছাড়াও তিনি নানারকমের প্রকল্প এবং ধারণার যথার্থতা পরীক্ষা করবার জন্য অনেক পরীক্ষা মূলক পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলো আজকের দিনে আরোহণ পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নামে পরিচিত।

দার্শনিক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিসের সূত্র, সজ্ঞা এবং যান্ত্রিক কৌশলগুলো আজও বৈজ্ঞানিক মহলে সমাদৃত। প্রায় দু হাজার বছর আগের বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা, তাঁর অবিস্মরণীয় কৌশল, (যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের কাছে ভয়াবহ, শান্তির ক্ষেত্রে মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ) আজও আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁদের আবিষ্কারের পক্ষে এক একটা ভিত্তিপ্রস্তর—এক একটা পাথেয়।

..........টলেমি (ক্লডিয়াস টলেমি)..........

(খ্রীষ্টাব্দ ৯০—১৬৮)

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, মহান প্রাচীন জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ এবং যুক্তিবিদদের প্রতিভাময় শিল্পকর্মের সংগ্রহশালা হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়াম (সংগ্রহশালা) বিখ্যাত ছিল। সেখানে ক্লডিয়াস টলেমিয়াস (টলেমি) নামে একজন গ্রীক নিয়মিত ভাবে সেই সমস্ত মহান মনীষিদের তত্ত্ব-গ্রন্থগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতেন। টলেমি ইজিপ্টে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। তবে এটুকু জানা যায় যে, তিনি জ্যোতির্শাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য তখনকার কালের সংস্কৃতির শিক্ষাকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ায় পদার্পণ করেন। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদদের পরস্পর বিরোধী তত্ত্বগুলো পড়েন। তত্ত্বগুলো পড়ে তাঁর নিশ্চিত ধারণা হয় জগতের অনন্ত রহস্যের চাবিকাঠিটা লুকিয়ে আছে গণিত এবং যুক্তিশাস্ত্রের গভীরে। অর্থাৎ বিশ্বের গঠন-প্রণালী সমস্যার সমাধান করতে হবে অংক এবং যুক্তি দিয়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০ সালে অ্যারিষ্টার্চাস এই মত পোষণ করেন যে, সূর্যই জগতের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তাঁর এই মত প্রাচীন মনীষিগণ বাতিল করে দেন, তাঁদের দার্শনিক ধারণায় মানুষের বাসস্থান পৃথিবী ছিল স্থির এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুগুলো ছিল গতিশীল। কিছু কিছু প্রাচীন জ্যোতির্বিদ এরকম মতও পোষণ করতেন যে—পৃথিবী স্থির। সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কতকগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্তপথে পৃথিবীকে অবিরত প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এই সূত্র প্রয়োগ করেও তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ সালে পারগার অ্যাপোলোনিয়াস এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সালে নিসিয়ার হিপ্পারচাসও একই মত পোষণ করেন যে পৃথিবী জগতের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তত্ত্ব খাড়া করেন যে, মহাজাগতিক বস্তুগুলো এপিসাইকেল (যে বৃত্তের কেন্দ্র কোন বৃহৎ বৃত্তের পরিধির উপর থাকে) অথবা ছোট ছোট বৃত্তাকার পথে এবং ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রিক পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। টলেমিও এই তত্ত্ব মেনে নিলেন এবং এপিসাইকেল ও ভিন্ন কেন্দ্রিক বৃত্তের বাস্তব নক্শা এঁকে গাণিতিক পদ্ধতিতে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর সঠিক অবস্থান বার করতে চেষ্টা করলেন এবং অবশেষে তা করলেনও। টলেমির গাণিতিক পদ্ধতিতে গ্রহগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয় সত্যিই এক বিস্ময়কর

ব্যাপার কারণ তার ভিতই ছিল বেঠিক, যে মহাজাগতিক বস্তুগুলো বৃত্তাকার পথে ঘোরে (কারণ কেপলার প্রমাণ করেন যে পথগুলো বৃত্তাকার নয়, অধিবৃত্তাকার)।

টলেমি, ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব—পৃথিবী জগতের কেন্দ্র, এবং গ্রহগুলোর গতি-বিধির নির্ভুল হিসেব, তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বইটির নাম "দি গ্রেট টিটাইস অফ অ্যাসট্রোনমি", এটি আবার "আলম্যাগেষ্ট" নামেও পরিচিত। এই বইতে টলেমি বলে গেছেন যে, বিশ্ব একটা গোলক এবং তা গোলকের মতই ঘূর্ণায়মান। পৃথিবীর আকারও গোলকাকৃতি, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে। টলেমির এই তত্ত্বই প্রায় এক হাজার চারশো বছর ধরে মেনে নেওয়া হয়েছিল। পরে কোপার্নিকাস এবং অন্যান্য মনীষিরা এই তত্ত্বকে ভুল বলে প্রমাণিত করেন (তাঁদের সঠিক তত্ত্ব—সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্যই জগতের কেন্দ্র)। তবুও টলেমির গাণিতিক হিসাব, গ্রহ নক্ষত্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে, জ্যোতির্বিদদের মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে এবং নাবিকদের জন্য আগের চেয়ে আরো বেশী সঠিক ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি করতে বিরাট প্রয়োজনীয় ভূমিকায় কাজে লেগেছিল।

"আলম্যাগেষ্ট" বইতে টলেমি দেখিয়ে গেছেন কিভাবে ত্রিকোণমিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায়। তিনি বৃত্তকে সমান ৩৬০টা ভাগে ভাগ করে ডিগ্রী, ডিগ্রীকে আবার মিনিট এবং সেকেণ্ডেও উপভাগ করেছিলেন। তিনি π (পাই) অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতের মান ৩·১৪১৬ নির্ণয় করেছিলেন। হিপ্পারচাস এবং টলেমিই প্লেন (দ্বিমাত্রিক) এবং স্ফেরিক্যাল (গোলকীয়) ত্রিকোণমিতির ভিত স্থাপন করেন। বৃত্তের মধ্যে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের সম্পর্কের সূত্রই ব্যবহার করে তিনি বৃত্তের চাপ এবং সংলগ্ন কোণের একটা টেবিল (তালিকা) তৈরি করেন, যাতে পরস্পর দুটোর ব্যবধান ছিল আধ ডিগ্রী এবং সেটা আজকের আধুনিক সাইন, কস তালিকার মতোই একই উদ্দেশ্য সাধিত করত।

টলেমি প্রায় এক হাজার আঠাশটা নক্ষত্রকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন যেখানে তার আগে মাত্র চার'শ নক্ষত্রের আবিষ্কার হয়। তিনি "অপটিকস্" নামেও একটি বই লেখেন। তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তবুও এটা জানা যায় যে বিভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যম দিয়ে চলার সময় আলোক রশ্মির গতিপথ পরিবর্তনের অর্থাৎ আলোক রশ্মির প্রতিসরণের সূত্র নির্ণয়ের সেটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

প্রাচীন পৃথিবীতে একজন ভৌগোলিক হিসেবেও তাঁর দান ছিল। তিনি "জিয়োগ্রাফিকাল ট্রিটাইস" নামে একটি বই লিখেছিলেন। প্রাচীন গ্রীকদের

ভিত্তি করে তিনি আরো উন্নত উপায়ে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ পরিমাপ করে তাঁর সময়কার সমস্ত জায়গারই অবস্থান নির্ণয় করেন—সেই ব্রিটানিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে আরব, ভারত সব। যদিও এগুলো কিছু কিছু ত্রুটিপূর্ণ ছিল কারণ পৃথিবীর পরিমাপ গণনায় তাঁর ভুল ছিল, তবুও তাঁর সেই মানচিত্র নাবিক, ব্যবসায়ী একং তাঁর পরবর্তী ভৌগোলিকদের প্রচুর সাহায্য করে।

প্রাচীন গ্রীকের শেষ মহান জ্যোতির্বিদ টলেমির তত্ত্ব এবং সূত্রগুলো প্রায় এক হাজার চারশো বছর ধরে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে উন্নত যন্ত্র, টেলিস্কোপ ইত্যাদির আবিষ্কার এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁর সূত্র যে ভুল তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর সময়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রচণ্ড অভাবের কথা মনে রেখে তাঁর বিরাট গাণিতিক প্রভাবের কথা মনে পড়লেই আপনা থেকে তাঁর ওপর শ্রদ্ধা এসে পড়ে। এবং শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি আজও এ জগতে নমস্য, চিরবরণীয়, চিরস্মরণীয়।

গ্যালেন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৩০—খ্রীষ্টাব্দ ১৯৯)

গণ্যমান্য, শ্রদ্ধেয় গ্রীক দার্শনিক ইউডিমস সাংঘাতিক অসুস্থ। রোমের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত চিকিৎসকদের চেষ্টা নিষ্ফল, ব্যর্থ। দিনের পর দিন অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। মৃত্যু যখন ইউডিমসের শিয়রে, তখন শেষবারের জন্য একজন তরুণ গ্রীক চিকিৎসকের ডাক পড়ল, যিনি কিনা সম্প্রতি শহরে এসেছেন।

নতুন আগন্তুককে দেখেই, ইউডিমসের চিকিৎসায় রত রোমের ডাক্তাররা তাঁকে খুব অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন চিকিৎসকের অধীনে আছ?" সেই তরুণ আগন্তুক বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে খুব সাহসের সঙ্গেই জবাব দিল, "আমি কারও অধীনে নেই। হিপ্পোক্রেটিস বা তাঁর মতো মনীষিদের শিক্ষাকে যারা চূড়ান্ত বলে মানে, তাদের মতোই আমি একজন দাসানুদাস।" তারপর তিনি রোগীকে দেখেন এবং রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য ওষুধেরও বিধান দেন। আগন্তুকের চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত ইউডিমস দ্রুত আরোগ্যলাভ করেন। এই ভাবে আগন্তুক, রোমান ডাক্তারদের তাঁর শত্রু এবং ইউডিমস ও তাঁর বন্ধু ও

ছাত্রদের প্রভূত প্রসংসা অর্জন করেন। এই আগন্তুকই চিকিৎসা জগতের স্বনামধন্য পুরুষ গ্যালেন।

গ্যালেন খ্রীস্টাব্দ ১৩০ সালে পারগেমনে জন্মগ্রহণ করেন। পারগেমন এশিয়ামাইনরের রোমান রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং আলেকজান্দ্রিয়ার সমকক্ষ গ্রন্থাগার ও ভাস্কর্যের বিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল নিকন। নিকন একজন অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন এবং অংক, দর্শন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বেশ ভালমত জ্ঞান রাখতেন। নিকন তাঁর পুত্রকে অংক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলো ভাল করে শেখান এবং ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। গ্রামের বাড়িতেই গ্যালেন সহজেই জীব এবং উদ্ভিদ জগতের অনেক গোপন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষালাভের জন্য পারগেমনের বাছাই করা শিক্ষকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে অ্যারিস্টোটলের বই পড়ে তিনি জীববিদ্যার প্রাথমিক পাঠগুলো শেষ করেন এবং অনুভব করেন যে, জীববিদগণ অবশ্যই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করবে।

যৌবনের প্রারম্ভে একবার গ্যালেন ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রের জীবন সংশয় দেখে, তাঁর পিতা তাঁকে পারগেমনের অ্যাসক্লেপিয়াসের একটা বিশাল পবিত্র মন্দিরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি সন্তানের আরোগ্যলাভের জন্য সারা রাত প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, অ্যাসক্লেপিয়াস তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন তবে এই শর্তে যে তিনি তাঁর সন্তানকে চিকিৎসক তৈরি করবেন। গ্যালেন তাঁর পিতাকে ভীষণ ভালবাসতেন এবং পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। তিনি, পারগেমনে হিপোক্রেটিসের শ্রেষ্ঠ অনুগামী স্যাটাইরাসের কাছে মেডিসিন (ওষুধ-পত্রাদি) এবং অ্যানাটমি (অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা) সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে লাগলেন।

মাত্র বছর কুড়ি বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ আঘাত পান। তাঁর ঘরের এবং ঘরের চারপাশের জিনিষ পত্রগুলো তাঁকে তাঁর পিতার সঙ্গে অতিবাহিত সুমধুর দিনগুলোর কথা বারবার মনে করিয়ে দিত। এজন্য গ্যালেন পারগেমন ত্যাগ করতে মনস্থির করলেন, এত সত্বেও স্থানীয় শিক্ষকরা যে জ্ঞান তাঁকে প্রদান করেছিলেন তা সবই তাঁর মনের জ্ঞানকোষে সবই সঞ্চিত ছিল। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের বৈদেশিক বিখ্যাত বিখ্যাত সব কেন্দ্র-গুলো ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন এবং অবশেষে চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। গ্যালেন ১৫৩ সালে হিপোক্রেটিসের কর্মের

পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। সেখানে চারটি অমূল্য বছর অতিবাহিত করেন। সেখানকার বিশেষ গ্রন্থাগারের অমূল্য তথ্য সম্বলিত বই এবং জ্ঞানী শিক্ষকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তাঁকে তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী চিকিৎসক গড়ে তোলে।

একাকী ও নিরবসর গ্যালেন সাতাশ বছর বয়সে আবার বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেই সময় পারগেমনের অ্যারেনায় (মল্লভূমি) গ্ল্যাডিয়েটরদের বার্ষিক প্রতিযোগীতা শুরুর মুখে। গ্ল্যাডিয়েটরদের ক্ষতস্থান সারিয়ে আবার মল্ল-ভূমিতে ফিরিয়ে আনার জন্য সেসময় একজন দক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়েছিল। সেজন্য খেলার ভারপ্রাপ্ত প্রধান যাজক গ্যালেনকে ওই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন এবং গ্যালেন রাজীও হলেন। এতে গ্যালেন ব্যবহারিক মানব অঙ্গ গঠনতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করবার এবং শল্যচিকিৎসায় অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ পেলেন।

যাইহোক গ্যালেনের ভ্রমণ করবার প্রচুর বাসনা ছিল এবং স্থির করলেন যে রোম সাম্রাজ্যের জমকালো রাজধানী প্রদর্শন করবেন। সেই সময় রোমে অনেক চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যারা কোন গোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত বা কারো অধীনে ছিল না, তাদেরকে সেই সমস্ত চিকিৎসকরা খুব অবজ্ঞা করতেন এবং তাদেরকে নিতান্তই হাতুড়ে বৈদ্য বলে মনে করতেন। এখানে এসে গ্যালেন একদম একঘরে হয়ে গেলেন, কারণ তাঁর প্রতিদ্বন্দিরা তার সুনামকে এরকম ভাবে ধ্বংস করলেন যাতে করে তাঁর কাছে কোন রোগীই না আসে।

যখন গ্যালেন চিরতরে রোম ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রায় মনস্থির করে ফেলেছেন, তখন রোমান কনসাল ফ্লেবিয়াসের স্ত্রী ভীষণ পীড়িত হয়ে পড়লেন। রোমের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা কিছুই করতে পারছে না দেখে, ফ্লেবিয়াস শেষ চেষ্টা হিসেবে গ্যালেনের শরণাপন্ন হলেন। গ্যালেনের চিকিৎসায় ফ্লেবিয়াসের স্ত্রী খুব দ্রুত আরোগ্যলাভ করলেন। ফ্লেবিয়াস জনসমক্ষে গ্যালেনের চিকিৎসা-দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং গ্যালেনকে অঙ্গ গঠনতন্ত্র পর্যবেক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরী নির্মাণ করতে প্রচুর অর্থও প্রদান করলেন। ল্যাবরেটরিতে প্রায় সব রকমের জীবের গঠনতন্ত্রই পর্যবেক্ষণ করা হোত ; এদের মধ্যে শুয়োর, ভেড়া, বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া এমনকি সিংহও ছিল। তবে তিনি সাধ্যমত বেশীর ভাগই এক ধরণের বানরের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করতেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে বানরদের অঙ্গ গঠনতন্ত্র মানুষের মতো একই।

খৃীষ্টাব্দ ১৬৮। উত্তর ইতালীতে প্রচণ্ড শীত। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তখন সেখানে। হঠাৎ তাঁর দলের বেশীর ভাগ সেরা

সেরা অফিসাররা ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তাঁর দলের ডাক্তাররা রোগ নিরাময়ে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হল। তখন সম্রাট গ্যালেনকে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি আনতে পারগেমনে লোক পাঠালেন। গ্যালেন সম্রাটের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। তিনি এসেই কিছুদিনের মধ্যেই রোগীদের সুস্থ করে তুললেন। গ্যালেনের চিকিৎসায় সৈন্যদের সুস্থ হতে দেখে মুগ্ধ মার্কাস অরেলিয়াস মন্তব্য করে বলেন, "স্টুপিড ট্র্যাডিশনের উর্ধ্বে এখানে একজন চিকিৎসকই আছেন।"

পরের গ্রীষ্মে যখন বিজয়ী সেনাদল রোমে ফিরে এলো, গ্যালেন এক দারুণ উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত মন জুড়ে তখন সৈন্যজীবনের বিশ্রী অভিজ্ঞতা। সেজন্য ভবিষ্যতে যাতে আর তাঁকে সৈন্যসেবায় নিয়োগ না করা হয় তার জন্য তিনি সম্রাটকে বললেন যে, অ্যাসক্লেপিয়াস তাঁকে স্বপ্নে সাবধান করে দিয়েছেন যে যদি সে আর কোন সামরিক অভিযানে যায় তাহলে তাকে ভীষণ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। এই ছোট্ট চালাকিতে পরের তিরিশটা বছর তিনি গবেষণা এবং লেখা নিয়েই রোমে কাটিয়ে দেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে মানব শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, পেশী এবং স্নায়ুর ওপরে গ্যালেনের পরীক্ষাগুলো ছিল বিস্ময়কর। গ্যালেনই প্রথম সত্যিকারের পরীক্ষা মূলক শারীরতত্ত্ববিদ। পেশীতত্ত্ব এবং স্নায়ুতত্ত্বের ওপর তাঁর পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলো, উত্তরসূরীদের পেশী ও স্নায়ুর কার্যগুলো বুঝতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। তবুও এটা অবাক লাগে যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলো খুব একটা পরিচিতি লাভ করে নি।

পেশীতত্ত্বের উপর প্রথম তাঁর লেখা বই "অন দি মুভমেন্ট অফ মাস্‌লস"। তিনিই প্রথম শরীরের অনেক পেশীর অবস্থান এবং গুণাবলী বর্ণনা করেন।

আজকের অ্যানাটমি বইতেও অনেক পেশীর নামই গ্যালেনের দেওয়া নামেই উল্লেখ করা আছে।

পেশীর ধর্ম স্টাডি করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন প্রত্যেক পেশীরই একটা ক্রিয়া; অর্থাৎ হয় সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হওয়া। তিনি মন্তব্য করেন শরীরের যে কোন অংশে পেশীগুলো জুটি বেঁধে বা দল বেঁধে কাজ করে। এবং একই সঙ্গে ঐ জুটির বা দলের, একটা বা এক অংশের সঙ্কোচন হলে অন্যটা বা অপর অংশের প্রসারণ হয়। একটা বাড়লে, অন্যটা কমে। একটা উঠলে অন্যটা নামে।

পেশীর সঙ্কোচন বা প্রসারণ কি উপায়ে হয় তা পর্যবেক্ষণের পর তাঁর মনে প্রশ্ন এলো কোন্ শক্তির ফলে এটা হয় এবং সেই শক্তির উৎস কি। তিনি

যোদ্ধাদের দেখতেন মাথায় বা শিরদাঁড়ায় আঘাত পেয়ে পক্ষাঘাতে ভুগতে। গ্যালেন এবার স্থির নিশ্চিত হলেন যে, পক্ষাঘাতের মূল কারণ মাথায় বা শিরদাঁড়ায় কোন বড় ধরণের আঘাত। তাঁর ধারণাকে পরীক্ষিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কতকগুলো বিস্ময়কর পরীক্ষাও শুরু করেন। প্রথম পরীক্ষায় তিনি একটি জন্তুর শিরদাঁড়ার প্রথম ও দ্বিতীয় অস্থি সন্ধির মাঝখানটা কেটে ফেলেন। দেখেন জন্তুটি শ্বাসরোধে মারা যায়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ষষ্ঠ এবং সপ্তম অংশের মাঝখানে কেটে ফেলেন। ফলে, জন্তুটির বুকের পেশীগুলো, অগ্রপদগুলি এবং নিম্নাংশের সমস্তটাই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। তৃতীয় পরীক্ষায় শিরদাঁড়ার সর্বশেষ অস্থি সন্ধিদ্বয়ের মাঝখানটা কেটে ফেলে দেখেন, যে শুধুমাত্র কাটা জায়গার নীচের দিকটুকুই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে গেছে; কিন্তু মাথার থেকে ঐ জায়গাটার উপরদিকটুকুর কোনরকম ক্ষতি হয় নি। এর থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রই দেহের পেশীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেশীর সংকোচন-এর জন্য দায়ী শক্তির উৎস মস্তিষ্ক।

এই সমস্ত পরীক্ষাকালে গ্যালেন আজকের প্যারাপ্লেজিয়া রোগেরও সম্পূর্ণ বৈশিষ্টগুলোর বিবরণ দেন। তাঁর মতে সুষুম্নাকাণ্ডের যে কোনো অর্ধাংশ-এর ক্ষতি হ'লে, শরীরের শুধুমাত্র একটি দিকই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়। তিনি দেখেন যে সুষুম্নাকাণ্ডের তন্তুগুলোর নবজন্ম বা আরোগ্যলাভ হয় না। সেইজন্য শিরদাঁড়ায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ড টিসু নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুণ যে পক্ষাঘাত হয়, তা স্থায়ী।

এ ছাড়াও গ্যালেনের অন্যতম আবিষ্কার—"মস্তিষ্ক-প্রসূত বাক্‌শক্তির নিয়ন্ত্রক স্নায়ুগুলি"। হিপোক্রেটিসের মতে বাকশক্তির নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক। আবার অ্যারিস্টোটলের মতে—বাক্‌শক্তির উৎস হচ্ছে হৃদপিণ্ড। গ্যালেনের এই আবিষ্কার প্রাচীনদ্বয়ের ঐ দ্বৈতমতবাদকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মীমাংসা করে।

আরেকটি ক্ষেত্রে গ্যালেনের অসাধারণ শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার একজন বিখ্যাত দার্শনিকের ডানহাতের তিনটি আঙ্গুল সম্পূর্ণ অবশ হ'য়ে যায়। তিনি এ ব্যাপারে অনেক চিকিৎসকেরই পরামর্শ নেন। কিন্তু কোন লাভ হয় না, তাঁর আঙ্গুলের বোধশক্তি ফিরে আসে না। অবশেষে তিনি গ্যালেনের দ্বারস্থ হন। গ্যালেন প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে সম্প্রতি কোনো আঘাত পেয়েছে কিনা। তার উত্তরে সেই দার্শনিক বললেন যে তিনি চলতি গাড়ী থেকে একটি পাথরের উপরে পড়ে যান এবং শরীরের পিছন দিকে বেশ আঘাত পান। গ্যালেন তখন তাকে ওয়েট-কম্‌প্রেশ করার কথা বলেন এবং তাতে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে যান। গ্যালেনের মতে—"দার্শনিকের

হাতের স্নায়ুগুলোতে আঘাতের জন্যই তার আঙ্গুলগুলো সাময়িক ভাবে অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতে অন্যান্য চিকিৎসকেরা প্রচণ্ড ভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন ; কারণ যেহেতু আঙ্গুলগুলোর কোন ক্ষতিই হয়নি। কিন্তু গ্যালেন তাদের বুঝিয়ে দেন যে প্রান্তস্থ স্নায়ুগুলোর অনুভূতিক এবং চালক অংশগুলো সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ তাঁর এই মতবাদ উনবিংশ শতাব্দী অবধিও গৃহীত হয়নি। পরে এটাই প্রমাণিত হয় যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুগুলোর পিঠের অংশগুলো সবই অনুভূতিক এবং সামনের অংশগুলো সবই চালক।

তাঁর জীবিতকালে তিনি প্রায় চারশোরও বেশী বই লেখেন। এই সমস্ত বইগুলো রোমের অ্যাসেক্লেপিয়াস-এর মন্দিরে রাখা হোত। কিন্তু ১৯২ সালে অ্যাসক্লেপিয়াস-এর মন্দিরের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তাঁর প্রায় সমস্ত বইগুলোই নষ্ট হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গ্যালেন খুব ভেঙ্গে পড়লেন। এবং পারগেমনে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। গ্যালেনের বয়স তখন ষাট। জীবনের বাকী কটা দিন তিনি তাঁর জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন। সেখানেই তাঁর প্রিয় পিতার সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

যদিও কখনো কখনো গ্যালেনকে অহংকারী, বদমেজাজী এবং দাম্ভিক বলা হতো তথাপি তিনি সর্বদাই সৎ এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব-এর সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভকারী রোগীর সংখ্যা ছিল অগণিত। এরা প্রত্যেকেই তাঁর রোমের প্রথম রোগী ইউডিমোসের মতই চিরকৃতজ্ঞ ছিল এবং তাঁকে "পারগেমনের বিস্ময়কর প্রতিভা" হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

............রজার বেকন..

(খৃষ্টাব্দ ১২১৪—১২৯২)

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। যদি প্রশ্ন করা যায় কার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের জন্য সমুদ্র যাত্রায় বের হন ? তাহলে প্রশ্নের উত্তরে যার নাম উল্লেখ করা যায় এবং তিনি হলেন রজার বেকন। তাঁর লেখা বই "অপাস মেজাস"-তে পরিষ্কার বর্ণিত আছে যে, স্পেনের পশ্চিম দিক থেকে সমুদ্রযাত্রা করলে একদিন না একদিন ভারতবর্ষে পেঁছান যেতে পারে। যদিও রজার বেকনের তাঁর সময়ের চিন্তাধারার ওপর খুব

কমই প্রভাব ছিল তবুও আজকের দিনে তাঁকেই বিজ্ঞানের প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তিনিই প্রথম আধুনিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ কতকগুলো যন্ত্রের কথা লিখে গেছেন ; যেমন, এমন যন্ত্র যা জলপথে জাহাজকে দাঁড় টানা ছাড়াই চালাবে, এমন যন্ত্র যা স্থলপথে জন্তুর সাহায্য ছাড়াই অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে চলবে এবং এমন একটা উড়ন্ত যান যা বায়ুর মধ্যে দিয়ে পাখীর মত ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে ও ভেতরে একটা মানুষ বসে বসে যন্ত্র ঘোরাচ্ছে !

যদিও সঠিক তথ্য জানা যায় না, তবুও মোটামুটি ভাবে রজার বেকনের জন্ম ১২১৪ সালে, ইংল্যাণ্ডের সমারসেটের ইনচেষ্টারে। বার বছর বয়সে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তখন সেখানে ল্যাটিন ভাষায় পড়ান হোত। অক্সফোর্ডের পাঠক্রম "সেভেন লিবারেল আর্টস" (মনের ঔদার্যবর্ধক সপ্ত বিদ্যাসমূহ) নামে পরিচিত, তা দু ভাগে বিভক্ত—প্রথমটা ট্রিভিয়াম (ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র) এবং দ্বিতীয়টা কোয়াড্রিভিয়াম (পাটী গণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান)। বেকন শিক্ষান্তে অক্সফোর্ডেই শিক্ষকের কাজ নেন এবং সেখানে থেকে যান।

মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানীরা প্রায়শই পূর্বসূরীদের গতানুগতিক ভুল তত্ত্ব অনুসরণ করে ভুল করতেন। রজার বেকন মধ্যযুগীয় এই সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি যদিও প্রাচীনদের তত্ত্বগুলো মানতেন কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁদের কথাই জ্ঞানের শেষ কথা নয়।

চতুর্থ ক্রুসেডের ফলে তদানীন্তন ছাত্ররা, হাতে লেখা প্রাচীন গ্রীক ভাষার অনেক লিপি পড়ার সুযোগ পায়। বেকন ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সম্ভবতঃ আরবী ভাষা ভালই জানতেন। ফলে এই সমস্ত হস্তলিপির তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

১২৪৫ সালে, বেকন অ্যারিস্টোটলের ওপর বক্তৃতা দিতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হন কারণ প্যারিসে এই কাজের জন্য খুবই অল্প সংখ্যক লোক ছিলেন। অ্যারিস্টোটলের ওপর তাঁর বক্তৃতার আটটি পরিচ্ছদ ছাপান হয়। সেগুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে করা হয় কারণ বেকন এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করতেন যাতে করে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সমস্ত জিনিষ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা যায় এবং পরিস্কার হয়।

১২৫০ সালের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডে একটা ফ্রানসিসকান মঠে একজন যাজকের চাকরী নেন। ধর্মীয় মানুষ হলেও তাঁকে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ কিছু পরীক্ষা চর্চা করা এবং উচ্চপদস্থ লোকেদের কাজকর্মের সমালোচনা

করার জন্য, ১২৫৭ সালে তাঁকে প্যারিসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁকে আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কথিত আছে, তিনি একবার পোপ চতুর্থ ক্লেমেণ্টকে প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন যাতে করে ক্রিস্টিয়ান বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ওপর যেন বেশী জোর দেওয়া হয়। কিন্তু ১২৬৬ সালে পোপ একটা চিঠিতে এই ধরণের কাজ করতে তাঁকে নিষেধ করেন। কিন্তু এত সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও বছরখানেকের মধ্যেই "অপাস মেজাস" এবং "অপাস মাইনর" নামে দুটো বই প্রকাশ করেন। "অপাস মেজাস" বইটাই তাঁকে সে যুগের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁরও কিছু কিছু সে-যুগোপযোগী কু-সংস্কারও ছিল।

"অপাস মেজাস" বইটি সাত খণ্ডে বিভক্ত : (১) ভুলের কারণ ; (২) দর্শন শাস্ত্র বনাম ব্রহ্মবিদ্যা ; (৩) ভাষা শিক্ষা ; (৪) গণিত শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ; (৫) আলোক বিজ্ঞান ; (৬) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং (৭) নীতিশাস্ত্র। "অপাস মাইনর", "অপাস মেজসের"ই সারাংশ।

বেকনকে একজন "প্রগতিশীল স্কুলম্যান" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি সে সময়ের অজানা অনেক আবিষ্কারেরই ভবিষ্যদ্বানী করেন। তাঁর মানসচক্ষে ভবিষ্যত অনেক আবিষ্কারের দৃশ্যই ভাসত ; যেমন, যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়ে পৃথিবীর চারদিক দেখা, গানপাউডারের বিস্ফোরক ধর্মের প্রয়োগ, লেন্সের সঠিক ব্যবহার যাতে করে মানুষের দৃষ্টি শক্তির উন্নতি হয়। কারুর পক্ষে এর একটা চিন্তা করা উল্লেখযোগ্য কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু এতগুলো একসঙ্গে চিন্তা করা কারুর পক্ষে সত্যিই অসাধারণ।

তিনি যদিও পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন তবুও তিনি নিজে খুব অল্প পরীক্ষাই সম্পন্ন করেন। তাঁর মতে গণিতশাস্ত্রই সমস্ত বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি ; তবে আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে এবং পরে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলোকে অঙ্কের সাহায্যে সূত্রাকারে সুবিন্যস্ত করতে হবে। তিনি পোপকে ক্যালেণ্ডার সংশোধনের জন্য চিঠি লেখেন। যদিও তাঁর সময়ে ক্যালেণ্ডার সংশোধিত হয় নি কিন্তু পরে ১৫৮২ সালে গ্রেগরীয়ান সংশোধনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগে রসায়নবিদ্যা অ্যালকেমী নামে পরিচিত ছিল। অ্যালকেমী-যুগেও রজার বেকনের ধারণ ছিল যে, অ্যালকেমীর মাধ্যমেই কোন পদার্থের রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম জোর দিয়ে বলেন আরোগ্যলাভের জন্য ওষুধও অ্যালকেমী দিয়ে তৈরি করা যায়।

যদিও এটা সত্যি যে তিনি পূর্বসূরীদের অনেক তথ্যই ধার করেন, তবুও প্রত্যেকটা কাজেই তাঁর নিজস্ব কিছু দান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ গানপাউডারের বিস্ফোরণ ক্ষমতা পূর্বেই জানা আছে। কিন্তু তিনি প্রস্তাব করেন যে কোন কঠিন ধাতুপাত্রে আবদ্ধ রাখলে গানপাউডারের বিস্ফোরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তিনিই প্রথম নির্দেশ করেন যে জলকণার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো যাবার কালে বারবার প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তিনি জানতেন যে আলোক-রশ্মি কোন গোলকীয় দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একটি বিন্দুতে মেলে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর একটা সঠিক পরিস্কার ধারণা ছিল। এ ছাড়াও তাঁর বিজ্ঞান-সুলভ মনে কোন দূরের বস্তুকে কাছে এবং কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখানোর সম্ভাবনাও স্পষ্ট ছিল। এজন্য ১৫৭১ সালে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের মূলে, তাঁর ধারণাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। জ্যামিতির বাস্তব প্রয়োগে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের, সঙ্গীতের, আলোকবিজ্ঞানের, চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং রাসায়নিক যন্ত্রপাতির কথাও তিনি বর্ণনা করে গেছেন। অব্যবহারিক গণিতের থেকে ব্যবহারিক গণিতেই তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল।

বেকনের জ্যোতির্বিদ্যায় গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁর মতে প্রত্যেকটি লোক এবং বস্তুর ওপরেই গ্রহ ও নক্ষত্রের একটা শক্তিশালী প্রভাব আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য জ্ঞানীদের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন যে কারো জন্মের সময় গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানগুলো যদি সঠিক নির্ণয় করা যায় তাহলে পরে তার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই অতি সহজেই ভবিষ্যতবাণী করা যায়। যদিও তিনি জ্যোতিষবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা দুটোকে পৃথক করেন, তবুও তিনি যা বিশ্বাস করতেন তার অধিকাংশ আজকের দিনে ভুল এবং কু-সংস্কার বলে পরিগণিত।

অক্সফোর্ডে ফিরে এসে তিনি ঠিক করলেন বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার ওপর তিনি একটা এনসাইক্লোপিডিয়া লিখবেন। কিন্তু সন্দেহ আছে যে তিনি তা করতে পেরেছিলেন কি না। কিন্তু যাই হোক তাঁর লেখা "কমুউনিয়া ম্যাথমেটিকে"-র (অংকশাস্ত্রের সূত্র) কিছু কিছু অংশ এবং "কমুউনিয়া ন্যাচারালিয়াম" (পদার্থবিদ্যার সূত্র) ও "দি কোয়েলেস্টিবামের" (মহা জাগতিক বস্তু সংক্রান্ত) একটা বড় অংশ এখনও পাওয়া যায়। এই সমস্ত ম্যানসক্রিপ্টের কপি ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

১২৭৭ সালে, খ্রীষ্টান ভিক্ষুদের প্রধান, অ্যাসকোলির জেরোম খ্রীষ্টান ভিক্ষু রজার বেকনের শিক্ষা পদ্ধতির নূতনত্বের মধ্যে সন্দেহজনক কিছুর জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেন এবং সেজন্যই তাঁকে জেলে বন্দী করা হয়। যেহেতু

তাঁর এই "নূতনত্ব" ব্যাখ্যা করা হয় নি, সেজন্যে এটা সম্ভবও হতে পারে যে কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করার ফলে কর্তৃপক্ষ শত্রুতা করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। যাই হোক ১২৯২ সালে জেলেই তিনি মারা যান। তখন জেরোম, পোপ চতুর্থ নিকোলাস।

বেকনের পূর্ব জীবনীকার জন রাউসের মত: "১২৯২ সালে ভগবানের দূত সেণ্ট বারনাবাসের উৎসবের দিনে এই মহান মনীষিকে অক্সফোর্ডের "গ্রে ফ্রায়ারস"য়ে সমাহিত করা হয়।"

আধা-বিজ্ঞানী, আধা-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, এই মহামানব সত্যিই জ্ঞানের এক বিরাট খনি। তাঁর সৃজনমূলক চিন্তাধারা, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, তাঁর প্রতিভার বিভিন্নমুখীতা দিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন।

......লিওনার্দো দা ভিন্সি......

(খ্রীষ্টাব্দ ১৪৫২—১৫১৯)

১৫০৩ সাল। ইটালীর দুই নগর-রাষ্ট্র পিসা ও ফ্লোরেন্স একে অপরের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ। পিসার তোরণদ্বারে ফ্লোরেন্সের সেনাবাহিনী জমায়েত হয়েছে। সমুদ্রতীর থেকে কিছুটা দূরে এক স্থানে এক দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য ফ্লোরেন্স তৈরি। ঠিক সেই অবস্থায় ফ্লোরেন্সের সিন্যোরা সাহায্যের জন্য এক শিল্পীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে যুদ্ধের জন্য এক অসাধারণ পরিকল্পনা করলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই যে, আর্নো নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে, তার গতিপথকে অন্যদিকে চালনা করা, যাতে করে পিসার জল-সরবরাহ এবং বন্দরের একটা ভয়ানক স্থায়ী ক্ষতি হয়। এজন্য তিনি বাঁধের নকশা এবং খাল কাটার জন্য বিভিন্ন অভিনব যন্ত্রের নকশাও করতে শুরু করলেন। সেদিনের সেই কর্মিতকর্মা শিল্পীই হলেন জগদ্বিখ্যাত লিওনার্দো দা ভিন্সি —যাঁর জগদ্বিখ্যাত শিল্পকীর্তি "মোনালিসা" ও "লাস্ট সাপার" চিত্রদ্বয়। এ ছাড়াও আকাশে প্রথম ওড়ার চারশো বছরেরও বেশী পূর্বে, তিনি প্রায় নিজে নিজেই, বায়ু গতিবিদ্যার অনেক সূত্রই আবিস্কার করেন। সম্প্রতি আবিষ্কৃত তাঁর বিজ্ঞানের নোটবই থেকে বাদুড়ের মতো পাখী এবং গ্লাইডার-সদৃশ যন্ত্রের ছবিরও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেহেতু লিওনার্দোর পরীক্ষাগুলো খুবই গোপনীয়

ছিল; সেজন্য কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না, তিনি আদৌ সেইসব যন্ত্র করে আকাশে উড়তে পেরেছিলেন কি না। তবে আধুনিক অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে যদি লিওনার্দোর আগেই গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়ে থাকে তবে তাঁর পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব ছিল।

১৪৫২ সালে ১৫ই এপ্রিল, লিওনার্দো ইটালীর একটা ছোট্ট শহর অ্যানচিয়ানোয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ক্যাটারিনা। বাবার নাম পিয়েরো দা ভিন্সি। পাঁচ বছর বয়সে তিনি বাবার সঙ্গে কাছের শহর ভিন্সিতে তাঁদের পরিবারের বাড়ীতে আসেন। এই শহরের নামানুসারে তাঁদের দ্বিতীয় নামকরণ হয়। বাল্যজীবনেই তাঁর বিজ্ঞানী ও শিল্পী প্রতিভার কিছু কিছু স্ফুরণ দেখা যায়। পনেরো বছর বয়সেই তিনি নানারকম কীটের নমুনা যোগাড় করতেন এবং তা পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেকটির ছবি এঁকে রাখতেন।

লিওনার্দোর অজান্তে, তাঁর বাবা তাঁর কতকগুলো নিখুঁত ও জীবন্ত অঙ্কন নিয়ে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী আন্দ্রিয়া ডেল ভেরোশিয়োর কাছে দেখান। ছবিগুলো দেখে ভেরোশিয়ো খুব মুগ্ধ হয়ে লিওনার্দোকে তাঁর স্টুডিওতে শিক্ষার্থী হিসেবে নিয়ে নেন। ভেরোশিয়ো নানান কারিগরী শিল্পে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন; যেমন—ভাস্কর্য শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, চিত্র শিল্প, স্বর্ণ শিল্প প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভেরোশিয়ো যুদ্ধাস্ত্র এবং খেলনা তৈরি করতেও সুদক্ষ ছিলেন। ফলে ভেরোশিয়োর সংস্পর্শে এসে লিওনার্দো তাঁর বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও কারিগরী শিল্প দক্ষতার প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। তাঁর পড়াশোনা খুব একটা বেশী না থাকায়, তিনি সেখানে লোকের কাছ থেকে গণিতের নানান বইপত্র চেয়ে আনতেন এবং সেগুলো শেখার জন্য বিভিন্ন লোকের খোঁজ করতেন। দিনেরবেলা স্টুডিওতে কারিগরী শিল্প চর্চা করতেন এবং রাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, তরল ও বায়বীয় পদার্থের গতি বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করতেন।

শিক্ষার্থী জীবনের প্রথম দিকে তিনি তাঁর বিখ্যাত তথ্যগুলো লিখতে শুরু করেন। কিন্তু কোন অজানা কারণে তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিবরণগুলো এক গোপন পদ্ধতিতে লিখে রাখতেন। এগুলো আয়নার সামনে রাখলে তবেই পড়া যেত। সম্ভবত ন্যাটা হওয়ার জন্যই তাঁর এই অদ্ভুত খামখেয়ালীপনা। এ ছাড়াও তাঁর আর একটা শখ ছিল খাঁচাশুদ্ধ পাখী কিনে পাখীকে ছেড়ে দেওয়া। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে পাখীগুলোর ওড়া লক্ষ্য করার জন্যই তিনি এরকম করতেন। যাতে করে তিনি উড়ন্ত যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে পারেন।

বা ভিন্সি শিল্প ও ব্যবসায়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে বেশী আগ্রহী ছিলেন। সেজন্য সেই সময়েও শ্রম বাঁচানোর জন্য যন্ত্রের কথা চিন্তা করেন— যার আজকের পরিচিতি "অটোমেশন"। তিনি অ্যারিস্টোটলের সূত্রের ওপর জন আরগাইরোপাওলোসের বক্তৃতা শুনে সম্পূর্ণ নূতন চিন্তাধারায় অনেক কিছু ভাবতে শুরু করেন এবং কগহুইল, উত্তোলন যন্ত্র এবং ঘর্ষণ প্রশমনের যন্ত্র নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

সে সময় থেকেই তিনি এতদিন যা পড়েছেন বা শুনেছেন তার থেকেও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রতি বেশী আশা রাখতেন। ফলে সে সময়কার জ্যোতিষি এবং অ্যালকেমিষ্টেদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিল। যদিও তিনি খুব ধর্ম-প্রবণ ছিলেন তবুও একবার এক পৌত্তলিকবাদকে ডেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ চার্চের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

তাঁর নিজস্ব যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই, তাঁর সূত্র এবং পর্যবেক্ষণগুলোকে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করেন। ১৪৭৮ সালে, তিনিই বলতে গেলে যানবাহনের গীয়ারশিফটের নীতি আবিষ্কার করেন। এরজন্য অসমান ব্যাসের তিনটে খাঁজকাটা চাকাকে একটা ঘূর্ণমান চাকার সঙ্গে যুক্ত করেন। এইভাবে একই সঙ্গে তিনটে বিভিন্ন ঘূর্ণনবেগ লাভ করতে সমর্থ হন। তিনি বলবিদ্যাকে "গাণিতিক বিজ্ঞানের স্বর্গ" বলে আখ্যা দিয়েছেন কারণ যন্ত্রবিদ্যাই গণিতের ফলস্বরূপ। এছাড়াও তিনি পাখীদের ওড়া এবং বাতাসের গতিবিধি সম্বন্ধেও তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি আকাশে পাখীর ওড়া এবং জলে মাছের সাঁতার দেওয়ার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বায়ুর গতি ও জলের গতি যে একই ধরণের তা উপলব্ধি করেন। এবং এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ, নিউটনের বিখ্যাত তৃতীয় গতিসূত্র আবিষ্কারের প্রায় দুশো বছর আগেই বায়ু গতি বিদ্যার ক্ষেত্রে "ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া"র নীতি বর্ণনা করতে সমর্থ হন।

লিওনার্দোর চিন্তাপ্রসূত আর্নো নদীর ওপর বাঁধ এবং খাল কাটার ফলে ফ্লোরেন্সে সমুদ্রে যাবার একটা পথও হয় এবং জলসেচেরও সুবিধা হয়।

ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার থেকে শিল্পী হিসেবে বা বৈজ্ঞানিক ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম আবিষ্কারের জন্য তাঁর বিরাট প্রতিভার ঠিকমত পরিচিতি বা পৃষ্ঠপোষকতা কোনটাই পান নি। সেজন্য ভবিষ্যত উন্নতির জন্য ইটালীর উত্তর প্রান্তের নগর রাষ্ট্র বিখ্যাত মিলানে চলে যান। তখন মিলানের শাসনকর্তা লিউডোভিকো ফর্জা—যিনি "ইল মোরো" (দি মুর) নামে পরিচিত ছিলেন। লিউডোভিকোর ফ্লোরেন্সের শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর একটা মোহ ছিল।

যদিও লিউডোভিকো লিওনার্দোর শিল্পকলায় খুবই মুগ্ধ হন, তথাপি তিনি

লিওন দোঁর যন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক পরিচিতি লাভ করেন নি। সেজন্য মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারের পদটা লিওনার্দোর থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবান একজনকে দেওয়া হয়। ফলে তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচিতির সুযোগ আর একবার নষ্ট হল। সেই সময় তিনি প্রচুর ছবি বিক্রি করে জীবন চালাতেন। তাছাড়া সে সময় তিনি লিউডোভিকোর বাবা ফ্রানসেসকোর একটা বিরাট অশ্বারোহী মূর্ত্তি তৈরি করবারও অর্ডার পান। সেই বিরাট মূর্ত্তিটা তৈরি করতে তাঁর পূর্বার্জিত শারীরতত্ত্ব ও ঘোড়ার গতিবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁকে প্রচুর সাহায্য করে।

যাইহোক ১৪৮৪ ও ১৪৮৫ সালে বিউবোনিক প্লেগে যখন মিলানের প্রায় দশ শতাংশ লোক মারা যায়, তখন লিওনার্দো মিলানকে পূর্ণনবীকরণের উদ্দেশ্যে কতকগুলো সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল: পরিবহনের জন্য খাল খনন, আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড নালী নির্মাণ ইত্যাদি কিন্তু প্লেগ প্রশমিত হয়ে গেলে এবং লিউডোভিকোরও ভয়ে তিনি অবাস্তব কল্পনা বলে পরিকল্পনাগুলোকে মন থেকে মুছে ফেলেন।

অবশেষে ১৪৯৩ সালে, যখন লিউডোভিকোর এক নিকট আত্মীয়ার বিবাহ উৎসবে ফ্রানসিসকো সর্জার পঁচিশ ফুট মৃন্ময় মূর্ত্তিটার উদ্বাটন হল, তখন লিওনার্দো কিছু পরিচিতি, কিছু খ্যাতি লাভ করেন, যা অতীতে তাঁকে বহুবার ফাঁকি দেয়। সেই বিরাট স্ট্যাচুটা বসানোর জন্য নতুন পুলি যন্ত্র, লিভার এবং উত্তোলন জ্যাকের উদ্ভাবনা করেন—যার সংস্করণ আজকের আধুনিক অটো-মোবাইল-জ্যাক।

এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর বিখ্যাত চিত্র "সিনাকোলা" (লাষ্ট সাপার) সম্পূর্ণ করেন। এ সময় তিনি লিউডিভিকোর সভায় ফ্রা লুকা প্যাসিওলি নামে একজন ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচিত হন। প্যাসিওলিকে সম্প্রতি লিউডিভিকো অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করেন। প্যাসিওলি লিওনার্দোর অব্যবহারিক গণিতের জ্ঞানের কথা জানতে পারেন এবং খুব শীঘ্রই তারা দুজনে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন।

১৪৯৯ সালে, ফ্রান্সের রাজা দ্বাদশ লুই যখন মিলান নগর দখল করেন, তখন লিওনার্দো এবং প্যাসিওলি মিলান ত্যাগ করে ভেনিসে আসেন। সেখানে লিওনার্দো সেনাবাহিনীর জন্য মাটি, সমুদ্র ও সমুদ্রের নীচে ব্যবহারের নিমিত্ত সাজসরঞ্জামের আবিষ্কার করেন। তিনি সেজন্য ডুবুরির পোশাক ও জলের নীচে বায়ু কক্ষের আবিষ্কার করেন যাতে করে শত্রুর জাহাজের খোলে গর্ত করে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত আবিষ্কারের খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে

অস্বীকার করেন কারণ তাঁর ভয় ছিল মানুষ তাঁর অসৎ প্রকৃতির বশে সমুদ্রের গভীরে নানারকম হত্যাকান্ড ঘটাবে।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন। ফ্লোরেন্সে তিনি চিত্রকলার থেকে বেশী মনোযোগ দেন জ্যামিতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ওপর। সে সময়ে একজন ডাচেস তাঁকে একটা ছবি আঁকতে বললে তিনি তার উত্তরে বলেন: "তিনি সম্পূর্ণ ভাবে জ্যামিতি চর্চা করছেন এবং তুলি সম্বন্ধে প্রচন্ড অধৈর্য হয়ে গেছেন।" কিন্তু অবিরত রাজনৈতিক উদ্বেগ ও অস্থিরতা তাঁকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে সরিয়ে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কারের দিকে বেশী ঠেলে দেয়। সেভাবে ১৫০২ সালে সিজার বর্জিয়া তাঁকে রোমাগনার জন্য মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নিয়ে যান।

বর্জিয়ার কাজ শেষ করে তিনি আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন এবং উড়ন্ত পাখী ও বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত হন। এই সময় ফ্লোরেন্সের একজন ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী ম্যাডোনা লিসার ছবি আঁকতে সম্মত হন। তিন বছর পরে তিনি ছবি সম্পূর্ণ করেন এবং তা আজকের দিনে জগদ্বিখ্যাত "মোনা লিসা" নামে পরিচিত। এই সময়ই তিনি আর্ণো নদীর গতিপথকেও পরিবর্তিত করেন। একই সময়ে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় যদিও লিওনার্দোর কোন ইচ্ছেই ছিল না। ঘটনাটা এরকম: ফ্লোরেন্সের সিনোরা তাঁকে সভা কক্ষের সম্পূর্ণ দেওয়ালটা ছবি আঁকতে দেন। কিন্তু তিনি ছবি আঁকার কাজটা খুব ধীরে ধীরে করতে থাকেন। সেজন্য উল্টোদিকের দেওয়ালে ছবি আঁকার কাজটা মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর হাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

লিওনার্দোর পরীক্ষামূলক মনোভাবের জন্য তাঁকে একবার এক অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। ঘটনাটা এই রকম: আনঘিয়ারীর যুদ্ধের ছবি আঁকার জন্য সভাকক্ষের দেওয়ালগুলোতে তিনি বিশেষ এক রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ লাগান যাতে করে ছবির রঙিন অংশগুলো ভালো করে ফুটে ওঠে। ছবি আঁকার পর দেখা গেল যে রংগুলো আশাতীত ভাবে সুন্দর ফুটে উঠেছে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে শুকোচ্ছে না। সেজন্য তিনি অল্প কিছু দূরে আগুন জ্বালিয়ে গরম হাওয়া দিয়ে শুকোতে যান। ফলে ছবির ঘোড়া ও মূর্তির চিত্রগুলোর রং গলে গলে নীচের দিকে পড়তে থাকে এবং ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন বাদেই, ১৫০৬ সালে, ফ্রান্সের রাজার ভাইসরয় চার্লস ডি' অ্যামবয়েস তাঁকে মিলানে নিয়ে যান এবং চিত্র শিল্প ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কাজে নিয়োগ করেন। রাজা দ্বাদশ লুই শুধুমাত্র তাঁর বিরাট শিল্প প্রতিভাই নয়, তাঁর বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদ্যার প্রতিভা সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন।

ফলে রাজা দ্বাদশ লুইয়ের ভাইসরয়ের চিত্র শিল্পী ও কারিগরী শিল্পী হিসেবে নিযুক্ত হন। এই নতুন পদ তাঁকে খ্যাতি ও অর্থনৈতিক স্থিতি এনে দেয়। সে সময়ে, তিনি জলের প্রকৃতির ওপর একটা নতুন বই লিখতে শুরু করেন। এটা তাঁর আগের লেখা হাইড্রলিকস্ ও জলের ক্ষমতার ওপর বইটার থেকে আলাদা ছিল। কারণ, আগেরটা ছিল অব্যবহারিক কিন্তু পরেরটা ব্যবহারিক। এই সময়ই তিনি তাঁর লেখা সমস্ত নোটগুলো একত্র করেন এবং খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করেন ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। সে সময় তিনি ফ্রানসেসকো ডি মেলজি নামে একজন ছাত্রকেও নিয়োগ করেন। ফ্রানসিসকো ক্রমে ক্রমে তাঁর ছেলের মতন হয়ে উঠতে লাগল এবং সেই সম্পর্ক দা ভিন্সির শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। একবার ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস তাঁর রাজ্যে লিওনার্দোকে আমন্ত্রণ জানান। তখন লিওনার্দো অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু ঐ অসুস্থ অবস্থায়ই পুত্রসম ছাত্র ফ্রানসিসকো ডি মেলজিকে নিয়ে সুদূর ফ্রান্সে পাড়ি দেন। সেখানে লিওনার্দো প্রচুর খ্যাতি ও একটা বিরাট অঙ্কের পেনসন লাভ করেন যা কোনদিনও তিনি তাঁর স্বদেশভূমিতে পান নি।

তাঁর শেষ জীবন অ্যামবয়েসেই কাটে। সেখানেই তাঁর নোটগুলো প্রকাশিত করার আগেই, ১৫১৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্বের জীবনীকাররা বা তাঁর অনুসরণকারীরা, তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে নিছক একটা খেয়াল হিসেবে গণ্য করে এসেছেন। এভাবে প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সেগুলো জগতের কাছে অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাঁর সেই আবিষ্কারগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণ হয়। মূল্যায়ণের ভিত্তিতে বলা যায় যে বিজ্ঞান জগতে তিনি সত্যিই একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তি, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক কালের মত পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্ত কিছুর উত্তর জানতে চেষ্টা করেন। সেই সময়েও লিওনার্দো অনেক কিছুই জানতেন যা পরে গ্যালিলিও, নিউটন, ওয়াট প্রভৃতিরা আবিষ্কার করেন। মানব শরীর তত্ত্বের ওপর তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং আঁকা ছবিগুলো এতই সঠিক ছিল যে, রক্ত সংবহন তন্ত্র আবিষ্কারের জন্য হার্ভের থেকে তাঁকেই মোটামুটি ভাবে কৃতিত্ব দেয়া যেতে পারে।

·········নিকোলাস কোপার্নিকাস··························

(খ্রীষ্টাব্দ ১৪৭৩—১৫৪৩)

১৫০২ সাল। রোমের ইউনিভার্সিটি। জ্যোতির্বিদ্যার একজন তরুণ প্রফেসার বিশ্বের গঠনের ওপর বক্তৃতা দিতে দিতে এক মুহূর্ত থামলেন। তারপরে আবার পুরোনো বক্তৃতার জের টেনে টলেমিয় গঠন সম্বন্ধে বলতে লাগলেন: "বিশ্বের কেন্দ্রস্থল পৃথিবী। সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটা গ্রহ সঠিক বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এছাড়াও স্থির নক্ষত্রগুলো পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এই মূল সত্যই পনেরশো বছর আগে মহান ক্লডিয়াস টলেমি বলে গিয়েছেন এবং এগুলো মূলতই স্পষ্ট।" একজন ছাত্র তাঁকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "স্যার, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস যে তর্ক তোলেন বিশ্বের কেন্দ্রস্থল পৃথিবী নয় সূর্য। তাহলে স্যার কোনটা ঠিক?" প্রত্যেক বারের মতন সেবারও তিনি উত্তর দিলেন যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের বাসভূমি পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু সেবারে তাঁর মনে বেশ সন্দেহ দেখা দেয় এবং পড়ান বন্ধ করে হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। ইনিই হচ্ছেন কোপার্নিকাস। পুরো নাম নিকোলাস কোপার্নিকাস। জন্ম পোলাণ্ডের থর্ণে। থর্ণ বাল্টিক সাগরের কাছে। ভিসটুল নদীর তীরে একটা বন্দর-শহর। তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী। নিকোলাসের শ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তখন থেকেই নিকোলাস তাঁর কাকা, পোলাণ্ডের একজন গণ্যমান্য বিশপ লুকাস ওয়াটজেলরোল্ডের কাছে মানুষ। ছেলেবেলায় একদিকে যেমন ব্যবসায়ী বাবা এবং গীর্জা পরিচালক কাকার ব্যবহারিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনে ছাপ রেখেছিল; অন্যদিকে এশিয়া, ইটালী, রাশিয়া ও অন্যান্য সুদূর থেকে থর্ণে আসা নাবিক এবং ব্যবসায়ীদের গল্পগুলো তাঁর কল্পনা শক্তিকে উজ্জীবিত করে তুলত।

১৪৯২ সালে যখন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে পৃথিবীর একটা নতুন ভূগোল রচনা করলেন। তখন কোপার্নিকাস পোলাণ্ডের ক্র্যাকাউ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অ্যালবার্ট ব্রুডজেমুস্কির অধীনে শিক্ষালাভ করেন। ব্রুডজেমুস্কি একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং নিকোলাসকে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তবুও বিশপ কাকার উপদেশ মতো তিনি ডাক্তারী বিদ্যা নিয়ে

পাশ করেন যাতে করে তিনি সরাসরিভাবে পোলাণ্ডের দেশবাসীদের বেশী উপকারে লাগতে পারেন।

ক্রাকাউয়ের কর্মজীবন নিকোলাসের দরজাগুলো খুলে দিল। তিনি শিক্ষা ও রেনেসাঁসের কেন্দ্রস্থল ইটালীতে গিয়ে পড়বার কথা তাঁর কাকাকে বললেন। তাঁর কাকা রাজী হয়ে বোলোমনা ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে তিনি আইনশাস্ত্র এবং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষালাভ করেন। তিনি গ্রীক ভাষাও শিক্ষালাভ করেন যাতে করে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌দের মূল বইগুলো এবং প্রাচীন আরবী গণিতজ্ঞদের গ্রীক ভাষার অনূদিত বইগুলো পড়তে পারেন। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্য এবং চিত্রকলার ওপরও তাঁর দক্ষতার উন্নতি বিধান করেন।

সেই সময়ে তিনি রোমের ইউনিভার্সিটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ট্রাডিশনাল টলেমিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানই পড়াতেন। কিন্তু টলেমিকৃত জগতের গঠন সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়। সেজন্য রোমের অধ্যাপনা ছেড়ে নিজের বাড়ি ফ্রাউয়েনবার্গে ১৫০৪ সালে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি নিজেকে "টলেমি না পিথাগোরাসকে ঠিক জানতে" সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করেন : তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতেন : যদি সূর্য পৃথিবীর চারদিকে একটা নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে তাহলে ঋতু পরিবর্তন কিভাবে হয়? কিভাবে প্রত্যেক বছরে কিছু কিছু গ্রহ ও নক্ষত্র স্থান পরিবর্তন করে? যদিও সেই সময়ে কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি অ্যাবারেশন (গ্রহ নক্ষত্রের আপাতদৃষ্ট স্থানচ্যুতি), খেয়ালী স্থান পরিবর্তন অথবা গ্রহের অভ্যন্তরের রহস্যময় গতিবিধি বলে সেই সমস্ত পরিবর্তনগুলোর ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো তাঁর কাছে খুবই হাস্যকর লাগত।

যাইহোক ফ্রাউয়েনবার্গে তাঁর কাকার সহকারী এবং চিকিৎসক হিসেবে, গীর্জা ও স্বদেশবাসীদের উপকার করতে লাগলেন, দক্ষ ডাক্তার হিসেবে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি গরীব এবং অভাবী দেশবাসীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। এছাড়াও খরার সময়ে জলের সুবিধার্থে বাঁধ নির্মাণ এবং দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য জমা করার ব্যাপারে তাঁর মতামত নেওয়া হোত। একবার তিনি পোপের অনুরোধে ক্যালেণ্ডারকে আরো বেশী সঠিক করতে কিছু ব্যবহারিক সংস্কারও করেছিলেন। আজকের আধুনিক ক্যালেণ্ডারের উন্নতি সাধক ক্ল্যাভিয়াস এক জায়গায় বলেছেন, "কোপার্নিকাস প্রথম বছরের সঠিক কাল-পরিমান আবিষ্কার করেন"। কারণ দেখা গেছে যে, কোপার্নিকাসের

নির্ধারিত বছরের কাল-পরিমাণ এবং সঠিক বছরের দৈর্ঘ্যের তফাত মাত্র আঠাশ সেকেন্ড। পোলান্ডের অর্থনৈতিক সমস্যার সময় তিনি পোলান্ডের মুদ্রা ব্যবস্থাকে সংশোধন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করেন।

এত সব সত্বেও তাঁর মন জগতের গঠন সম্বন্ধে সেই খটকা লেগে আছে। রাত্রে তিনি খালি চোখে গ্রহ ও নক্ষত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতেন ও তাদের অবস্থান নির্ণয় করতেন এবং আগেকার প্রায় সব জ্যোতির্বিদদের লেখা পড়তেন। যেহেতু সে যুগে টেলিস্কোপ তখনও আবিষ্কার হয় নি সেজন্যে তাঁকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হোত। আবহাওয়ার জন্য দূরের আকাশ অনেক সময় তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে যেত। এজন্য তাঁকে বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে এগোতে হয়েছিল। তিনি ১৯০৫ এবং ১৫১১ সালে গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নিজেই বিশ্বের একটা আলাদা গঠন চিন্তা করেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই অঙ্কের সূত্র দিয়ে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি এবং শুক্রের অবস্থান নির্ণয় করেন। পরে, বছর পর বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি পূর্বোক্ত গ্রহগুলোর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে তাঁর নির্ধারিত অবস্থানগুলোর সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

অবশেষে তিনি টলেমীর বিশ্বের গঠনকে ভুল বলে প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, সূর্য্যই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহরা এবং অসংখ্য নক্ষত্ররাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারিদিকে পাক খাচ্ছে, ফলে দিন রাত হচ্ছে।

কোপার্নিকাস যদিও প্রথত সত্যই আবিস্কার করেছিলেন, কিন্তু মানুষের কাছে তা পেঁছান খুবই বিপজ্জনক ছিল। কারণ তা করতে হলে মানুষের দীর্ঘদিনের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাস এবং ধর্মমতের ওপর আঘাত করতে হবে। সেজন্য তিনি তঁার আবিষ্কারকে না ছেপে, অনুগামী শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়াতে লাগলেন? কিন্তু তাতেও বিপদ ছিল। মার্টিন লুথার তাঁকে একজন নির্বোধ বলে অভিযোগ করলেন এবং তিনি নাকি জ্যোতির্বিদ্যাটাকেই বিপর্যস্ত করে তুলতে চাইছেন। ক্যালভিন তাঁর বিরুদ্ধে বাইবেলের ৯৩তম শ্লোক উল্লেখ করলেন, "পৃথিবী স্থির; এটা কখনও নড়াচড়া করতে পারে না।"

জীবনের শেষদিকে কোপার্নিকাস তঁার মতামত প্রকাশ করতে রাজী হন। তিনি যাজকসম্প্রদায়ের অনুমোদনের জন্য তৃতীয় পোপ পলকে উৎসর্গ করে একটা বই লেখেন "দি রিভলিউশানিবাস অররিথাম কোয়েলেসটিয়াম" (মহাজাগতিক বস্তুগুলোর ঘূর্ণন সংক্রান্ত)। নুরেমবার্গের একজন মুদ্রাকর যদিও তা

ছেপেছিল কিন্তু তবুও সে ভয় পেয়ে সেটাকে বৈজ্ঞানিক বই না বলে একটা মজার বই হিসেবে বাজারে বের করেছিল। কিন্তু কোপার্নিকাস এটা দেখলে সত্যিই উত্যক্ত হয়ে উঠতেন কিন্তু ছাপা বইটি পড়বার আগেই ১৫৪৩ সালে ২১শে মে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই গ্যালিলিও, ব্রাহে, কেপলার, নিউটন, আইনস্টাইন এবং অন্যান্যরা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরসূরীরা কু-সংস্কারে ওড়া বিশ্বাসগুলোকে উৎপাটিত করতে সমর্থ হন। এ ছাড়াও তিনি সুদৃঢ় একটা বৈজ্ঞানিক গবেষনার নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ভিত তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা। নিকোলাস কোপার্নিকাস সত্যি সত্যিই রেনেসাঁস আমলের এক মহান প্রতিভা।

ফিলিপ্পাস অরিওলাস প্যারাসেলসাস

[থিয়োফ্রাসটাস রম্বাসটাস ওন হোয়েনহিয়াম] (খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৩— ৫৪১)

১৫২৮ সাল। সুইজারল্যাণ্ডের বাসলের এক বিচারসভা। বিচার হচ্ছে একজন চিকিৎসকের। বিচার দেখতে শহরের লোক উপচে পড়েছে। দর্শকদের মধ্যে তাঁর কিছু গুণমুগ্ধ ছাত্রও আছে। তাদের চোখে তাদের শিক্ষকের নির্ভীকতা ও চিকিৎসা-দক্ষতার জন্য অসীম শ্রদ্ধা। অপরদিকে বিত্তবান ডাক্তার, ওষুধ নির্মাতা, ওষুধ বিক্রেতা ও তাদের মোসাহেবদের একটা দল ও দর্শকদের মধ্যে হাজির। তাঁদের চোখে এই চিকিৎসার প্রথাবিরুদ্ধ মতবাদের জন্য তাঁর প্রতি নিঃসীম ঘৃণা। যাই হোক এক বৃদ্ধ বিচারক রায় পড়বার জন্য তৈরী। সমস্ত বিচারকক্ষ নিস্তব্ধ। বিচারক অবশেষে রায় পড়লেন "এই চিকিৎসক এক রোগীকে আরোগ্য করবার পারিশ্রমিক হিসেবে একশ গুল্ডেন (জার্মানীর অপ্রচলিত মুদ্রা) দাবী করেছেন। কিন্তু কোর্টের মতে তাঁর এই দাবী অবাস্তব। কারণ রোগীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য তাঁর দেওয়া কতকগুলো বড়ি নয় বরঞ্চ প্রকৃত। সেজন্য বিচারের রায় অনুযায়ী, রোগীর প্রস্তাবিত ছয় গুল্ডেন পারিশ্রমিক চিকিৎসকের পক্ষে অনেক।" এই কথাগুলো শুনে চিকিৎসকের আপাদমস্তক রি-রি করে জ্বলে উঠল। তিনি প্রতিবাদে চেঁচিয়ে বললেন ; "এটা বিচার নয়, বিচারের নামে

একটা প্রহসন! আমার বিরুদ্ধে অযোগ্য ডাক্তার, ওষুধ নির্মাতা ও হাতুড়ে বৈদ্যদের অশুভ আঁতাতে আপনারা, বিচারকরাও যোগ দিয়েছেন।" তাঁর এক বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। কারণ সে সমস্ত কথা বলা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধের পর্যায়ে অভিযুক্ত হওয়া। কিন্তু ততক্ষণে নির্ভীক, ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মহান চিকিৎসক প্যারাসেলসাসের জীবনে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। কারণ সেই রাত্রেই তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধের অভিযোগ খাড়া করল। তাতে হয়ত তাঁর জীবন সংশয়ও ছিল, কিন্তু তখনই তিনি বাসল ছেড়ে চলে যান। এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তেরোটা বছর ধরে নিঃসঙ্গ নিঃস্ব অবস্থায় বাড়ীঘর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান।

প্যারাসেলসাসের আসল নাম থিয়োফ্রাসটাস বম্বাসটাস ভন হোহেনহিয়াম। প্যারাসেলসাস নামটা তিনি নিজেই বাসলের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অবস্থায় আত্মশ্লাঘায় গ্রহণ করেন। কারণ তাও তিনি যে প্রাচীন রোমান চিকিৎসক সেলসাসেরই সমকক্ষ তা দেখাতে চান। প্যারা শব্দের অর্থ সমান।

প্যারাসেলসাসের জন্ম সুইজারল্যাণ্ডের আইনসাইডেল্লের এক হাসপাতালে। তাঁর মা ঐ হাসপাতালেরই প্রধান ছিলেন। তাঁর বাবা একজন নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি চাইতেন তাহলে একটা সহজ, স্বচ্ছল, নির্বিঘ্ন জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৌভাগ্য তিনি তা করেন নি। তাঁর প্রথম জীবনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য কৃতিত্ব তাঁর অভিভাবকদের এবং বাসলের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর তিনি সুইডেন ও টাইরেলের বিভিন্ন খনি অঞ্চলে কয়েক বছর রসায়নবিদ্ হিসেবে কাজ করেন। তারপর তিনি দশ বছর ধরে চিকিৎসা বিদ্যার আরো বেশী ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিস্তৃত তথ্যের সন্ধানে ইউরোপ এবং অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তিনি সার্জেন হিসেবেও রাজার সেনাদলে কাজ করেন এবং কনস্টাণ্টিনোপল, প্রাচীন ইজিপ্ট এবং পারসিয়া পরিদর্শন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ধরণের লোকের সংস্পর্শে আসেন; যেমন—জিপসী, নাপিত-সার্জেন, অ্যালকেমিবিদ্, যাদুকর, কবর চোর, জ্যোতির্বিদ্ ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলে গেছেন: "পৃথিবীর সমস্ত কোণেই আমি লোককে প্রশ্ন করেছি, সত্যের অন্বেষণ করেছি এবং চিকিৎসা বিদ্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।"

১৫২৬ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং বাসলের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক ওষুধের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে সারা ইউরোপ জুড়ে

রেনেসাঁসের ঝড় বইছে। সাহসী লোকেরা নতুন সত্যের সন্ধানে রত, প্রাচীন তথ্যের যাচাইকরণে মত্ত। কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদের প্রবর্তন। এই ঝড় প্যারাসেলসাসের গভীরেও প্রতিক্রিয়া করল। তিনিও তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর মতে রোগের প্রকৃত কারণ কতকগুলো বাইরের জীবাণুর শরীরের ওপর আক্রমণ। জীবাণুগুলোই শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলোকে বাধা দান করে। সেজন্য জীবাণুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং দেহের জীবনী শক্তিকে বাড়াতে কতকগুলো রাসায়নিক যৌগের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর মতে রসায়ন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হবে সোনা তৈরী করা নয়, ওষুধ তৈরী করা। এজন্য তিনি অনেক রাসায়নিক যৌগও তৈরী করেন, যেমন পারদ, আর্সেনিক ও দস্তার অনেক যৌগ-লবণ।

তিনি এই সময় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ঘৃণা প্রদর্শন করে সর্বসমক্ষে গ্যালেন ও অ্যাবিসিনার কিছু কিছু বইপত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং চিরাচরিত ল্যাটিন ভাষায় না বলে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বাসলের সরকারী শহর চিকিৎসক হিসেবে তিনি দাবী করেন যেন তাঁকে ওষুধ নির্মাতা ও বিক্রেতাদের ওষুধ নির্দেশক কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি প্রকাশ্য ভাবেই চিকিৎসাবিদ্, চিকিৎসার অধ্যাপকগণ এবং ওষুধ বিক্রেতা ও নির্মাতাগণকে সমালোচনা করে আক্রমণ করেন। তিনি অসুস্থতার প্রাচীন কারণ রক্ত, পিত্ত-সমতার ঘাটতির তত্ত্বকে বাতিল করে দেন এবং পরিচিত রোগের জন্য বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ওষুধের প্রচলন করেন। এবং এইভাবে মধ্যযুগীয় বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতা ও কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেন।

যাইহোক এর ফলে তদানীন্তন চিকিৎসা জগৎ ও ক্ষমতার জগতে থাকা অনেক লোকের শত্রুতা অর্জন করেন। ফলে ১৫২৮ সালের এক রাত্রে তাঁকে বাসলে ছাড়তে হয়। নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব অবস্থায় তিনি পথে পথে ঘুরতে থাকেন। এই অবস্থায়ও তিনি অনেক শহরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বা স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ পান। তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং ভ্রাম্যমাণ আরোগ্যকারীর ভূমিকা নেন। এই অবস্থায় প্রায়ই তাঁর ঠিকমত খাওয়া পরা জুটতো না। পরে জীবনের শেষ ভাগে তিনি আবার অ্যালকেমীর দিকে ঝোঁকেন এবং ধাতুকে সোনায় পরিণত ও জীবনের অনন্ত যৌবন লাভের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ, অমোঘ ঔষধ তৈরি করার সন্ধানে রত হন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল (জানি না হতেন কিনা) হবার আগেই ১৫৪১ সালে নিদারুণ দারিদ্রতায় সালজবারগের এক জীর্ণ, বিবর্ণ সরাইখানায় তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

কিন্তু তাঁর জীবন তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে একটা আদর্শ। তাঁর প্রতিবাদের

প্রতিধ্বনিই চিকিৎসা বিদ্যার কু-সংস্কারের উপর এক লৌহ যবনিকা টেনে দেয়। বহু বছর আগেই প্যারাসেলসাস যা উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞান তা অনেক পরে তার সম্যক পরিচিতি লাভ করে। উপসংহারে, প্যারাসেলসাসের সম্বন্ধে বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের একটি উক্তির কথা উল্লেখ করা যায়—

But after, they will know me
............I shall emerge one day.

............আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াস............

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫১৪—১৫৬৪)

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির (শরীরতত্ত্ব বিদ্যা) একটি ক্লাস। ক্লাস নিচ্ছেন জ্যাকোবাস সিলভিয়াস নামে একজন শিক্ষক। তিনি এক প্রাচীন জীর্ণ অ্যানাটমির বই থেকে একঘেয়ে বলে যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে সহকারী ডোমদের নির্দেশ দিচ্ছেন শরীরের সেই বিশেষ বিশেষ অংশগুলো কেটে আলাদা আলাদা করে ছাত্রদের দেখাতে। অল্প দূরে ডিসেকশান (শব-ব্যবচ্ছেদ) টেবিলের ওপর একটা শবদেহ। সহকারী অযোগ্য ডোমরা তাদের কসাইয়ের ভোঁতা ছুরি দিয়ে শবদেহ অংশগুলো পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে যা তা করে কাটছে এবং শিক্ষকের নির্দেশমত ছাত্রদের দেখাচ্ছে। শবদেহের দুর্গন্ধ থেকে বেশ নিরাপদ তফাতে বসে একজন তরুণ ফ্লেমিস ডাক্তারী ছাত্র অনেকক্ষণ থেকেই ব্যাপারগুলো সব লক্ষ্য করেন। শেষে বিরক্ত হয়ে আর থাকতে না পেরে ডিসেকশান টেবিলের কাছে আসেন এবং হাবাগোবা অজ্ঞ ডোমদের একপাশে সরিয়ে দেন। তারপর সকলকে মুগ্ধ করে দিয়ে এক নিঁখুত দক্ষতার সঙ্গে শবদেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুনভাবে আলাদা আলাদা করে ফেলেন। এত নিপুন এর আগে অন্যান্য ছাত্ররা কখনও দেখেনি। এই তরুণ ছাত্রই হলেন অ্যানাটমি জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা—আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াস।

ছাত্রদের জয়ধ্বনি ও উল্লাসের জন্য জ্যাকোবাসকে মনের রাগ মনেই পুষতে হল। কারণ অর্থলোভী জ্যাকোবাসকে অর্থের জন্য ছাত্রদের ওপরই নির্ভর করতে হোত। কিন্তু এই জ্যাকোবাসই পরে ভেসালিয়াসের এক প্রচন্ড শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং শুধুমাত্র তাঁর জীবনকে দুঃখজনকই করে তোলেন যে তা নয় তাঁর প্রিয় অ্যানাটমি শিক্ষাদান থেকেও বিরত হতে বাধ্য করেন।

আঠার বছরের ভেসালিয়াসের অ্যানাটমির এই জ্ঞান ও দক্ষতা কিন্তু হঠাৎ কোন ব্যাপার নয়, তিনি ঐতিহ্যগত ভাবেই তা অর্জন করেন। তাঁর বাবা ব্রাসেলসের একজন চিকিৎসক ও ওষুধ নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা প্রায় সবাই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর মা পরিবারের চিকিৎসার বই ও লেখাগুলো সংগ্রহ করে বাড়ীতেই একটা বিরাট লাইব্রেরী তৈরী করেন—যার কথা ষোড়শ শতাব্দীতে ভাবাও যায় না। যাই হোক তাঁর মাই ছেলের ভেতর জ্ঞানালিপ্সা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করেন। এমনকি ছোটবেলায় তাঁর প্রতিভাবান অন্তরে তখনকারের চলতি ওষুধের অপ্রাচুর্যতার কথা উপলব্ধি করেন এবং এও অনুভব করেন যে, কোন রোগের সফল চিকিৎসা করতে হলে, শরীরের গঠন প্রকৃতি নিঁখুত করে সম্পূর্ণভাবে জানতে হবে। সেই বয়সেই তিনি ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন এবং খুব যত্নের সঙ্গে মায়ের টেবিলেই সেগুলোর ডিসেকসান করতেন। এইভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে লাগল এবং ছোটবেলা থেকেই ডিসেকসানে তাঁর হাতগুলো এমন অসাধারণ দক্ষতা লাভ করল, যা পরে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ করত।

ভেসালিয়াসের প্রথম পড়াশোনা শুরু হয় লাউভেইনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, হিব্রু ভাষা খুবই ভালভাবে রপ্ত করেন। কিন্তু তাঁর অ্যানাটমির ওপর একটা গভীর আগ্রহ ছিল। সেই সময় লাউভেইনে শব-দেহের ডিসেকসান নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য অ্যানাটমি পড়তে ১৫৩৩ সালে তিনি প্যারিসে আসেন এবং প্যারিসে তাঁর ভবিষ্যতের শত্রু জ্যাকোবাস সিলভিয়াসের কাছে অ্যানাটমি পড়তে শুরু করেন।

বাকপটুতা ও বিশাল জ্ঞানের জন্য সিলভিয়াসের প্রচুর সুনাম ছিল। প্রথম দিকে তিনি ক্লাসিকাল ভাষা পড়াতেন। এই পড়াতে পড়াতে তিনি প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থগুলোর সংস্পর্শে আসেন। এবং পরের দিকে অত্যাধিক অর্থ লালসার জন্যই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াতে শুরু করেন। কারণ অ্যানাটমি শিক্ষক হিসাবে বছরে প্রায় চার-পাঁচশো ছাত্রের কাছ হতে অর্থ পেতেন। তিনি গ্যালেনের লেখা অ্যানাটমি বই থেকে প্রত্যেকটা অক্ষর পড়ে যেতেন। গ্যালেনের অসংস্কারিত বইই তিনি অ্যানাটমির বেদবাক্য স্বরূপ মনে করতেন।

কিন্তু ভেসালিয়াসের তীক্ষ্ম চোখে গ্যালেনের লেখা অ্যানাটমির বর্ণনা ও শরীরের সঠিক গঠনের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য ধরা পড়ত। ফলে তাঁর মত অনুযায়ী গ্যালেনের এই ত্রুটি নিয়ে ভেসালিয়াসের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই এক তিক্ত ঝগড়ার সৃষ্টি হত। ভেসালিয়াস গ্যালেনের মতবাদের প্রতি কোন সন্দেহ অথবা

বিরূদ্ধতা সহ্য করতেন না। এবং ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা বিরাট বিভেদের পাঁচিল উঁচু হয়ে দাঁড়াল। ফলে ভেসালিয়াসের মনে প্যারিস সম্বন্ধে ক্রমেই অস্বস্তি বাড়তে লাগল। সে সময়েই তিনি অ্যানাটমি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "একটা ঘৃণ্য, জঘন্য কঠোর পরীক্ষা যাতে ডোমরা কাটাছেঁড়া করে আর অধ্যাপকেরা দূরে দাঁড়িয়ে একটানা কতকগুলো এমন জিনিষের সম্বন্ধে বকবক করে যার যাদের সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই।"

গভীর হতাশায় মেডিকেল ডিগ্রি না নিয়েই ১৫৩৬ সালে আবার লাউভেইনে ফিরে আসেন। এ সময়ে চতুস্পদ প্রাণীদের গঠন প্রকৃতির ওপর তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে তিনি শুয়োর, কুকুর, ইঁদুর প্রভৃতির ওপর ডিসেকসান করতেন। এছাড়াও মানব দেহের গঠন প্রকৃতি জানবার জন্য রাতের অন্ধকারে গুড়ি মেরে, লোককে যেখানে ফাঁসি দেওয়া হয়, সেখানে যেতেন এবং মাটি খুঁড়ে অপরাধীদের শবদেহগুলো নিয়ে আসতেন। একবার তিনি এই করতে গিয়ে এক পাল বুনো কুকুরের আক্রমণে পড়েন এবং কোনওক্রমে বেঁচে পালিয়ে আসেন। কিন্তু এই সমস্ত শবদেহগুলোকে তিনি এমন অবস্থায় পেতেন যে তার থেকে কখনই পূর্ণ গঠন জানা যেত না. শুধুমাত্র আংশিক গঠনই জানা যেত। কিন্তু একবার এক রাতের অভিযানে গিয়ে তিনি দেখেন যে, ফাঁসিকাঠের ওপরে দড়ি থেকে প্রায় একটা সম্পূর্ণ কংকাল ঝুলছে। কাক-শকুনে তার সমস্ত মাংসই খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র তার সাদা হাড়গুলো রয়ে গেছে। তিনি সেটাকে নিয়ে আসেন। ছোটখাটো যে হাড়গুলো ছিল না, সেগুলো অন্য জায়গা থেকে এনে তার দিয়ে জুড়ে দেন এবং প্রথম একটা পূর্ণ কংকাল তৈরী করেন। তিনি সেটাকে গবেষণাগারের এক কোণে সযত্নে রেখে দেন।

পরবর্তী বছরে তাঁর জীবনে দুটো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মানব শরীরতত্ত্বের উপর প্রথম শিক্ষাদান এবং তাঁর প্রথম বই প্রকাশনা। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। লাউভেইনে তখন মানব শরীরের অঙ্গ ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মের অনেক শিথিলতা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য সাধারণ লোককেও ফাঁসি দেওয়া অপরাধীদের কংকালগুলো নিয়ে যাবায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভেসালিয়াসের প্রথম অ্যানাটমি ক্লাসটা চিকিৎসা ইতিহাস সতিাই প্রথম। কারন সেই প্রথম তিনি নিজে মানব দেহের সম্পূর্ণ অঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন করেন।

ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে তিনি প্রতিভাবান চিকিৎসক রেজেস এর লেখা আরবী ভাষায় এক চিকিৎসা-গ্রন্থকে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে দেহের সমস্ত অংশের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা আছে।

অ্যানাটমির ওপর একটা সম্পূর্ণ নতুন বই লেখার জন্য তিনি পাদুয়ায় যান। সেখানে প্রথমে শল্য চিকিৎসার এবং পরে অ্যানাটমির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে তাঁর সেই প্রিয় কংকালটিকে পিছনে প্রহরীর মত দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অ্যানাটমি পড়াতে তিনি প্রথমে বহির্গঠনের একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান বর্ণনা দিতেন এবং পরে খুঁটিনাটি, নিখুঁত বর্ণনা দিতেন। এজন্য তালিকা ও ছুরির সাহায্যও নিতেন। সে সময় তাঁর অ্যানাটমির বক্তৃতা শুনতে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার ও ছাত্ররাও জমায়েত হোত।

কিন্তু তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে অ্যানাটমি পড়া এবং তার ব্যাপক ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের অ্যানাটমির একটা পাঠ্য বইয়ের খুবই প্রয়োজন। সেজন্য তিনি একটা সঠিক, সেরা, নিখুঁত অ্যানাটমির বই লেখার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। মনে মনে বইটার একটা মোটামুটি ছকও এঁকে ফেললেন। তারপরে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর সেরা শিল্প কর্ম "ডি হিউম্যান কর্পোরিস ফ্যাব্রিকা" (দি স্ট্রাকচার অফ দি হিউম্যান বডি) লিখতে আরম্ভ করেন, বইয়ের অ্যানাটমিকাল চিত্রের প্লেটগুলো তিনি, জ্যান ওন ক্যালকার নামে একজন শিল্পীকে দিয়ে আঁকান। শোনা যায়, জ্যান ওন ক্যালকার সঠিক চিত্রের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কুৎসিত, দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে শবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। ভেসালিয়াস এক জায়গায় বলে গেছেন যে বইয়ের ভেতরকার ডিসেকসানের বর্ণনা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিত্রগুলোর জন্য তাঁকে এবং তাঁর চিত্র শিল্পীকে এক অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়।

তিনি সে সময় প্রচন্ড অধ্যাবসায়ের সঙ্গে লিখতে শুরু করেন এবং তিনি এক বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ করেন। তারপর বইয়ের ছাপা অক্ষরগুলো এবং চিত্রগুলো যাতে নিখুঁত ও সর্বোৎকৃষ্ট মানের হয় তার জন্য তিনি ম্যানসস্ক্রিপ্ট এবং কাঠের প্লেটগুলোকে জাহাজে করে সুইজারল্যান্ডের বাসলেতে একজন বিখ্যাত মুদ্রাকরের কাছে পাঠান। অবশেষে ১৫৪২ সালে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক রূপান্তরিত করে বইটা নিখুঁত ভাবে ছেপে বের হয়—তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সফল লাভ করে।

ঠিক সেই সময়েই, তাঁর পুরানো শত্রু সিলভিয়াস, তাঁর ওপর এক চরম আঘাত হানলেন। যেহেতু আগে ভেলাসিয়াস একবার সিলভিয়াসের শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেন, সেজন্য সিলভিয়াসের ভেলাসিয়াসের ওপর প্রচন্ড প্রতিশোধস্পৃহা বশত সিলভিয়াস ভেলাসিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে ভেলাসিয়াস একজন উঠতি, নীতিবিরুদ্ধ, পাগল যিনি তাঁর ধ্বংসাত্মক

করে তুলছেন। এতে ভেসালিয়াস বেশ আঘাত পেলেন। তবে সবচেয়ে বেশী মর্মাহত হলেন। যখন দেখলেন যে তাঁরই ছাত্র ও সহকর্মীরা ভেসালিয়াসের মন্তব্যকে সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে। তখন দুঃখে, বিরক্তিতে চিরদিনের জন্য পাদুয়া পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই ভেসালিয়ায়সের বিজ্ঞানী জীবনের অগ্রগতি চিরদিনের জন্য থেমে গেল।

১৫৪৪ সালে পাদুয়া ছেড়ে তিনি স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের আমন্ত্রণে স্পেনে চলে যান। সেখানে রাজপরিবারের চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরের কুড়িটা বছর সেখানেই কাটান। কিন্তু স্পেনে বিজ্ঞান তখনও অনেক কু-সংস্কারে আবদ্ধ—তখনও সেখানে মানবদেহের ডিসেকসান এক অপবিত্র, এক পাপ বলে মানা হোত। ফলে স্পেনে ভেসালিয়াসের পক্ষে ডিসেকসান করা তো অনেক দূরের কথা, একটা মড়ার মাথা ছুঁয়ে দেখাও সম্ভবপর হয় নি। এই ভাবেই তিনি তাঁর দীর্ঘ, স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসিত জীবনে বিজ্ঞানের আর কোনও রূপ উন্নতি সাধন না করেই তিলে তিলে শেষ পরিণতির দিকে এগোতে লাগলেন।

এদিকে পাদুয়ায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হতে লাগল। নতুন চিকিৎসকরা অ্যানাটমির ওপর ভেসালিয়াসের দানের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারল। তখন পাদুয়ায় অ্যানাটমির অধ্যাপক ফ্যালোপিয়াস, যিনি ভেসালিয়াসের পাদুয়া ছাড়ার পরেই ঐ পদে নিযুক্ত হন। ফ্যালোপিয়াসের মত অধ্যাপকরাও ভেসালিয়াসের নির্দেশিত পথে চলতে শুরু করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ ১৫৬২ সালে ফ্যালোপিয়াস মারা যান। সেই শূন্য জায়গা পূরণের জন্য ইটালীতে আর কোন সুযোগ্য শারীরতত্ত্ববিদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন সেই জায়গায় আবার সেই পুরোণো দক্ষ, প্রতিভাবান, সুযোগ্য ভেসালিয়াসের ডাক পড়ল। জয়লাভের জন্য এটাই ছিল ভেসালিয়াসের সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু না, পারলেন না। সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও বিধির অমোঘ বিধানে তা সদ্ব্যবহার করতে অসমর্থ হলেন। কারণ ইটালীতে ফিরে আসার ঠিক আগেই, তিনি জেরুজালেমে এক তীর্থযাত্রায় যান। জেরুজালেম থেকে জাহাজে ফেরার পথে ভূমধ্যসাগরে এক ভয়াবহ ঝড়ের সামনাসামনি হন। ফলে জাহাজ দুর্ঘটনায় গ্রীসের উপকূলের কিছু দূরে একটা ছোট দ্বীপে গিয়ে পড়েন। এবং সেখানেই নিদারুণ পরিশ্রান্তিতে ১৫৬৪ সালের অক্টোবর মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ভাবেই আধুনিক অ্যানাটমির জনকের প্রতিভাদ্যুতি দুই দশক ধরে ধুঁকে ধুঁকে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে চিরতরে নিভে গেল।

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৪৬—১৬০১)

কোপেনহেনেগের কাছেই ভীন দ্বীপ। দ্বীপের মাঝামাঝি একটা দুর্গ, নাম ইউরেনিয়েন বর্গ (যার অর্থ স্বর্গের দুর্গ)। দুর্গটা দেখতে অনেকটা বাগানের মত। চারটে কোণ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দিক বরাবর। দুর্গের দেওয়াল-গুলোতে চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্প খোদাই করা। বিলাসবহুল সব শয়নকক্ষ। জমকালো দুর্গের অন্যান্য অংশগুলোতে গ্রন্থাগার গবেষণাগার ও মানমন্দির। দ্বিতীয় আর একটা মাটির নীচে কিন্তু তার ছাদটা শুধুমাত্র বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, যাতে করে ঘরের ভেতরের যন্ত্রগুলোকে প্রয়োজনে বাইরে ওঠান যায়। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের একজন লোক এরই ভেতরে বসে বসে কি যেন গভীর ভাবে দেখছেন। তাঁর বিশাল সুঠাম স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী সম্পন্ন চোখ। তাঁর নাকের সামনের কিছুটা অংশ সোনা রুপোর শঙ্কর ধাতু দিয়ে মোড়া কারণ তরুণ বয়সে ডুয়েল লড়তে গিয়ে নাকের ঐ অংশটা কেটে গিয়েছিল। ইনিই হচ্ছেন স্বনামধন্য তাইকো ব্রাহে।

তাঁর প্রকৃত নাম তাইগে (তাইকো হচ্ছে ল্যাটিন)। তাঁর জন্ম ড্যানিস সামন্ত রাজপরিবারে। ছেলেবেলায় এক অপুত্রক কাকা তাঁকে চুরি করে নিয়ে যান এবং সেই কাকার কাছেই তিনি মানুষ হন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন; সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করতেন; অসিক্রীড়া, সঙ্গীতও জানতেন এবং এ ছাড়াও তর্কশাস্ত্রের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলোতে কাকাকে হারিয়ে দিতেন। বার বছর বয়সে অলংকার এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

তাঁর সময়ের অন্যান্যদের মতোই তিনিও জ্যোতির্বিদ্যায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। ১৫৬০ সালের আগস্ট মাসে ডেনমার্কের কোনও এক জ্যোতিষির ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী গ্রহণ হয়েছিল। সেই ঘটনা ব্রাহেকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং টলেমির কাজকর্মের ওপর ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটা বই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়তে শুরু করলেন। সেই তখন থেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রাহে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কাকাকে রাজী করিয়ে তারপর লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে সে যুগের বিখ্যাত বিখ্যাত সব জ্যোতির্বিদদের অধীনে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁদের শেখান সমস্ত

পাঠক্রমই করায়ত্ত করে তিনি নিজের মতো করে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই তিনি আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন এবং সম্পূর্ণ নিয়ম মাফিক পথে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলগুলোও লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

আগে মানুষের ধারণা ছিল যে ভগবান আকাশে বাস করেন এবং নক্ষত্রগুলো তাঁদের অলংকার। পরে যখন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হতে লাগল, জলপথে তাদের যাতায়াত বাড়তে লাগল তখন মানুষের ধারণা আরও উন্নত হতে লাগল। তখন মানুষ কৃষিকার্য্যের জন্য আবহাওয়ার খবর, জলপথে যাতায়াতের জন্য দিক্ নির্দেশক হিসাবে তারাগুলোর অবস্থান আরো সঠিক ভাবে জানতে চাইল। তখন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে হিপ্পারকাসই প্রথম গ্রহ নক্ষত্রের বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কার করতে শুরু করলেন। তিনি এক হাজারেরও বেশী নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমি তাকে আরো উন্নত করেন। তাঁর মত—পৃথিবী স্থির এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে, প্রায় এক হাজার চারশো বছর ধরে চলে আসছিল। পরে কোপার্নিকাস টলেমিকে খন্ডন করে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে।

ধর্মীয় মানুষ বলে কোপার্নিকাসের মতানুযায়ী তিনি জগতে পৃথিবীর এত ছোট ভূমিকার কথা মানলেন না। তাঁর মতে সমস্ত জগত, নক্ষত্র সবাই দিনে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে ও সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে।

তিনি খুব নিপুণ ভাবে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি বারবার এগুলোকে যাচাই করতেন। টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়াই তিনি নক্ষত্রগুলোর যে অবস্থান নির্ণয় করেন তাতে তাঁর ভুলের পরিমাণ বৃত্তচাপের এক ষষ্ঠাংশ ডিগ্রিরও কম। তাঁর নির্ণয় পদ্ধতি এতই সুদক্ষ ছিল যে বছরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে ভুল ছিল এক সেকেন্ডেরও কম।

১৫৭২ সালে তিনি একটা সুপারনোভা দেখেন—একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশেই বোমার মত বিস্ফোরিত হল। তিনি তার নাম দেন "নোভা"। একটা বইতে তিনি লেখেন যে নক্ষত্রেরও একটা শুরু, মধ্যাবস্থা এবং শেষ হতে পারে।

ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তাইকোর কার্যাবলী জেনে তাঁকে পর্যবেক্ষণাগারের জন্য ভীন-এর দ্বীপ ও কুড়ি হাজার পাউন্ড দান করেছিলেন। তাইকো নিজের আরও কুড়ি হাজার পাউন্ড যোগ করে ভীন দ্বীপে তাঁর মনোমত পর্যবেক্ষণাগার তৈরি করেন। সেখানে তিনি প্রত্যেক দিন তথ্য সংগ্রহ করতেন

পরে বছরের পর বছর ধরে এত তথ্য জমে গেল যে দুর্গের কয়েকটা ঘরই ঠিক করতে হোল সেগুলোকে রাখার জন্য, যেমন যেমন তিনি পেতেন সেই অনুসারে একটা পাঁচ ফুট ব্যাসযুক্ত মহাজাগতিক গোলকের গায়ে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতেন। ভালভাবে আকাশকে দেখার জন্য একটা সচ্ছিদ্র আই-পিসও তৈরি করেন। এছাড়া তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং হিসেব নিকেশকে নিভুর্ল রাখতে তিনি একটা বিশাল কোয়াড্রান্ট (বৃত্তের-এক-চতুর্থাংশ) তৈরি করেন (যেটা তুলতে প্রায় কুঁড়িজন লোক লাগত)।

রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক মারা গেলে ব্রাহে বাধ্য হয়ে পৃষ্টপোষণের জন্য প্রাগের রাজা দ্বিতীয় রুডলফের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা জ্যোতিষীবিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি ব্রাহেকে প্রাগে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁকে একটা দুর্গ ও পর্যবেক্ষণাগার দিয়ে দেন।

১৫৯৯ সালে ব্রাহে প্রাগে আসেন। সেখানে রাজা ও তার সভাসদদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় ছাড়াও, তিনি আকাশের পর্যবেক্ষণও করতেন। তিনি ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না, পর্যবেক্ষণ-গুলো একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপঃ মঙ্গলের বেলায় চার বছর, শনির বেলায় অন্তত পক্ষে তিরিশ বছর; যাতে করে তাদের প্রত্যেকের একটা পূর্ণ আবর্তনের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাইকোর কাছে মঙ্গল গ্রহ ছিল খুব প্রিয় এবং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে সংগৃহীত তাঁর প্রত্যেকটি তথ্যই ছিল বিস্ময়কর ভাবে সঠিক। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট রিচার্ডসন কিছুদিন আগেই লিখেছেনঃ "যদি আমরা কখনও মঙ্গল গ্রহে পেঁছোতে পারি তাহলে আমাদের উচিত মঙ্গল গ্রহে একটা স্মারক স্তম্ভ পুঁতে আসা। স্মারক স্তম্ভের গায়ে, যাদের জন্য এই যাত্রা সফল হয়েছে, তাদের সকলেরই নাম খোদাই করা থাকবে। আমার ইচ্ছে তাদের মধ্যে প্রথম নামটিই হবে তাইকো ব্রাহের।"

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অত্যধিক কাজের চাপের দরুণ ব্রাহে তাঁর একজন সহকারী, জোহানেস কেপলারকে নিযুক্ত করেন। ঠিক এক বছর বাদে, ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে শেক্সপীয়র যখন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ করেন, তখন প্রাগে বিখ্যাত ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাইকো ব্রাহে হজমে গণ্ডগোলের রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর অন্তিম লগ্ন খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। সেজন্য তাঁর প্রতিভাময় সহকারী কেপলারকে ডেকে বললেন, সে যেন অসমাপ্ত কাজগুলো চালিয়ে যায়। কেপলার কথা দিলেন যে তিনি কাজগুলো চালিয়ে যাবেন। শুনে আশ্বস্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এক ঘণ্টা পরেই বিজ্ঞানের জগৎ তার রাজাকে হারাল—জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাইকো ব্রাহে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

(খৃীষ্টাব্দ ১৫৬৪—১৬৪২)

১৬৩৩ সাল। পিসার বিচার সভা লোকে লোকারণ্য। আসামীর কাঠগড়ায় উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ একজন বৈজ্ঞানিক। মাথাভর্তি বরফ-সাদা পাকা চুল। এক-গাল সাদা দাড়ি। চোখ দুটোর জ্যোতি বয়সের ভারে স্তিমিত। কিন্তু এই চোখেই একদিন টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে আকাশের অনেক কিছুই দেখতেন যা কিনা প্রাচীন যুগ থেকে তখন পর্যন্ত অন্য কেউই দেখেনি। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে রাজা-রানীদের মতই তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু তবুও সেদিন সেই ভয়ংকর বিচার সভায় বিচারকদের সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে তাঁর ভুল স্বীকার করতে হয়েছিল, যা আদতে কোন ভুলই ছিল না। তিনি বিষণ্ণ গলায় বলে উঠলেন ঃ "আমি, গ্যালিলিও গ্যালিলি, আমার প্রচারিত মত—সূর্য্য স্থির এবং বিশ্বের কেন্দ্রস্থল—সর্বসমক্ষে ভুল বলে স্বীকার করে নিচ্ছি এবং শপথ করছি যে আর কোনদিন প্রচার করব না।" কিন্তু কথিত আছে যে তিনি নাকি ওঠার সময় বিড়বিড় করে খুবই মৃদু স্বরে উচ্চারণ করেন, "ই পার সাই মুভও"। [তা সত্বেও পৃথিবী ঘোরে (সূর্য্যের চারিদিকে)]

গ্যালিলিওর জন্ম ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইটালীর পিসায়। তাঁরা সাত ভাই-বোন ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সহজাত সুদক্ষ সঙ্গীতকার এবং মোটামুটি শিক্ষিত। সতেরো বছর বয়সে তিনি পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং গণিত, ভৌত-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যা পড়তে শুরু করেন।

পিসায় ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তিনি দোলক সংক্রান্ত সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি নাকি একবার গির্জায় গিয়ে কতকগুলো ঝুলন্ত বাতিকে দুলতে দেখেন। হাত দিয়ে নাড়ী টিপে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে একটা বাতির দোলার সময় খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন। আশ্চর্য হয়ে দেখেন, বাতিটার প্রত্যেকটা দোলনের সময় সমান। এই দেখে বাড়িতে এসেই সুতো দিয়ে কতকগুলো সীসের ছোট ছোট গুলিকে টাঙিয়ে দোলাতে থাকেন। এবারও তিনি দেখেন যে গুলিগুলোর ওজন বা দোলনের বিস্তার (৪°এর মধ্যে) যাই হোক না কেন দোলনকাল সর্বদাই সমান। শুধুমাত্র সুতোর দৈর্ঘ্যের বাড়াকমার ওপরেই দোলনকাল পরিবর্তিত হয়। তাঁর এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই দোলক ঘড়ি এবং আরো অনেক মূল্যবান যন্ত্রের উদ্ভব হয়। তিনি

আর্কিমিডিসের বিভিন্ন পরীক্ষাও পড়েছিলেন এবং তরল ও শঙ্কর ধাতুর ওপর আর্কিমিডিসের কিছু পরীক্ষা অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

পঁচিশ বছর বয়সে, টাসকানির গ্র্যান্ড ডিউকের সহায়তায় পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁর মাইনে ছিল বছরে প্রায় পঁয়ষট্টি ডলার। (তখন অঙ্ক শাস্ত্রকে খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হোত এবং সেজন্যে অন্যান্যদের তুলনায় অঙ্কের প্রফেসররা খুব অল্পই পেতেন)। অধ্যাপক হলেও, তিনি কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানের কাজও চালিয়ে গেছেন। এই সময় অঙ্ক এবং পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করে তিনি অ্যারিস্টোটলের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলোর বিশ্লেষণ করতে থাকেন। বিশ্লেষণ করতে করতে, পতনশীল বস্তুর ওপর অ্যারিস্টোটলের সূত্র যে ভুল তা প্রমাণ করেন এবং তাঁর নিজের সূত্র আবিষ্কার করেন। পতনশীল বস্তু সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলের সূত্রঃ বস্তুর পতনের গতি তার ওজনের সমানুপাতিক; কিন্তু গ্যালিলিওর সূত্রঃ ওজন যাই হোক না কেন অবাধ পতনকালে সকল বস্তুই সমান দ্রুততায় নীচে নামে। এজন্য গ্যালিলিও একটি সুন্দর পরীক্ষাও করেন। প্রচুর দর্শকের সামনে, যার মধ্যে তাঁর অনেক সন্দেহপ্রবণ সহকর্মীও ছিল, পিসার টাওয়ারের মাথা থেকে একটা এক পাউন্ড ও আর একটা দশ পাউণ্ডের সীসার বল মাটির দিকে ফেলে দেন। দেখা যায় যে দুটো বল প্রায় একই সময়ে মাটি স্পর্শ করে। বস্তুর শূন্যে অবাধ পতন এবং নততলের ওপর দিয়ে গড়ানোর মধ্যে একটা মৌলিক সমতা লক্ষ্য করেই তিনি একই পরীক্ষা নততলের বেলায়ও করেন। এই পরীক্ষায় তিনি একটা কুড়ি ফুট লম্বা কাঠের নততল ব্যবহার করেন। কাঠের গায়ে দাগ দিয়ে তিনি দূরত্ব চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। এরপর সীসের বল তলের ওপর গড়িয়ে নীচে নামার সময়, দূরত্ব, বেগ প্রভৃতি নির্ধারণ করতেন এবং পতনশীল বস্তুর সূত্রকে আরো উন্নত এবং পরিবর্ধিত করেন—(১) কোন সময়ে পতনশীল বস্তুর পতনের বেগ ঐ নির্দিষ্ট সময়ের সমানুপাতিক; (২) নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব ঐ সময়ের বর্গের অনুপাতিক।

এইভাবে তিনি ত্বরণের ধারণা প্রবর্তন করেন। ত্বরণ যা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে ক্রমবর্ধমান বেগের পরিবর্তনের হার নামে চিহ্নিত। তিনি গতিশীল বস্তুর ঘর্ষণ এবং জাড্যের আধুনিক মতও প্রচলন করেন। বলের উপাংশগুলোর বিশ্লেষণও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন বুলেটের যাবার সময় দুটো বল ক্রিয়া করে। একটা নীচের দিকে, আর একটা সামনের দিকে, এবং গাণিতিক উপায়ে তাদের মানও বের করা যায়। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলো ১৫৯০ সালের আগেই শুরু হয়েছিল। পরে আরো উন্নত হয় এবং শেষে ১৬৩৮

সালে তাঁর বই "ডায়ালগস কনসারনিং টু নিউ সায়েন্সেস" (গতি এবং বলবিদ্যা) এ প্রকাশিত হয়। এই সূত্রগুলোই ছিল নিউটনের গতি-সূত্রের ভিত্তি প্রস্তর। তবে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে গ্যালিলিওর তথ্যগুলোর বিরাট তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিকে জানতে গেলে অ্যারিস্টোটল বা প্রাচীন বিজ্ঞ মনীষিদের সূত্রগুলোই শুধু জানলে হবে না তাদের ভালমত যাচাই করে নিতে হবে এবং তা একমাত্র সম্ভব সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের কাজকর্মের ব্যাখ্যার সময়ে, গ্যালিলিও নিজের পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণগুলো সর্বসমক্ষে হাজির করতেন এবং পূর্বসূরীদের অবলম্বিত তত্ত্বের ওপর খাড়া করা প্রাচীনদের ভুল সূত্রগুলোর প্রচণ্ড সমালোচনা করতেন। এইভাবে নতুন সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনে অনেক শক্তিশালী শত্রুর সৃষ্টি করেন।

কখনও কখনও কিছু কিছু প্রচলিত নিয়মের বিরোধীতা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর সহকর্মীরা সবাই অ্যাকাডেমীর পোশাক পরত। কিন্তু তিনি ঐ পোশাক পরতে অস্বীকার করেন কা ণ তাঁর মতে ওগুলো তাঁর গতিবিধিকে অপ্রোজনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এজন্য ঐ সামান্য মাইনে থেকেও তাঁকে বহুবার ফাইন দিতে হয়। অবশেষে তাঁর শত্রুরাই জয়ী হয় এবং তাঁকে পিসার অধ্যাপক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

সেই সময় তাঁর ঐ রকম আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্বেও তিনি পরিবারের প্রতি কিন্তু মহৎ ছিলেনঃ তাঁর বোনের বিয়েতে একটা বিরাট অংকের টাকা তিনি দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর এক অমিতব্যয়ী ছোটভাই প্রায়শই গ্যালিলিওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্ফূর্তি করে নষ্ট করতেন।

পিসার অধ্যাপক পদ থেকে বরখাস্ত তঁার কাছে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী মাইনেতে (বছরে প্রায় দুশো ডলার) চাকরি পান। পাদুয়ায় তিনি আরও বেশী খোলামেলা ভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। সেখানে বেশ কিছু বছর তিনি খুব শান্তিতে কাটান।

পাদুয়ায় থাকাকালীন সময়ে প্রথম তিনি সেক্টর নামে একটা হিসাবের যন্ত্র আবিস্কার করেন। যন্ত্রটা আর কিছুই নয়, দুটো সোজা রুলার একসঙ্গে এক প্রান্তে কবজা দিয়ে আটকান। যন্ত্রটার দ্বারা মাপ অনুযায়ী সব রকমের বহুভুজের চিত্র অঁাকা যেত। রুলার দুটোর মাঝের কোণের পরিবর্তন করে এবং কব্জা আটকানো বিন্দুকে কেন্দ্র করে এক সমকোণের মধ্যে সে দুটোকে ঘুরিয়ে অনেক কিছুর হিসাব নির্ধারন করতেন; যেমন বর্গমূল বা সুদের পরিমাণ ইত্যাদি। তিনি একটা ওয়ার্কসপও তৈরী করেন যাতে প্রথমে চৌম্বকীয় দিক নির্ণয় যন্ত্র এবং

পরে থার্মোমিটার ও টেলিস্কোপ (দূরবীক্ষণ যন্ত্র) তৈরী হত। এছাড়া সেনাবাহিনীর জন্য নানারকম সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করার ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর এতই খ্যাতি ছিল যে প্রায় সব জায়গা থেকেই বিভিন্ন ধরণের ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসত। সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে এক সময় প্রায় ডজন ছয়েক ছাত্র বাস করত।

১৬০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি শুনতে পেলেন যে একজন ডাচ বিজ্ঞানী একটা উত্তল ও আর একটা অবতল লেন্সকে একই সঙ্গে এমন ভাবে সাজিয়েছেন যাতে করে কোন দূরের বস্তুকে খুব কাছে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধারণা প্রয়োগ করে তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন যেটা কোন বস্তুকে প্রায় তিরিশ গুন বিবর্ধিত করে। এবং ১৬০৯ সালে জনসাধারণের সামনে তিনি টেলিস্কোপের কার্যাবলী বর্ণনা করেন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ফ্লোরেন্সের গ্র্যান্ড ডিউকের দূতও ছিলেন। তিনি টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দূর সমুদ্রে প্রায় ঘন্টা তিনেক আগে চোখের আড়াল হয়ে যাওয়া জাহাজগুলো পরিষ্কার দেখতে পান। তাঁর এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা তিনি ডিউককে জানান। পরে গ্যালিলিও টেলিস্কোপটা ডিউককে উপহার দেন এবং ডিউক কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সারাজীবনের জন্য অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। সেই পদের জন্য তাঁর মাইনে গিয়ে দাঁড়াল বছরে প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের মতন।

রাতে টেলিস্কোপ দিয়ে যখন দূর আকাশের দিকে তাকাতেন, তখন এক সুদূর প্রসারী জগতের দরজা তাঁর কাছে খুলে যেত। সেই জগতের বর্ণনাই তিনি তাঁর "সিডেরেয়াস নানসিয়াস" (নক্ষত্রের বার্তাবহ) বইতে লিখে রেখে গেছেন। বইতে তিনি বলে গেছেন ঃ "আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এই অত্যাশ্চর্য জগতের প্রথম পর্যবেক্ষক করেছেন যা কিনা অতীতে আর কেউ কোনদিন দেখেনি। আমি নিশ্চিত জেনেছি যে চাঁদ, পৃথিবীরই অনুরূপ।..................আমি অসংখ্য স্থির নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি যা আগে কেউ দেখেনি..............কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর চারটে নতুন গ্রহের (বৃহস্পতির চারটে উপগ্রহ) আবিষ্কার।..............আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। "এছাড়াও তিনি আরও অনেক কিছু আবিস্কার করেন, যেমন, ছায়াপথ অসংখ্য নক্ষত্র দিয়ে তৈরী ; গ্রহগুলোর নিজস্ব কোন উজ্জ্বলতা নেই; তারা সূর্যের আলোকেই আলোকিত ; শুক্র এবং বুধ গ্রহও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে ; এবং সূর্য্য নিজেও একটা অক্ষের চারিদিকে পাক খাচ্ছে। নক্ষত্রদের তাঁর দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হওয়া এবং তারপর অন্তর্হিত হওয়া দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে বিশ্ব গতিশীল ও তারও পরিবর্তন আছে।

তারপর গ্যালিলিও আবার পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নেন কারণ তখন তিনি দেশ ফেরার জন্য খুব আকুল। কিন্তু এইটাই তাঁর জীবনে একটা মারাত্মক শোচনীয় ভুল ছিল কারন পরে পিসাতেই তাঁকে ভয়ংকর বিচার সভার সামনে হাজির হতে হয়। কিন্তু এদিক থেকে পাদুয়া তাঁর কাছে অনেক ভাল ছিল সেখানে তাঁর অনেক বেশী স্বাধীনতা ছিল।

পিসাতে তিনি প্রচণ্ডভাবে তখনকার ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল দলের শত্রুতা লাভ করেন কারণ যেহেতু তাঁর বইতে প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী কোপার্নিকাসের মতবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৬১৬ সালে গ্যালিলিও তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী যাজকতন্ত্রকে প্রচন্ড সমালোচনা করে একটা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি লেখেন যে, বিশ্বের গতানুগতিক পৃথিবীকেন্দ্রীক মতবাদ অনুমোদন করাটা ধর্মশাস্ত্রের কোন ভুল নয় বরঞ্চ ধর্মশাস্ত্র নিয়ে যারা নাড়াচড়া করে বা ধর্মের বিধান যারা দেয় তাদেরই ভুল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জেরার জন্য তলব করা হয়। কিন্তু পঞ্চম পোপ পল এবং আরও অনেক উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকায় তাঁকে শুধুমাত্র একটা ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁকে দিয়ে একটা চুক্তিও করিয়ে নেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তিনি কোপার্নিকাস সূত্র সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলবেনও না বা তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কিছু করবেনও না।

পরের কয়েক বছর তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গতি এবং বলবিদ্যার গবেষণায় নিজেকে গভীরভাবে নিয়োগ করেন। পিসায় তিনি, তাঁর মঠবাসিনী দুই মেয়ে যে মঠে থাকতো তার খুব কাছেই একটা ছোট্ট বাড়ীতে থাকতেন। তিনি মাঠে গিয়ে মাঝে মধ্যেই তাঁর মেয়েদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন এবং বেশ খোশমেজাজে গল্প করতেন। দুই মেয়ে ছাড়াও তাঁর এক অমিতব্যয়ী, অপদার্থ ছেলেও ছিল।

কিন্তু ১৬৩২ সালে, তাঁর ওপর আরোপিত সমস্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে, তিনি আবার সরব হয়ে উঠলেন। "ডায়ালগ কনসারনিং টু দি প্রিন্সিপাল সিসেটমস অফ দি ওয়াল্ড" নামে একটা বই প্রকাশিত করলেন বইটা একটা দুর্দান্ত বিদ্রূপাত্মক বই ছিল। এতে কথোপকথনের মাধ্যমে, টলেমীর পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভুল এবং কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ যে সঠিক তা সম্পূর্ণ দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আরও একবার তাঁকে জেরার সামনে নিয়ে আসা হল। কিন্তু এবারের অবস্থা আগের বারের থেকে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যজনক ছিল। কারণ প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ না করার যে চুক্তি তা তিনি ইতিমধ্যেই লঙ্ঘন করে ফেলেছেন।

অবশেষে রায় হল এই যে, গ্যালিলিওকে সর্বসমক্ষে তাঁর মতবাদ ভুল বলে স্বীকার করতে হবে, তাঁকে বিজ্ঞানের সমস্ত রকম গবেষণা থেকেও বিরত থাকতে হবে এবং এছাড়াও তাঁকে বন্দী করে রাখা হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য ছিলেন, সেজন্য তাঁকে তাঁর সেই ছোট্ট বাড়ীতেই প্রহরাধীন অবস্থায় জীবনের বাকী কটা দিন কাটাতে হয়েছিল।

কিন্তু তাহলেও তিনি ওই অবস্থায়ও নিশ্চুপ থাকেন নি, বন্দী অবস্থায়ই তিনি গতি ও বলবিদ্যার ওপরে তাঁর সমস্ত আবিষ্কারলব্ধ ফলগুলোর সারাংশ নিয়ে, "ডায়ালগস কনসারনিং টু নিউ সায়েন্সেস" নামে একটা বই লেখেন। বইটা হল্যান্ডে গোপনপথে পাচার হয়ে যায় এবং ১৬৩৮ সালে হল্যান্ডেই প্রথম ছাপা আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর সেই আবিষ্কারকে ছাপার আকারে দেখতে পাননি। কারণ চুয়াত্তর বছর বয়সে ১৬৩৮ সালে তিনি সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হয়ে যান। এর ঠিক চার বছর পরেই, ১৬৪২ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী, আটাত্তর বছর বয়সে, এই মহামনীষির মহাপ্রয়াণ ঘটে। দেশের জনসাধারণ, বিশিষ্ট নাগরিক এবং চার্চের অনেক উচ্চপদস্থ ব্যাক্তি তাঁর শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চান কিন্তু তদন্ত কমিশন তাঁর শবদেহের কোনরকম প্রকাশ্য অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

গ্যালিলিওর দান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক কথায় অনবদ্য। পূর্বসূরীদের তত্বগুলোকে নির্দ্বিধায় না মেনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেন এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণের তাঁর যে প্রক্রিয়া এগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের মুখ্য ভিত্তি প্রস্তরের অন্যতম। তিনিই মানুষকে দেখিয়ে ছিলেন সত্য আবিষ্কারের জন্য সমস্ত রকম মিথ্যার বিরুদ্ধে কিভাবে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করতে হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য তাঁর জীবন সংগ্রাম, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এ সবই তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে এক বিরাট আদর্শ, বিজ্ঞাণের পরবর্তী অগ্রগতির জন্য একটা মূল্যবান পাথেয় বিশেষ।

জোহানেস কেপলার

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৭১—১৬৩০)

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস বা ধারা বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি যা আজকের আধুনিক বিজ্ঞান কয়েকজন শক্তিশালী মনীষির কাঁধের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে একজন জোহানেস কেপলার। যিনি একাধারে একজন জ্যোতিষবিদ, জ্যোর্তিবিদ, গণিতশাস্ত্রবিদ এবং একজন অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন।

যদি পথের পাশে এমন একটা বাগানের কথা ভাবা যায় যেটা অসংখ্য নিকৃষ্ট জাতের আগাছায় ভর্তি। তারা তার সৌন্দর্যকে জোর করে ম্লান করে দিচ্ছে। কিন্তু এত সমস্ত কুৎসিততার মধ্যেও সেখানে একটা সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটছে। যে তার গন্ধ, বর্ণ দিয়ে সঞ্চারীদের মুগ্ধ করেছে। তাহলে সেই ফুলটাই হচ্ছে জোহানেস কেপলার। কারণ তাঁর পারিবারিক ইতিহাস অধঃপতন, দুঃখ-দুর্দশা, অকৃতকার্য্যতা, এবং রোগভোগের একটা জীবন্ত দলিল। এছাড়াও তাঁর পরিবারের লোকেরা ডাকিনী বিদ্যা চর্চায় লিপ্ত থাকার অভিযোগেও অভিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এত সব জেনেও এটা ভেবে অবাক লাগে যে সেই নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েও তিনি তদানীন্তন কালের বিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে দুর্বোধ্য সমস্যার কেন্দ্রস্থলে পেঁছান।

জোহানেস কেপলারের প্রথম জীবন খুব একটা সম্ভাবনাময় ছিল না। ১৫৭১ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মাণীর ওয়েলে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় দৃষ্টিক্ষীণতা, ফোড়া, মাথাব্যথা, চর্মরোগ, অর্শ, জ্বর, পিত্তকোষ জনিত, পাকস্থলী সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে প্রচুর ভুগেছিলেন। চার বছর বয়সে একবার গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মরো মরো হয়ে যান। কিন্তু ভবিষ্যত কোন মহৎ কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে সে যাত্রায় দৈব কৃপায় কোনোরকমে বেঁচে যান। এবং তাঁর পরবর্তী জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভগবানের অনুকূল্য, এই দূরদর্শিতা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

সৌভাগ্যবশত, উরটেমবার্গের ডিউকদের সহায়তায় তাঁর শিক্ষালাভ হয়। তিনি থিয়োলজিক্যাল (ব্রহ্মবিদ্যাগত) শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং কুড়ি বছর বয়সে টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। টুবিনজেনে তিনি একজন অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই অধ্যাপকই গোপনে তাঁকে কোপারনিকাসের মতবাদ

শিখিয়ে ছিলেন কারন তখনকার সময়ে একমাত্র টলেমির মতবাদই সরকার কর্তৃক প্রকাশ্য স্বীকৃত ছিল। যাহোক সে সময়ে কেপলারের জীবনে এটা স্থির নিশ্চিত ছিল যে তিনি যাজকের চাকরী নেবেন। কিন্তু কি এক অজানা কারণে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং গ্রাৎসে জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের একজন শিক্ষকের চাকরী নেন। গ্রাৎস তখন অষ্ট্রিয়ান রাজ্য স্টাইরিয়ার রাজধানী।

১৫৯৬ সালে, গ্রাৎসেই, তিনি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বইটি প্রকাশ করেন। বইটির নাম "দি হিস্টি অফ দি ইউনিভার্স", তাঁর যৌবনোচিত সমস্ত উৎসাহ এবং উচ্ছাসের সঙ্গে সে সময় তিনি ঘোষণা করেন যে সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব-গুলোর অন্তর্নিহিত মূল তাৎপর্য্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অর্থাৎ আর এক দিক থেকে বলতে গেলে তিনি ভেবেছিলেন যে ভগবানের তৈরী বিশ্ব-সৃষ্টির গোলক ধাঁধার জট তিনি খুলে ফেলেছেন।

যাইহোক কেপলারের মতবাদ (বলা নিষ্প্রেয়োজন যে তা ভুল ছিল) অনুসারে, ত্রি মাত্রিক মহাকাশে কেবলমাত্র পাঁচটা সঠিক ঘনবস্তুই গঠন করা যায়। এবং দুটো গ্রহের (সেই সময় ছটা গ্রহই আবিষ্কৃত হয়েছিল) পাঁচটা ব্যবধানে ওই পাঁচটা ঘন বস্তুই ঠিক ঠিক ভাবে খাপে খাপে বসান যেতে পারে।

তিনি শনি গ্রহের কক্ষপথের মধ্যে একটা কিউবকে (ছয়তল বিশিষ্ট ঘনবস্তু) স্থাপন করার চিন্তা করেন এবং কিউবের মধ্যে বৃহস্পতি গ্রহকে বসান। তারপর বৃহস্পতি কক্ষপথের মধ্যে একটা চারতল বিশিষ্ট ঘনবস্তু এবং তার মধ্যে মঙ্গল, মঙ্গলের কক্ষপথের মধ্যে বারতল বিশিষ্ট ঘনবস্তু এবং তার মধ্যে পৃথিবী। পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যে কুড়িতল বিশিষ্ট ঘনবস্তু ও শুক্র এবং বুধের মধ্যে আটতল বিশিষ্ট ঘনবস্তু। এইরকম ভাবে বসিয়ে বসিয়ে কেপলার নিজে বিশ্বাস করতেন যে তিনি সেই বিরাট সমস্যাটার সমাধান সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ "কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত কিছু পড়ে যাবে। কিন্তু আমি কতগুলো এমন সুসামঞ্জস্য ঘনবস্তু আবিষ্করে করেছি যাদের নির্দিষ্ট একটা প্রত্যেক দুটো বিশেষ গ্রহের কক্ষপথের মধ্যে ঠিক ঠিক বসান যায়। যদি এরপর কোন চাষী তোমায় প্রশ্ন করে যে কি ধরণের আঁকশি দিয়ে তাদের বাঁধা হবে যাতে তারা আর না পড়ে যায়, তাহলে তুমি ঘনবস্তুগুলোর কথা মনে রেখে খুব সহজেই তার উত্তর দিতে পারবে।"

কেপলার এই আবিষ্কারের কথা তাঁর যাঁকে যাঁকে মনে হয় তাঁদের সবাইকে জানালেন, তাঁদের মধ্যে গ্যালিলিও এবং তাইকো ব্রাহেও ছিলেন। তাঁরা উভয়েই এই তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করলেন। ফলে পরে যখন

প্রটেস্ট্যান্ট কেপলার ধর্মীয় মতানৈক্যের জন্য বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়ে দিলেন, তখন তিনি তাইকো ব্রাহের সহকারী হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে ব্রাহের কাছে চলে গেলেন। ..০০ সালের পয়লা জানুয়ারী কোন এক শুভ লগ্নে তিনি ব্রাহের কাছে থাকার জন্য প্রাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ব্রাহের সঙ্গ তিনি খুব কম দিনই পান। সেই যুগের মানুষ হয়েও তাঁদের দুজনের চিন্তাধারা ছিল সুদূরপ্রসারী। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁরা দুজনেই জ্যোতিষবিদ্যার দিকেও যান এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে নক্ষত্ররাই মানুষের প্রকৃতি এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক, তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন যে, সুশৃঙ্খল জগতে মানুষের সাথে মহাজাগতিক বস্তুগুলোর প্রভাবিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরে কেপলার ভগবানের তৈরি এই সমন্বয়পূর্ণ সুসামঞ্জস জগতের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি একটা বইতে লিখে গেছেন যে ঃ "মহাজাগতিক সমন্বয়পূর্ণ স্বর্গীয় দৃশ্যগুলো দেখে আমি মনে মনে এক অবর্ণনীয় পরমানন্দ, এক চরম পুলক অনুভব করছি।"

কেপলার ভাবেন যে তিনি "তাঁর গ্রহের জোরেই" তাইকোর কাছে এসেছেন যাতে করে তাঁর দক্ষতা এবং পর্যবেক্ষণের উন্নতি হয়। তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "যদি ভগবান জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং তাঁর মহিমাময় ইচ্ছার কথা জানা যায়, তাহলে আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোষাগার থেকে কিছু না কিছু রত্ন পাবই। কারণ আমি দেখেছি ভগবান আমাকে এবং তাইকোকে একই ভাগ্যের সুতোয় বেঁধে রেখেছেন ; এবং শুধু তাই নয়, যত বেশী নিদারুণ দুঃখ ও কষ্টই হোক না কেন আমাকে কখনও তাইকোর থেকে দূরে সরিয়ে নেন নি।"

কিন্তু তবুও তাইকো ১৬০১ সালে মারা যান। এর পরেই কেপলার সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ-এর রাজ সভার গণিতবিদ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময় একদিকে তিনি সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সভাসদদের কোষ্ঠীপত্রিকা তৈরি করতেন, অপরদিকে অঙ্ক, দর্শন এবং জ্যোতির্শাস্ত্রের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলোকে প্রতিভাবানের মত সমাধান করতেন। এর পর ১৬০৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম আধুনিক বই "নিউ অ্যাসট্রোনমি" প্রকাশ করেন। এর মধ্যে কেপলারের যুগান্তকারী তিনটে সূত্রের দুটো সূত্র ছিল। সূত্র দুটো ঃ (১) প্রত্যেক গ্রহই একটা ডিম্বাকৃতি পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ডিম্বাকৃতি পথটাকে বলা হয় উপবৃত্ত। সূর্য এই উপবৃত্তাকার পথের একটা নাভিতে অবস্থান করে। (এই ভাবে কেপলার কক্ষপথে ঘোরাকালে গ্রহদের অসম বেগের ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করেন।) (২) সূর্যের কেন্দ্র এবং যে কোন গ্রহের কেন্দ্রের সংযোজক কাল্পনিক

রেখা সর্বদাই একই সময়ে একই ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। ফলে এটা স্পষ্ট হোল যে, সূর্যের যত কাছাকাছি আসে, গ্রহগুলোর গতিবেগও তত বেশী হয়।
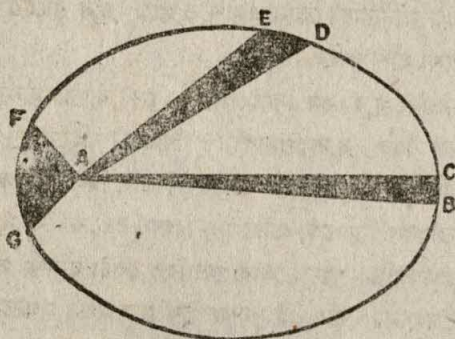
A = সূর্য্য B = গ্রহের প্রথম অবস্থান C = দ্বিতীয় অবস্থান
D, E, F, G - তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থান

১৬১৯ সালে প্রকাশিত কেপলারের "ওয়ার্ল্ড হারমোনি" বইতে তাঁর অবশিষ্ট তৃতীয় সূত্রটা লিপিবদ্ধ হয়ে বেরোয়। তৃতীয় সূত্রটা ঃ (৩) সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে কোন গ্রহের যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বলা হয়। পর্যায়কালের বর্গ, গ্রহ এবং সূর্যের মধ্যেকার গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সূত্রগুলোর অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য্য কি? সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই সূত্রগুলোই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে থিয়োলজির (ব্রহ্মবিদ্যা) থেকে পৃথক করেছে, এবং পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে একটা সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়াও মহাজাগতিক বস্তুগুলো সম্বন্ধে মানুষের পুরোনো অনেক কু-সংস্কার ধুয়ে মুছে ফেলতে মানুষকে বাধ্য করিয়েছে, বিশ্বাস করতেন যে সেগুলো শুধুমাত্রই পার্থিব বস্তু যা নাকি মহাকাশে স্বাধীন ভাবে ঘোরে এবং ভৌত বল দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

যদিও কেপলার তাঁর সূত্রগুলোর কোন ফরমুলা (গাণিতিক সূত্র) দিতে পারেন নি। তবুও তাঁর বৈজ্ঞাদিক কাজকর্মের জন্য আজও বিজ্ঞানের জগতে তিনি একজন স্মরণীয় ব্যাক্তি। আলোক বিজ্ঞানেও তাঁর অনেক দান আছে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ থাকায় আলোক বিজ্ঞানে তিনি বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর লেখায়, কিভাবে চশমার সাহায্যে কাছের ও দূরের জিনিস দেখা যায় তার বর্ণনা, ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার বর্ণনা প্রভৃতি পাওয়া যায়। নব আবিস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে, ১৬১১ সালে "ডায়োপ্-

ট্রাইস" নামে একটা বই প্রকাশিত করেন, যাতে তিনি গুল্টান অ্যাসট্রোনোমিক্যাল (জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নকশার একটা পরিলেখ এঁকেছিলেন যা পরে বহুল ব্যবহৃত হয়। গণিতশাস্ত্রেও তাঁর প্রচুর অবদান। তিনি অনুকলন বিদ্যার উন্নতি সাধন এবং হিসেব নির্ণয়ে লগ্যারিদমের ব্যবহারের পরিবর্ধনও করেন। তিনিই প্রথম জোয়ার-ভাঁটার চাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করেন।

অবশেষে ১৬২৯ সালে রিজেনস্‌বার্গে এই মহামনীষির মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরে আজ তিন শতাব্দীরও বেশী পার হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও তাঁর ভাস্বর কীর্ত্তি আজও অম্লান হয়ে আছে। উপসংহারে তাঁরই নিজের সমাধি স্তম্ভের জন্য লেখা লিপি উল্লেখ করা যায়ঃ

> "I measured the skies, now the shadows I measure,
> Sky-bound was the wind, earth-Bound the Body rests".

...........উইলিয়াম হার্ভে..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৭৮—১৬৫৭)

ষোড়শ শতাব্দী প্রায় ছুঁই ছুঁই। উত্তর ইটালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘরে বিখ্যাত অধ্যাপক ফ্যাব্রিসিয়াস অ্যানাটমি পড়াচ্ছেন। নানান জায়গা থেকে ছাত্ররা এসেছে এখানে অ্যানাটমি পড়তে। তাদের মধ্যে একজন তরুণ ইংরেজ খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাঁর অ্যানাটমির অধ্যাপকের শবদেহের শিরা ও ধমনী গুলোর কাটাছেঁড়া গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিলেন ও তাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রবল মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন।

যদিও সে সময় মানব শরীরতত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে বেশ অগ্রগতি হয়, তবুও হৃৎপিন্ড ও শিরা-ধমনীর রহস্যময় কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। সে যুগের শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে বেরিয়ে শিরা ধমনীতে ঢেউয়ের মতো এদিক-ওদিক করে অবশেষে নিঃশেষিত হয়ে যায়; রক্ত কখনও হৃৎপিন্ডে ফিরে যায় না। সে যুগে শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের হৃৎপিন্ডের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ কাউকে কাউকে বলতে শোনা যেত যে একমাত্র ভগবানই হার্টের কার্যপ্রণালী জানেন।

সেই তরুণ ইংরেজ তাঁর সময়কার অন্যান্য ছাত্রদের মতোই গ্যালেনের বইগুলো

খুব ভাল করে পড়তেন এবং শিরা-ধমনী সম্বন্ধে ফ্যাব্রিসিয়াসের প্রত্যেকটা কথা খুব মন দিয়ে শুনতেন। ফ্যাব্রিসিয়াসের মতে বৃহত্তর শিরাগুলোতে কতকগুলো ভালব (কপাটক) পরপর সাজান থাকে। কিন্তু তিনি ভালবগুলোর ক্রিয়ার কোনও রকম ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তরুণ ইংরেজও এই ভালভের ব্যাপারে বেশ বিভ্রান্ত বোধ করেন। তরুণ মনে মনে উপলব্ধি করেন প্রকৃতি নিশ্চয়ই বিনা কারনে শিরাগুলোর ভেতরে ভালবগুলোকে তৈরী করে নি। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কারণটা কি?

এর পরে প্রায় দুই দশক কেটে গেছে। সেদিনের সেই প্রশ্নের সমাধান হয়েছে—রক্ত সংবহনের গোপন রহস্য আজ মানুষের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত। এবং রক্ত সংবহন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা হিসাবে সেদিনের সেই তরুণ ইংরেজ উইলিয়াম হার্ভে, বিজ্ঞান জগতে বিশেষ করে চিকিৎসা জগতের যজ্ঞশালায় এক অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

হার্ভের জন্ম ১৫৭৮ সালে। তাঁর বাবা রানী এলিজাবেথের আমলের একজন সফলকাম ব্যবসায়ী। হার্ভে ১৫৯৭ সালে, মাত্র উনিশ বছর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রী নিয়ে উত্তীর্ণ হন। প্রথম সারির ডাক্তার হবার প্রবল বাসনা তাঁকে পাদুয়ায় টেনে আনে। পাদুয়ার তার শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ হিয়েরোনাইমাস ফ্যাব্রিসিয়াস। ফ্যাব্রিসিয়াসের অ্যানাটমি পড়াবার ধরণই ছিল আলাদা। তিনি বই ধরে না পড়িয়ে, শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে দেখিয়ে পড়াতেন।

১৬০২ সালে তিনি মেডিকেল ডিপ্লোমা অর্জন করেন। যে সময়ে তিনি পাদুয়ায় থাকতেন তখন মহান গ্যালিলিও সেখানে পড়াতেন। গ্যালিলিওর বক্তৃতা শুনতে ছাত্রেরা দলে দলে আসত। এবং সম্ভবত হার্ভের সৃজনশীল মনোভাবও গ্যালিলিওকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়। তাঁর মনেও প্রশ্ন দেখা দেয়। হার্টের সত্যিকারের কাজ কি? রক্ত কিভাবে হার্টে চলাফেরা করে? ধমনীর মধ্যে একমুখী ভালবগুলো থাকার উদ্দেশ্য কি? প্রশ্নগুলো অবিরত তাঁর মনে খোঁচা দিত। সমাধানের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

ফলে, ১৬০২ সালে তিনি পাদুয়া ছেড়ে আবার কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন এবং কেম্ব্রিজেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। যে বছর শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটক প্রথম গ্লোব থিয়েটারে মঞ্চস্থ হোল, সেই বছরই হার্ভে লণ্ডনে তাঁর প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করলেন। ১৬১৫ সালে 'রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস''-য়ে বিশেষ লেকচারের পদে নিযুক্ত হন। এতে হার্ভে তাঁর নিজের গবেষণার প্রভূত

সুযোগ অর্জন করেন। এবং হার্ট ও রক্তের চলাফেরা সম্পর্কিত তাঁর নব-আবিষ্কৃত তথ্যও তরুণ ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে সমর্থ হন।

কিন্তু নতুন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘোষণা করা এক ব্যাপার, আর প্রাচীন তত্ত্ব গোঁড়া ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা চিকিৎসকদের নতুন আবিষ্কৃত কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করান আর এক ব্যাপার তার জন্য দরকার সন্দেহাতীত যুক্তি, অকাট্য প্রমাণ। সেজন্য তিনি সাপ, ব্যাঙ, চিংড়ি প্রভৃতির অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে তাদের সংবহন তন্ত্র স্টাডি করতে লাগলেন। এতে তিনি একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকটারই হার্ট সঙ্কুচিত হয় এবং হার্ট থেকে রক্ত ধমনীতে আসে। তিনি এইভাবে হার্টের পেশীর ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং হার্টের সংকোচনের কারন ও প্রকৃতি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এছাড়াও তিনি দেখলেন যে, হার্ট সংকোচনের ফলে রক্ত ধমনীতে আসে ও চাপ দেয় এবং ধমনীতে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই এই চাপ অনুভব করা যায়। এইভাবে মিনিটে ধমনীর চাপ অনুভব করে এবং তা গুণে হৃৎস্পন্দনের হার নির্ণয় করা যায়। এই আবিষ্কারই পরে মেডিকেল প্র্যাকটিশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে —ডায়াগনাসিসের প্রথম সোপান হিসেবে।

এর পরেই হার্ভে আরও কঠিন সমস্যার দিকে ঝুঁকলেন। স্তন্যপায়ী জীবের চার কক্ষ বিশিষ্ট হার্ট এবং রক্তবাহী নালীকাগুলোর কার্য প্রকৃতি জানবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। গবেষণাগারের জন্তুদের ওপর দীর্ঘ, নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ফল হিসেবে অবশেষে তিনি রক্ত সংবহনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে হার্টের ভেতরের ভালবগুলো এমন ভাবে সাজান আছে যাতে রক্ত শুধু মাত্র একদিকেই প্রবাহিত হয়। রক্ত পালমোনারী ধমনী দিয়ে ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে যায় এবং পালমোনারী শিরা দিয়ে আবার বাম অলিন্দে ফিরে আসে। বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে এবং পরে মহাধমনীতে রক্ত প্রবেশ করে। মহাধমনী থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে এবং এইভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরে মহাশিরাদ্বয় এবং সাইনাস ভেনোসাস দিয়ে রক্ত আবার ডান অলিন্দে ফিরে আসে। এবং ডান অলিন্দ থেকে আবার ডান নিলয়ে যায়। এইভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।
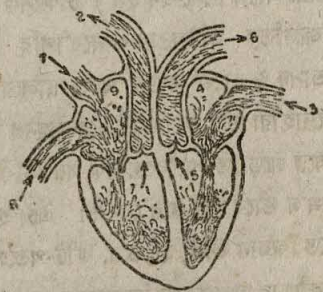
'রক্ত যে অবিরত হার্টে ফিরে আসে'—এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তিনি হার্টের

প্রত্যেক সংকোচনের ফলে যে রক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তার মোটামুটি একটা হিসেব করেন। নাড়ীর গতি বা হৃদ্স্পন্দনের প্রতি মিনিটে গতির হারের ওপর ভিত্তি করে তিনি নির্ধারণ করেন যে, প্রতি আধ ঘণ্টায় হার্ট কর্তৃক পরিত্যক্ত রক্তের পরিমাণ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণের থেকে বেশী। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, রক্ত শিরার মাধ্যমে আবার হার্টে ফিরে আসে। এজন্য তিনি একটা পরীক্ষাও করেন। পরীক্ষাটা—হাতের একটা বিশিষ্ট শিরার ওপর তিনি জোরে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেন। দেখেন যে রক্ত-চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে শিরাটা ফুলে উঠেছে। আস্তে আস্তে তিনি আঙুলটাকে হাত বরাবর ওপর দিকে ওঠাতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন যে, রক্ত শিরা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে, কিন্তু ফিরে নীচে নামছে না। ফলে তিনি নিশ্চিত হন যে শিরার মধ্যে যে কপাটিকাগুলো আছে তা রক্তকে শুধুমাত্র একদিকেই প্রবাহিত করে এবং তা নিশ্চিত হার্টের দিকে। এইভাবে প্রায় এক দশকেরও ওপর নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে তিনি রক্তসংবহন সংক্রান্ত তাঁর মতবাদের যথার্থতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং ১৬২৮ সালে তিনি তাঁর মতবাদ "অ্যানাটমিকাল এক্সারসাইজ অন দি মোশন অফ দি হার্ট অ্যাণ্ড ব্লাড" নামক বইয়ের মাধ্যমে জগতের কাছে প্রকাশ করেন। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতোই, তাঁর এই আবিষ্কারকেও প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। খুব কম লোকেই তাঁর এই আবিষ্কারকে মেনে নেয়। বরঞ্চ উল্টে বেশীর ভাগ লোকই তাঁর এই আবিষ্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং আবিষ্কারের স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি রেখে যান। এবং সর্বোপরি তিনি তাঁর ঘোর বিরোধীদের বিনীত অনুরোধ করেন যে, তারা যেন নিজেরা নিজেরাই তাঁর মত অনুরূপ পরীক্ষাগুলো করে, তাঁর আবিষ্কার সত্য না মিথ্যে তা যাচাই করে নেয়।

যাই হোক এর তিন বছর বাদেই তিনি হতভাগ্য রাজা প্রথম চার্লসের, (যাঁর ১৬৪৯ সালে শিরশ্ছেদ হয়) চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৬৪২ সালে রাজনৈতিক জটিলতার ও সর্বোপরি জনগণের এক প্রচণ্ড বিদ্রোহে রাজা, তাঁর সভাসদ ও হার্ভে লণ্ডন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। হার্ভের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহীরা তাঁর ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলে এবং সর্বোপরি তাঁর চার দশকের সযত্নে গড়ে তোলা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অমূল্য তথ্যগুলো নির্মম ভাবে নষ্ট করে ফেলে। এটা হার্ভের কাছে একটা প্রচণ্ড আঘাত ছিল। এতে বিজ্ঞান জগৎ, হার্ভের, কীট-পতঙ্গের বংশ-ইতিহাসের ওপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যগুলো চিরকালের জন্য হারাল।

কিন্তু হার্ভে এই রাজনৈতিক নির্বাসনে হতোদ্যম না হয়ে, প্রজনন-প্রক্রিয়া ও

ভ্রূণের বিকাশের সম্বন্ধে নতুন উৎসাহে গবেষণা শুরু করলেন। এই গবেষণার জন্য তাঁর অনুরোধে রাজা, রাজ সংরক্ষিত হরিণগুলো তাঁকে ব্যবহার করতে দিলেন। কিন্তু তিনি প্রসবসম্ভবা হরিণগুলোকে ডিসেকসান করে দু মাসের ছোট কোন ভ্রূণ পান নি। যৌন কোষ ও ভ্রূণগুলো এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তাদের দেখা খুবই অসুবিধেজনক। ফলে হার্ভের পক্ষেও তা একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, তারও প্রায় দুই শতক পরে জীববিদ্‌গণ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে সেই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন যা বহুকাল আগে হার্ভেও খুঁজে বেড়াতেন ঃ কোথায় এবং কিভাবে জনন কোষ তৈরি হয়? কিভাবে ডিম ফোটে? কিভাবে ডিম ফুটে তা থেকে ছোট বাচ্চা হয়?

হার্ভে, তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই জীবজন্তুর প্রজনন সমস্যার পেছনে ব্যয় করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই "এক্সারসাইজেস অন দি জেনারেশান অফ এ্যানিমালস" ১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয় এবং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ বিক্রির একটা নজিরও গড়ে তোলে।

গ্যালিলিওর মতোই হার্ভেও স্বীকার করেন যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়ার প্রভূত প্রয়োজনীয়তা আছে। হার্ভের আবিষ্কৃত রক্ত-সংবহন সংক্রান্ত থিয়োরী আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা বিরাট সোপান। মানবদেহের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কার্যকলাপের সমস্ত আধুনিক মতবাদের ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে হার্ভের অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশ্রমী পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

.... রেনে ডেসকার্টেস ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৯৬—১৬৫০)

রেনেসাঁস উত্তর যুগে, যে সমস্ত দার্শনিক এবং প্রতিভাবান, যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত স্থাপন করেন. তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হলেন রেনে ডেসকার্টেস। তাঁর মতে, আপাতদৃষ্টিতে সত্যতার আবরণ উন্মোচনের অপেক্ষায় আছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ একদিন না একদিন জগতরহস্যের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। সে কোন না কোনদিন সবকিছুর, তা সে শারীরিক অসুস্থতা থেকে আরম্ভ করে মহাজাগতিক

বস্তু, ধূমকেতু পর্যন্ত সমস্তরই কার্যকারণ, ক্রিয়া-বিক্রিয়া সবই আবিষ্কার করবে এবং অদূরেই সে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে দাঁড়াবে।' ফলে তাঁর মতের স্বপক্ষে তিনি সত্য নির্ধারণের জন্য আবিষ্কার করেন এক বিস্ময়কর অভিনব পন্থা—গণিতের যৌক্তিক পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ।

১৫৯৬ সালে, ৩১শে মার্চ, ডেসকার্টেস টুরেইনের এক বিখ্যাত ফরাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাবার প্রথমা স্ত্রীর তৃতীয় ও শেষ সন্তান। জন্মের কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর মাকে হারান। তাঁর বাবার কাণ্ডজ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং সাধ্যমত মা-হারা সন্তানদের সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করেন। ছোটবেলায় এক আয়ার কাছে মানুষ হন, এবং খুব দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন।

ছেলের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য বাবা তাঁর পড়াশোনা একটু দেরীতেই শুরু করেন। আট বছর বয়স থেকে তাঁর প্রথাগত পড়াশোনা আরম্ভ হয়। সে সময় তিনি লা ফ্লেকের জেসুট কলেজে ভর্তি হন। এই ছোট্ট দুর্বল কিন্তু আস্থাবান ছেলেটিকে কলেজের রেক্টরের খুব ভাল লাগে। তিনি ঠিক করেন যে ছোট্ট ডেসকার্টের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ ভার নেবেন। সেজন্য রেনে তাঁর সমবয়সী স্বাভাবিক অন্যান্য ছাত্রদের থেকে বেশী বিশ্রাম নিতেন। ফলে তিনি বিছানা থেকে একটু বেশী বেলায়ই উঠতেন এবং তাঁর এই দেরীতে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস পরবর্তী জীবনেও তিনি অনুসরণ করেন।

তবে এতে তাঁর পড়াশোনার কোনরকম ক্ষতি হয় নি। তিনি নিয়মিত ভাবে যুক্তি শাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করতেন। এ ছাড়াও আলাদা ভাবে বীজগণিত এবং জ্যামিতিরও চর্চা করতেন। পরে বীজগণিত ও জ্যামিতিই তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই দুই বিষয়বস্তুর প্রমাণগুলো সন্দেহাতীত। রেনে তাঁর পরবর্তী শিক্ষা পয়টিয়ার্সের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাপ্ত করেন। সেখানে তিনি আইনশাস্ত্রও পড়েন। আইন পাশ করার পর তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অন্য কোন পড়াশোনা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং ঠিক করেন যে এরপর থেকে জ্ঞানের জন্য শুধুমাত্র মহান মনীষিদের লেখা বইগুলোই পড়বেন।

এই রকম মনস্থির করার পর প্যারিসে যান এবং মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে জুয়াখেলায় মত্ত রাখেন। কিন্তু এই জীবন বেশীদিন তার কাছে ভাল লাগল না। সেজন্য তিনি আবার পড়তে লাগলেন। পরের দু বছর নিভৃতে শুধুমাত্র গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁর পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে, তাঁর এই শান্ত, নিরুপদ্রব জীবন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শেষ হয়ে যায়। সেই বন্ধুই ডেসকার্টেসকে আবার "জগতের মঞ্চে" ফিরিয়ে আনেন।

এর অল্প কয়েকদিন বাদেই মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি নাসাউ-এর প্রিন্স মরিসের সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেন।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পরেই তাঁকে হল্যাণ্ডের ব্রেডায় পাঠান হয়। ব্রেডায় একদিন তিনি দেখেন যে একটা পোস্টারের সামনে অনেক লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন যে পোস্টারে কি লেখা আছে। তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে পোস্টারের লেখাটা অনুবাদ করে জানিয়ে দেন যে, তাতে একটা অঙ্কের ধাঁধা রয়েছে এবং তা সমাধান করবার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ডেসকার্টেস ধাঁধাটার সমাধান করে দেন। ঘটনাক্রমে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন হল্যাণ্ডের মহান গণিতজ্ঞ ও ডাক্তার—আইজ্যাক বীকম্যান। বীকম্যান তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করেন যে ডেসকার্টেস সাধারণ কোন সৈনিক নন। ফলে তিনি ডেসকার্টেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং পরে তিনিই ডেসকার্টেসের এক বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। এই সাক্ষাৎকারের অনতিকাল, চার মাস পরেই, ডেসকার্টেস জ্যামিতির এক অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কারের কথা তাঁর বন্ধু বীকম্যানকে জানান।

দুরূহ দুরূহ প্রমাণগুলো সম্পন্ন করার জন্য গ্রীক জ্যামিতিবিদ্‌দের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছিল না। ডেসকার্টেস প্রথম সুবিন্যস্ত একটা পদ্ধতির প্রস্তাব করেন তিনি বলেন যে জ্যামিতিক প্রমাণগুলো লেখচিত্রের ওপর সরলরেখা সমূহ এবং দ্বিমাত্রিক চিত্র এঁকেই সমাধান করা যায়। লেখচিত্রে অঙ্কনের জন্য দুটো পরস্পরছেদী নির্দিষ্ট সরলরেখা—একটা অনুভূমিক সরলরেখা (x—অক্ষ) ও একটা উলম্ব সরলরেখা (y—অক্ষ) এবং সরলরেখাদ্বয়ের নির্দিষ্ট এককের প্রয়োজন। এইভাবে কোন লেখচিত্রের ওপর কোন কিছুর অস্তিত্ব দুটো সংখ্যার দ্বারা জানা যায়। প্রথম সংখ্যাটি x-অক্ষ বরাবর দূরত্ব নির্দেশ করে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি y অক্ষ বরাবর দূরত্ব নির্দেশ করে। ডেসকার্টেসের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বীজগণিত ও জ্যামিতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলে বিবেচনা করা হোত। কিন্তু প্রথম ডেসকার্টেস ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সমস্ত সূত্রগুলোকে ঠিক রেখে প্রমাণ করেন যে, বীজগণিত ও জ্যামিতি পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এবং বীজগণিত ও জ্যামিতির সংমিশ্রণে তিনি গণিত শাস্ত্রের এক নতুন শাখার আবিষ্কার করেন। যার আজকের আধুনিক পরিচিতি—'কো অর্ডিনেট বা অ্যানালাইটিক' জিওমেট্রি (বৈশ্লেষিক জ্যামিতি)।

যাইহোক তিনি সেনাবাহিনীর চাকরি ও বিদেশ ভ্রমণ দুইই চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ সময় ব্যাভারিয়ার ডিউকের সৈন্যবাহিনীর হয়ে জার্মানী পর্যন্তও ঘুরে আসেন। কিন্তু প্রায় দেড় বছর পর, যখন তাঁর জেনারেল যুদ্ধে নিহত হন,

তিনি সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করেন। এর মধ্যেই মধ্য ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশই তাঁর ঘোরা হয়ে গেছে। অবশেষে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। এর মধ্যেই গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ফলে প্যারিসেই অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁর কাছে অবিরত দর্শন প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেল। এমন একটা সময় এলো যখন দর্শনপ্রার্থীরা তাঁর নিদারুণ বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। সেই কারণেই ১৬২৯ সালে প্যারিস ছেড়ে শান্ত, নিরুপদ্রব হল্যাণ্ডের পথে পা বাড়ালেন। যদিও তিনি প্যারিস ত্যাগ করেন, তবুও তাঁর বিদ্যালয়ের দিনের পুরোনো বৃদ্ধ বন্ধু ফাদার মেরিন মারসিনের মাধ্যমে প্যারিসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। হল্যাণ্ডে, দর্শনপ্রার্থী এড়াতে ও মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করতে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি সযত্নে তাঁর অবস্থান গোপন করে রাখতেন। সাধারণত তিনি হল্যাণ্ডের শহরগুলো থেকে দূরে থাকতেন এবং বছরে গড়ে একবার করে বাসস্থান পরিবর্তন করতেন।

হল্যাণ্ডের এই দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনে দর্শন এবং অংক ছাড়াও আলোক-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। তিনি তখনও পর্যন্ত কোন বইই প্রকাশিত করেন নি। কিন্তু ১৬৩৪ সালে তাঁর সমস্ত জ্ঞানকে, সে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে মানবদেহের শারীরতত্ত্ব বিদ্যা পর্যন্ত, একত্রিত করে "লে মনডে" নামে একটি বই প্রকাশনা করবার ব্যবস্থা করলেন। প্যারিসবাসীরা মনে করল ডেসকার্টেস বইটা প্রকাশিত করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফাদার মারসিনেকে হয়ত নববর্ষের উপহার হিসেবে প্রদান করবেন। ফলে সমস্ত প্যারিস প্রচণ্ড উদ্‌গ্রীব হয়ে, অত্যন্ত ব্যগ্রতা নিয়ে তাঁর আসন্ন শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তাদের সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল। কারণ, প্রকাশনার ঠিক আগেই ডেসকার্টেস জানতে পারলেন যে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থনের জন্য গ্যালিলিওকে ইনকুই-জিসান দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং ফলও ডেসকার্টেস তাঁর বইটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি যে বন্দী জীবন-যাপনের ভয়ে তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন তা বললে ভুল হবে কারণ হল্যাণ্ডে সব সময়েই ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি খুব কম ছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই পরিস্থিতি তাঁকে নিদারুণ ভাবে আঘাত করে। ....তিনি যেমন তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতেন, ঠিক তেমনই কোপার্নিকাসের মতবাদকেও সঠিক বলে স্বীকার করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পোপের অভ্রান্ততাকেও মনেপ্রাণে

মানতেন। ফলত এই সময় না পারলেন কোপার্নিকাসকে অস্বীকার করতে না পারলেন তাঁর ধর্মকে।

সেজন্য আর অন্য কিছু প্রকাশনা করবার জন্য মনস্থির করলেন। কিন্তু চার্চই, যাকে লংঘন করতে ডেসকার্টেসের দারুণ ভয় ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই চার্চ তাঁকে কোনদিনই বাধা দেয়নি। তাঁকে বরং প্রচণ্ড ভাবে সাহায্য করে। কার্ডিনালস ডি বেরুল্লে ও রিচেলিউ প্রকাশনার জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে উৎসাহিত করেন। অবশেষে ১৬৩৭ সালের ৮ই জুন তাঁর সেরা শিল্পকর্ম—বৈশ্লেষিক জ্যামিতির ওপর লেখা বই "ডিসকোরস্ অন মেথড", বিশ্বের দরবারে প্রকাশিত হয়। এই বই গণিতে একটা নতুন শাখার উদ্ঘাটন। তাঁর ভয় ছিল বইতে তাঁর লেখা সমস্ত বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য তাকে অনেক বিতর্কের মধ্যে পড়তে হবে। সেজন্য বিতর্ক এড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি আগেভাগেই বলে রাখেন যে বইটা প্রকাশের উদ্দেশ্য "নতুন প্রক্রিয়ার আবিস্কার নয়, শুধুমাত্র তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা।" তবুও তার সুনাম উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার তাঁকে ব্যঙ্গ ও আক্রমণের সামনাসামনিও হতে হয়, যেগুলোর উৎস ছিল প্রচুর ঈর্ষা। এইরকম একবার হল্যাণ্ডের উট্রেক্টের প্রটেস্টাণ্ট ব্রহ্মবাদীরা তাঁকে অন্যায় ভাবে অভিযুক্ত করে যে তিনি নাকি রাজ্যে নাস্তিকবাদ ছড়াচ্ছেন। সে সময় অরেঞ্জের প্রিন্স তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন।

যতই তাঁর সুনাম ছড়াতে লাগল ততই রাজ-রাজড়ারা তাঁর প্রতি বেশী ঝুঁকতে আরম্ভ করলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস ও ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই তাঁদের রাজসভার সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। বোহেমিয়ার প্রিন্সেস এলিজাবেথ তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। এইসময় ডেসকার্টেস থাকতেন হল্যাণ্ডের এগমণ্ডে। এখানে তিনি এক শান্ত, সুন্দর জীবন অতিবাহিত করতেন—কখনও ছোট্ট সুন্দর বাগানের পরিচর্যা করে আবার কখনও বা ইউরোপের প্রতিভাবানদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান করে। কিন্তু ১৬৪৬ সালে সুইডেনের কুইন ক্রিস্টিনার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে চলে যান। এটা সম্ভবত তাঁর একটা পক্ষপাতিত্ব। অথবা এও হতে পারে যে, কুইনের বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যাক্তির সংগ্রহশালায় সেকালীন সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিভাবান ব্যাক্তিকে যুক্ত করার জন্য কুইনের অদম্য আগ্রহই ডেসকার্টেসকে সেখানে নিয়ে যায়। কিন্তু এই যাওয়াই তাঁর কাল হল। সবকিছুই হয়তো ঠিকমতই চলত যদি না ক্রিস্টিনা ভোর পাঁচটার সময় থেকে একটা বরফ-ঠাণ্ডা ঘরে তাঁকে দর্শন পড়ানোর জন্য ঠিক করত। যদিও ডেসকার্টেস সর্বদাই ঠাণ্ডাকে ঘৃণা করতেন

এবং কখনও কখনও দুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠতেন না তবুও এই অস্বস্তিকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভদ্রতায়ই হোক আর অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভয়েই হোক কোনও রকম প্রতিবাদ করেন না। ভয়ংকর এই প্রাক-সকালের অনুশীলনে তিন মাস যেতে না যেতেই তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৬৫০ সালে শ্বাস সংক্রান্ত অসুস্থতায় সম্ভবত নিউমোনিয়ায় তিনি রক্ত মাংসের এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেন। সতেরো বছর পরে তাঁর মৃতদেহ প্যারিসে নিয়ে আসা হয় এবং আজকের প্যান্থিয়নে তাঁর মৃতদেহকে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

ডেসকার্টেসের সমসাময়িক একজন সমালোচক থোমাস হবস ডেসকার্টেসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উল্লেখ করে গেছেন যে, শুধুমাত্র গণিতশাস্ত্রই নয়, বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁর প্রতিভার স্মরণ পাওয়া গেছে। পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর অনেক মতবাদই ছিল ত্রুটিপূর্ণ; তিনি প্রথমে শুধুমাত্র যুক্তির ওপর ভিত্তি করে থিয়োরী রচনা করছেন ও পরে সেই থিয়োরীগুলো দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গে থাপ খাওয়াতে চেষ্টা করতেন,—যেমনটি তিনি টরিসেলির শূন্যস্থান অস্বীকার করার ক্ষেত্রে করেন। যাইহোক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ডেসকার্টেস বিশ্বাস করতেন যে, প্রাকৃতিক সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এইভাবে তিনি এও আবিষ্কার করেন যে রক্ত শরীরের মধ্যে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে এবং তাঁর এই মতবাদ হার্ভের মত বালক সমর্থন করে। ফলত ডেসকার্টেসের মত মহান প্রতিভাবাদের সমর্থনই হার্ভের থিয়োরী দ্রুত স্বীকৃতি প্রদান করে।

তবে ডেসকার্টেসের মহান অবদান অ্যানালাইটিক জ্যামিতির আবিষ্কার। অ্যানালাইটিকে জ্যামিতি গণিত শাস্ত্রের একটা নতুন শাখার সূচনা করে, বীজ গণিত ও জ্যামিতিক শক্তিশালী ও সম্পর্কযুক্ত করে তোলে। এ ছাড়াও অ্যানা-লাইটিক জ্যামিতিই, লিবনিজ ও নিউটনের ক্যালকুলাসের আবিষ্কারের সরাসরি ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে। তিনি কতকগুলো সমীকরণও রচনা করেন যার দ্বারা শংকুর প্রস্থচ্ছেদের সমস্ত বক্ররেখাই নির্ধারণ করা যায়। তাঁর গাণিতিক আবিষ্কার গুলো আধুনিক গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের গঠনের ক্ষেত্রে এক একটা রত্নস্বরূপ। এই গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের সুর গ্যালিলিও থেকে এবং পরে নিউটন ও লাগরাঞ্জ এর উন্নতি বিধান করেন।

ইভানগেলিস্তা টরিসেলি

(খ্রীষ্টাব্দ ১০৬৮—১৬৪৭)

গ্যালিলিও বিজ্ঞানের রত্ন-ভাণ্ডারকে শুধুমাত্র তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তত্ত্ব দিয়েই সমৃদ্ধ করেন নি, উপরন্তু অনেক কৃতী বিজ্ঞানীও তৈরী করেছিলেন। তাঁরই অন্যতম একজন কৃতী ছাত্র ইভানগেলিস্তা টরিসেলি।

১ ০৮ সালের ১৫ই অক্টোবর উত্তর ইটালীর ফায়েঞ্জায় টরিসেলির জন্ম। ফায়েঞ্জায় জেসুট বিদ্যালয়ে প্রচুর কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং তারপর বিজ্ঞান পড়তে রোমের "কলেজিও ডি স্যাপিয়েনজা"তে ভর্তি হন। সেখানে গ্যালিলিওর ছাত্র কাসটেলির সংস্পর্শে এসে মাধ্যাকর্ষণ, বলবিদ্যা এবং গতির ওপর গ্যালিলিও সূত্রগুলোর সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করেন। টরিসেলি গ্যালিলিওর "ডায়ালগ কনসারনিং টু নিউ সায়েন্সস" বইটা পড়েন এবং গ্যালিলিওর সূত্রকে মেনে নিয়ে গবেষণামূলক একটা প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে বলেন যে একটা উৎক্ষিপ্ত বস্তু (একটা সীসার বল) অধিবৃত্তাকার পথে গমন করে।

১৬৪১ সালে টরিসেলি ফ্লোরেন্সে যান এবং অন্ধ গ্যালিলিওর কাজকর্মের সাহায্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সে সময় গ্যালিলিও একটা চোঙের মধ্যে ঠিকমত খাপে খাপে বসান একটা পিস্টনকে ওপরদিকে টেনে তুলে চোঙের ভেতর শূন্যস্থান তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বারবারই অকৃতকার্য্য হচ্ছিলেন। গ্যালিলিও এই ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য টেরিসেলিকে বেশ আগ্রহী করে তোলেন। ১৬৩২ সালে, গ্যালিলিওর মৃত্যুর পরেই টরিসেলি ফ্লোরেন্সে অংকের অধ্যাপক এবং টাসকানির গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্ডিনাণ্ডের অংক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এক বছর পরেই তিনি সেই বিখ্যাত শূন্যস্থান— পরীক্ষাটি করেন, যেটা আজকের ব্যারোমিটারের ভিত্তি প্রস্তর।

পরীক্ষার জন্য দুটো একমুখ বন্ধ ছেচল্লিশ ইঞ্চি লম্বা কাচনল তৈরি করা হয়েছিল। (ফ্লোরেন্স তখন কাচ শিল্পের একটা কেন্দ্র) তিনি দুটো নলই পারদ (তিনি বলতেন 'কুইকসিলভার') দিয়ে ভর্তি করেন। তারপরে খোলা মুখ-গুলো আঙুল দিয়ে চেপে একটা পারদভরা পাত্রে উপুড় করে দেন। দেখলেন যে নলের পারদতল কিছুটা নেমে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাত্রের পারদতল এবং নলের পারদ-তলের উচ্চতার তফাত প্রায় তিরিশ ইঞ্চি। নল দুটোকে একটু কাত করে দেখলেন যে কিছু পারদ নলের মধ্যে আবার ঢুকল। কিন্তু

এবারও উলম্বভাবে দুই পারদ-তলের পার্থক্য সেই আগের মতোই প্রায় তিরিশ ইঞ্চি।

টরিসেলি পরিষ্কার বুঝলেন যে নলের উপরের ফাঁকা জায়গাটি সম্পূর্ণ শূন্য (যা আদতে পারদ বাষ্পে পূর্ণ) কারণ পারদ নীচের দিকে নামা কালে অন্য কোন কিছুই তাতে যায় নি। কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন এল যে, কেন নলের সমস্ত পারদই নীচে নেমে আসছে না এবং কেন পারদতল দুটোর পার্থক্য প্রায় তিরিশ ইঞ্চি।

পরে টরিসেলি সমস্ত কিছুরই উত্তর পান। তিনি আবিষ্কার করেন যে, বায়ুমণ্ডলের চাপই পারদতলকে ধরে রেখেছে। ১৬৪৩ সালে একটা কাগজে তিনি লেখেন যে, আমরা একটা বিরাট বায়ু-সাগরের মধ্যে বাস করছি, যেটা পাঁচশো মাইলেরও বেশী উঁচু। বায়ুর ঘনত্ব জলের প্রায় ১/৮০০ অংশ। পারদ পাত্রের উপর বাইরের বায়ু মণ্ডলের চাপ এবং নলের ভিতরের পারদের চাপ সমান। অর্থাৎ তিরিশ ইঞ্চি পারদ স্তম্ভের ওজন, পাঁচশো মাইল বায়ুর ওজনের সমান। তিনি তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথাও উপলব্ধি করেন কারণ তিনি বলেন যে জলের বেলায় এর থেকে অনেক বেশী লম্বা কাচনলের প্রয়োজন—প্রায় চৌত্রিশ ফুট লম্বা (পারদ জলের থেকে প্রায় ১৩.৬ গুণ ভারী)।

তিনি তাঁর আবিষ্কৃত এই শূন্যস্থানের ধর্মও পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন বায়ুমণ্ডলের মতোই এর ভেতর দিয়েও তাপ, আলোক ও চৌম্বক শক্তি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। এছাড়া তিনি গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কিছু উন্নতিসাধন এবং খুবই প্রাথমিক ধাপের একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রও তৈরি করেন। তিনি তরলের গতি এবং উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গমন পথের ওপর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধও লেখেন। গণিতজ্ঞ হিসেবে তাঁর দান "সাইক্লয়েড" নামে বক্রতলের ওপর তাঁর অনেক তথ্য। (সাইক্লয়েড হচ্ছে গতিশীল কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের ওপর কোন একটা বিন্দুর থেকে উৎপন্ন বক্রতল)।

তুলনামূলক ভাবে খুব কম বয়সে, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে, ১৬৪৭ সালের ২৫শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কিনা আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের কথা, তার গুণাবলীর কথা উপলব্ধি করতে পারেন এবং আমাদের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহালও করেন।

ব্লেইজ পাস্কাল

(খৃষ্টাব্দ ১৬২৩—১৬৬২)

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৬২৩ সালে ফ্রান্সের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্লেইজের জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সেই তিনি তাঁর মাকে হারান। তখন থেকেই তাঁর বাবা এটিয়েনই একাধারে তাঁর বাবা, মা এবং শিক্ষক। তাঁকে তাঁর কাছে বাবা নিজের মতানুসারে খুব সুন্দর করে সহজ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পড়াতেন। ফলে তাঁর কাছে পড়াশোনা ব্যাপারটা কোনদিনই খুব একটা দুর্বোধ্য বা কঠিন লাগত না। প্রথমে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইতিহাস ও ভূগোল পড়েন এবং পরে তাঁর বাবার প্রিয় বিষয় অংক নিয়ে পড়তে শুরু করেন। মাত্র বার বছর বয়সেই একা একাই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অনেক কিছুই নিজের মত করে আবিষ্কার করেন ; যেমন সরলরেখা ও বৃত্তের নাম দেন "বার" ও "রাউন্ড"। কোনও রকম বইয়ের সাহায্য ছাড়াই তিনি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি যে দুই সমকোণ তা প্রমাণ করেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি কনিকসের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাতে একটা গাণিতিক সূত্র ছিল যেটা পূর্বেই মোটামুটি ভাবে ডেসারগুস নামে একজন গণিতবিদ্ সিদ্ধান্ত করেন। প্যাস্কালের এই প্রবন্ধ তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল বিজ্ঞানীদের দ্বারাই প্রচণ্ড ভাবে সমাদৃত হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকেন শুধু একজন—তিনি রেনে ডেসকার্টেস। ডেসকার্টেসের মতে এরকম সূত্রের আসল প্রবক্তা ডেসারগুস। কিন্তু বাস্তবে ডেসারগুসের যেখানে শেষ, পাস্কালের সেখানে শুরু।

এক ধরণের হিসাব নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কারই বোধহয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর বাবা ১৬৪০ সালে রুঁয়ের ট্যাক্স-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই কাজে তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হোত যে কোনদিনই তিনি দুটোর আগে ঘুমোতে পারতেন না। সেজন্য এই প্রচণ্ড অসুবিধে থেকে বাবাকে উদ্ধার করার জন্য ১৬৪৫ সালে তিনি হিসাব নির্ণয় যন্ত্রের একটা ছোট খাটো কার্যকরী মডেল তৈরি করেন এবং পেটেণ্ট লাভ করার চেষ্টা করেন। ১৬৫২ সালে এই যন্ত্রের একটা পুরোপুরি স্ট্যাণ্ডার্ড মডেল তৈরি করেন। তিনি সুইডেনের রানী ক্রিষ্টিনাকে এই যন্ত্রের একটা উপহার দেন।

পাস্কালের সময়ে সমগ্র ইউরোপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা নতুন

ধারণার সৃষ্টি হয়। যার ভিত ছিল গ্যালিলিওর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তার প্রসূত ফলগুলো। ইউরোপের মানুষ তখন বিজ্ঞানের নতুন পরীক্ষামূলক যুক্তিতত্ত্বের ওপর বেশী আগ্রহী হয়ে উঠল। এরকম আগ্রহী মানুষেদের নিয়ে গড়া একটা দল প্যারিসে ছিল। যার নাম "অ্যাকাডেমিয়ে লিব্রে"। যা আজকের দিনে "অ্যাকাডেমিয় ডেস সায়েন্সেস" নামে পরিচিত। এটিয়েন পাস্কাল এই সংঘেরই একজন সদস্য ছিলেন। সংঘের সভাপতি ছিলেন ফাদার মারসিনে।

টরিসেলির পরীক্ষার খবর ফ্রান্সে প্রথম ফাদার মারসিনে তাঁর কাছে লেখা একটা চিঠির থেকে জানতে পারেন। এবং তারও অনেক পরে ১৬৪৬ সালের শেষদিকে পাস্কাল পিয়েরে পেটিটের থেকে তা অবগত হন। ফাদার মারসিনে এবং পিয়েরে পেটিট উভয়ে মিলে টরিসেলির পরীক্ষাটি আবার করেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত কাচ নলগুলো ভঙ্গুর ছিল বলে তাঁরা অকৃতকার্য হন। পরে পাস্কাল এবং পেটিট উভয়ে মিলে আবার টরিসেলির পরীক্ষাটি আবার নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু এবারে তাঁরা সফল হন কারণ সেবারে কাচ নলগুলো ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কাচ উৎপাদন স্থান রুঁয়ের থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এরপর পাস্কাল একাই বিভিন্ন ধরণের কাচনল এবং পারদের বদলে জল এবং লাল মদ দিয়ে একই পরীক্ষা বারবার করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছোন যে, টরিসেলির পরীক্ষায় নলের ওপরের অংশটুকু সত্যি সত্যিই সম্পূর্ণ শূন্য। এ সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞান সম্পর্কিত কাগজও তিনি তা বর্ণনা করেন।

১৬৪৭ সালে পাস্কাল ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্যারিসে যান। সেখানে ডেসকার্টেসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং এই সমস্ত পরীক্ষার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা হয়। কিন্তু তবুও তিনি ডেসকার্টেসকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারেন না যে সত্যি সত্যিই শূন্যস্থান সৃষ্টি করা যায় কারণ ডেসকার্টেসের প্রচণ্ড কু-সংস্কার ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের এই সাক্ষাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, ডাক্তারের বারণ উপেক্ষা করেও তিনি তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ক্লেরমণ্টের কাছে পুই-দে-দোলে পাহাড়ের ওপর তাঁর বোনের স্বামী পেরিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে টরিসেলির পরীক্ষাটি আবার নিষ্পন্ন করেন। তিনি দেখেন পাহাড়ের মাথায় এবং পাহাড়ের পাদদেশে নেওয়া পারদতলের পার্থক্য প্রায় তিন ইঞ্চি। সেদিনের সেই পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি আজকের বিমানে ব্যবহৃত উচ্চতা মাপক যন্ত্রগুলো। কারণ সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর প্রথম দু মাইলে, প্রত্যেক হাজার ফুট উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর চাপ স্বাভাবিক পারদের চাপের এক ইঞ্চি পরিমাণ কমে। ওপরের দিকে বায়ুচাপ হ্রাস পায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হারে।

প্যাস্কাল তরল পদার্থের ওপর গবেষণা করে "প্যাস্কালের নীতি" নামে একটা সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন, সূত্রের ভাষা : "কোন আবদ্ধ তরলের এক অংশে চাপ প্রয়োগ করলে, সেই চাপ তরলের অন্যান্য অংশে অপরিবর্তিত হারে স্থানান্তরিত হয় এবং পাত্রের দেওয়ালের গায়ে তা লম্বভাবে ক্রিয়া করে।" এই নীতির ওপরই ভিত্তি করে হাইড্রলিক প্রেস এবং হাইড্রলিক জ্যাকের উদ্ভাবন হয়। যার দ্বারা এক প্রান্তে খুব কম বলে প্রয়োগ করে অপর প্রান্তে অনেক বেশী বল পাওয়া যায়।
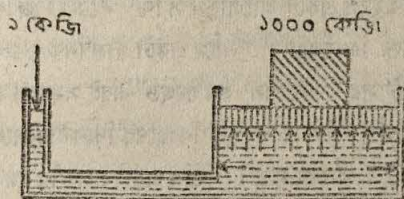
হাইড্রলিক প্রেস

একজন বিজ্ঞানী হওয়া সত্বেও ধর্মের প্রতি তাঁর একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বা দর্শন সম্বন্ধে তিনি খুব একটা পড়াশোনা করেন নি। তবে ১৬৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর বাবা বরফের ওপর পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক ভাবে আহত হওয়া এবং ডেসচ্যাম্প ভাইদের তাঁর বাবাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা প্রদান, এই ঘটনা দুটো তাঁর মনে ভীষণ ভাবে দোলা দেয় এবং ডেসচ্যাম্প ভাইদের এই বদান্যতায় প্রচণ্ড ভাবে মুগ্ধ হন এবং সত্যি কথা বলতে কি তখন থেকেই ধর্মের দিকে আরও একটু বেশী ঝুঁকে পড়েন।

১৬৪৮ সাল থেকে ১৬৫৪ সাল যদিও একদিকে তাঁর জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গৌরবময় অধ্যায় সূচনা করে অপর দিকে পারিবারিক নানা কারণে দুঃখময়, মানসিক অস্থিরতার অধ্যায়ও রচনা করে। সেই সময়ে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর সবচেয়ে কাছের, আদরের প্রিয় বোন জ্যাকুলিন তাঁকে ছেড়ে পোর্ট রয়ালের মঠে সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যান। তিনি সেই সময় মানসিক শান্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা এবং দর্শন শাস্ত্রের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিয়ে দেন। তারপর মনটেইগনির রচনার সংস্পর্শে এসে গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে "পেনসীস" এবং "লেট্রেস" নামে দুটো বিখ্যাত বই রচনা করেন। বই দুটো তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

১৬৫৪ সালের ২৩শে নভেম্বর, ধর্ম সংক্রান্ত একটা ঘটনা প্রচণ্ড ভাবে উপলব্ধি করেন। অব্যবহিত পরেই, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা পার্চমেন্ট কাগজে লিখে জামার সঙ্গে সেলাই করে নেন। আর তারপর থেকেই তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন

দেখা দেয়। তখন থেকে শুধুমাত্র আরাধনা ও ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাই নিয়েই দিন কাটাতেন। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানকে একদম ভুলতে পারেন নি। এজন্য একবার ছদ্মনামে, সাইক্লয়েড নামক বিশেষ বক্রতল সংক্রান্ত কতকগুলো সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ জানান। এতে ক্রিস্টিয়ান হাইজিনস, জন ওয়ালিস, ক্রিস্টোফার রেনে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সাড়া দেন। কিন্তু কেউই পাস্কালের অপ্রকাশিত সমাধানের সঙ্গে মেলাতে পারে না! পরে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। জীবনের শেষ দিকে তিনি "এসপ্রিট ডি জিওমেট্রিয়ে" নামে একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন অনেকের মতে সেটা ডেসকার্টেসের "ডিসকোর্স অন মেথড"-এরই সমতুল্য।

পাস্কালের সংক্ষিপ্ত জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণের দিকে তাকালে আরও একটা বিস্ময়কর তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি একজন গভীর ধর্মপ্রবণ মানুষ হয়েও জুয়াখেলার দিকে লক্ষ্য রাখতেন এবং তা করেই সম্ভাব্যতার গাণিতিক সূত্রের উন্নতিবিধান করেন। এই সম্ভাব্যতাবাদের ওপরেই আজকের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চিন্তাধারা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চেভ্যালিয়ের ডি মেরে'র (মেরে একজন সুদক্ষ লেখক এবং জুয়াড়ী) প্রস্তাবিত দুটো সমস্যাকে বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করেন। পাস্কাল সমাধান দুটো টুলাউসে পিয়েরে ফারমাটের কাছে পাঠান এবং বীজগাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফারমাটও একই উত্তর বার করেন। এই ঘটনায় পাস্কাল উজ্জীবিত হয়ে সম্ভাবনা সম্বন্ধে গাণিতিক সূত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলস্বরূপ তিনি "এরিথমেটিকাল ট্রাঙ্গেল" (পাটীগাণিতিক ত্রিভুজ) আবিষ্কার করেন, যেটা আজকের সম্ভাব্যতা-বাদের ক্যালকুলাসের (গাণিতিক সূত্র) বীজকোষ।

মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে ১৬৬২ সালে তাঁর দেহাবসান হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের একজন অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। আধুনিক কমপিউটার, বিমানে রাখা অলটিমিটার, হাইড্রলিক যন্ত্রগুলো এবং জ্যামিতি, স্ট্যাটিসটিকস ও ক্যালকুলাসের অনেক সূত্র আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞান জগৎ আজও তাঁর কাছে ঋণী।

............রবার্ট বয়েল..................

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬২৭—১৬৯১)

"যদি কোন (আদর্শ) গ্যাসের তাপমাত্রা স্থির থাকে, তাহলে ঐ গ্যাসের আয়তন তার চাপের সহিত ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় ; অন্য কোন ভাবে, (আদর্শ) গ্যাসের তাপমাত্রা স্থির রাখলে, তার যেকোন সময়ের চাপ ও আয়তনের গুণফল সর্বদা একটা ধ্রুবক রাশি । —গ্যাসের এই সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে, সূত্রের যে মহান আবিষ্কর্তার নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তিনি হলেন রবার্ট বয়েল। শুধু এই গ্যাসের উপরি-উক্ত সূত্রই নয়, আরো নানান অভিনব আবিষ্কারের জন্য আজও বিজ্ঞান জগৎ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ।

রবার্ট বয়েল ১৬২৭ সালে, বিত্তবান কর্কের আর্লের চতুর্দশতম পুত্র হিসেবে আয়র্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুদক্ষ ভাষাবিদ্ ছিলেন। ছোটবেলাতেই তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা সুন্দর ভাবে করায়ত্ত করেন। তাঁর এই স্বাভাবিক প্রবণতায়, গৃহশিক্ষকরাও মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় লণ্ডনের সেরা ইটনের প্রিপারেটরী স্কুল থেকে। সেখানে তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। অক্সফোর্ডে তিনি তাঁর সমগোত্রীয় অনেক তরুণ প্রতিভাধরদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের নিয়ে 'ইনভিসিবল কলেজ' নামে একটা দল গঠন করেন। এই দলের সবাই রজার বেকনের সঙ্গে একমত ছিলেন যে সত্য অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রভূত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু পরে যখন রাজা দ্বিতীয় চার্লস নিজেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাকে অনুপ্রেরণা দিতে লাগলেন, তখন রবার্টের দল তাঁদেরকে 'গোপন করে রাখতে চাইলেন না। এবং তাঁরা দ্বিতীয় চার্লসের রাজকীয় সম্মতি নিয়ে নিজেদেরকে 'রয়াল সোসাইটি' নামে প্রকাশিত করেন।

বয়েল হন রয়াল সোসাইটির সভাপতি এবং সভ্যদের সাপ্তাহিক আলাপ-আলোচনার জন্য তাঁর বাড়ীটাই নির্দিষ্ট হয়। সেখানে সভ্যরা নিজেদের নানান পর্যবেক্ষণের ফলগুলো আলাপ আলোচনা করত এবং একে অপরের ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করত। কিন্তু যতই এই সমস্ত অপেশাদার সভ্যদের গবেষণা ফলপ্রসূ হতে থাকল, ততই আরো বেশি পেশাদারী ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে লাগল। ফলে বয়েল বাড়ীতেই একটা গবেষণাগার তৈরি করেন এবং রবার্ট হুক

নামে একজন প্রতিভাবান তরুণকে সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এইবারে তৈরি হল একটা আদর্শ ব্যবস্থা ঃ বয়েলের ছিল মৌলিক চিন্তাধারা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ; এবং বয়েলের চিন্তাধারাগুলোকে কার্যকরী করার জন্য হুকের ছিল কারিগরী ব্যবহারিক জ্ঞান ও উন্নততর বুদ্ধিগত সামর্থ।

যদিও বয়েল বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই (ব্যতিক্রম অ্যানাটমি, কারণ তিনি জন্তুদের কাটা-ছেঁড়া করা সহ্য করতে পারতেন না) আগ্রহী ছিলেন, তবুও বায়ুর পেছনে তিনি বেশী সময় ব্যয় করেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ব তাঁকে বায়ুর উপাদান এবং ধর্ম জানার জন্য আরও গভীর আগ্রহান্বিত করে তোলে। যেমন ঃ শূন্যস্থান তৈরির ক্ষেত্রে টরিসেলির পরীক্ষা, চোঙ থেকে বায়ু নিষ্কাশনের জন্য জার্মাণ বিজ্ঞানী অটো ওন গেরিকের যন্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি। বয়েল ওন গেরিকের বায়ু-নিষ্কাশক যন্ত্রের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত কিছু নতুন পরিবর্তনের চিন্তা করলেন এবং সেইমত নতুন যন্ত্র তৈরি করতে হুককে নির্দেশ দিলেন। হুক এই নতুন যন্ত্রের মধ্যে একটা ভালব বসিয়ে এটাকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন এবং ফলে বয়েলের এই নতুন নিষ্কাশক যন্ত্র সংযুক্ত কোন পাত্রের থেকে আগের থেকে আরো দক্ষতার সঙ্গে বায়ু নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়।

বায়ুর ভৌত ধর্ম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বয়েল তাঁর এই নতুন বায়ু-নিষ্কাশক যন্ত্রের সাহায্যে নানান ধরণের পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি যন্ত্রের কার্যক্ষমতা যাচাই করার জন্যে কাঁচের কক্ষ থেকে বায়ু নিষ্কাশন করতে থাকেন। প্রথম প্রথম ঘড়ির টিক টিক শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু যতই কক্ষ থেকে বায়ু বেরিয়ে আসতে থাকে, ততই টিক টিক শব্দ অস্পষ্ট হতে থাকে। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে শব্দ বায়ুর মধ্যে দিয়ে স্থানান্তরিত হয়।

১৬৬০ সালে বয়েল তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বগুলো বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি "নিউ এক্সপেরিমেন্টস ফিসিকো-মেকানিকাল", "টাচিং দি স্প্রিং অফ দি এয়ার অ্যান্ড ইটস এফেক্টস (মেড ফর দি মোস্ট পার্ট ইন এ নিউ ইঞ্জিন)" বইগুলো প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বায়ুর সাম্যতা সম্পর্কিত মতবাদের জন্য প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন—বিশেষ করে স্পষ্ট বক্তা, খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের সভ্য, ফ্রানসিসকাস লিনাস তাঁকে প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। লিনাসের সমালোচনার জবাবে তিনি তাঁর বিখ্যাত J-টিউব পরীক্ষাটা করেন এবং বিখ্যাত বয়েল সূত্র আবিষ্কার করেন।

তিন দশক ধরে বয়েল নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, নানান আবিষ্কার করেন এবং উত্তরসূরিদের জন্য অনেক পথেরও নির্দেশ করেন। রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বয়েলকেও একজন বিবেচনা করা হয়। কারণ তিনি

বিশ্বাস করতেন যে রসায়ন শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখার থেকেও আরও অনেক কিছু এবং এর স্বপক্ষে তিনি অনেক পরীক্ষাও নিষ্পন্ন করেন। তাঁর বিরাট সাফল্য ও অবদানের সংক্ষিপ্ত সারাংশ হিসেবে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ করা যায়ঃ (১) তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন যে আণবিক গতিশক্তির ফলেই তাপ উৎপন্ন হয়। (২) তিনিই সম্ভবত প্রথম রসায়নবিদ্ যিনি প্রকৃতপক্ষে একটা গ্যাস সংগ্রহ করেন। (৩) ল্যাভসিয়ের ও প্রিস্টলির আবিষ্কারে তাঁর অনেক ভূমিকা ছিল। বয়েলের কথা, "অনেকেই ধারণা করেন যে বায়ু খুব সরল একটা মৌলিক পদার্থ। কিন্তু আমার এ বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় বায়ু কতকগুলো বাষ্পীয় পদার্থের সংমিশ্রন তাদের ধর্ম, গতি প্রকৃতি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" (৪) অ্যালকোহলকে মৃত কীটপতঙ্গের নমুনা সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। তার আগে বিজ্ঞানীরা মৃত নমুনাদের আশানুরূপ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। কারণ শুকিয়ে গেলেই তাদের আকৃতি, রং ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে গেল। (৫) প্রথম 'বিশ্লেষণ' পদ্ধতির প্রচলন করেন। যাতে বিভিন্ন রকমের নির্দিষ্ট পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ চিহ্নিত করা যায়। (৬) প্রথম অম্ল ও ক্ষারের প্রকৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং (৭) প্রথম পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য ব্যারোমিটার ব্যবহারের কথা বলেন ও তিনিই ইংল্যাণ্ডের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি 'সীল্ড থার্মোমিটার' তৈরি করেন ও ব্যবহার করেন।

তাঁর জীবদ্দশায়, বাস্তব এবং কাল্পনিক অনেক অসুখেই তিনি আক্রান্ত হন। ছোটবেলায় এক ভুল ওষুধে তাঁর সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে যায় এবং তাতে তিনি প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে যান। ফলে তখন থেকেই বয়েল চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনের উপর একদম বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর রোগের জন্য বাড়ীতে তৈরি এক অদ্ভুত সঞ্জীবনী ওষুধের ওপর সর্বদা নির্ভর করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় চৌষট্টি বছর পর্যন্ত বাঁচেন এবং এই সময়ের মধ্যে সাহিত্য, রসায়ন, আলোক, জ্যোতি, পদার্থ এবং ধর্মের ওপর চল্লিশটিরও বেশী বই রচনা করেন।

১৬৯১ সালে বয়েল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাঁরাই তাঁকে চিনত, তিনি তাঁদের প্রিয় ছিলেন। তিনি ভদ্রতা ও আভিজাত্যের প্রতীক। কেউই তাঁর জীবনের কোনরূপ আচরণে কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট বোধ করেন নি।

মারসেলো ম্যালপিজি

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬২৮—১৬৯৪)

১৬৪৫ সাল। শেক্সপীয়ার তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' মঞ্চস্থ করার জন্য অকুস্থল হিসেবে উত্তর ইটালীর ভেরোনাকে নির্বাচিত করেছেন।

ঠিক সেই সময়েই উত্তর ইটালীর বোলোগনার কাছাকাছি একটা ছোট্ট শহরে, রোমিওর প্রায় সমবয়সী প্রচণ্ড সাহিত্যানুরাগী এক তরুণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট'-এর রসাস্বাদন করছেন—মণ্টিয়াগো ও ক্যাপুলেট পরিবারের দীর্ঘদিনের বংশ দ্বন্দ্বতার কাহিনী, রোমিও জুলিয়েটের গভীর স্বর্গীয় প্রেমের কথা, এবং অবশেষে বংশদ্বন্দ্বের প্রতিহিংসা পরায়ণতার যূপকাষ্ঠে দুই নিস্পাপ, ফুলের মত সুন্দর জীবনের বলি হওয়ার কাহিনী পড়তে পড়তে অন্তরে এক গভীর মর্মবেদনা উপলব্ধি করলেন। তাঁর জীবনের ইতিহাসও যেন অনেকটা একই সুরে গাঁথা। তাঁদের দুই পরিবারেও সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। দুই পরিবার হলেন—ম্যালপিজি ও সবারাগলিয়া। এই তরুণ হলেন স্বনামধন্য মারসেলো ম্যালপিজি, যাকে পারিবারিক শত্রুতার ফলস্বরূপ জীবনভোর দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

যাইহোক, মারসেলোর জন্ম ১৬২৮ সালে। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের আটটি সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বড়। স্বভাব-চরিত্রে তিনি শান্ত, ধীরস্থির, শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং অপরের সাহায্যেই তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেন। সেই-জন্যে যখন একুশ বছর বয়সে তাঁর বাবা মা দুজনেই মারা যান, ছোট ছোট ভাই বোনদের মানুষ করার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং সেইজন্যই পুনরায় পারিবারিক স্থিতাবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পড়াশোনা মুলতুবী রাখেন।

সেই সময়ে তিনি তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং ঠিক করেন যে, জনগণকে সাহায্য করার সবচেয়ে ভাল সুযোগ চিকিৎসক হওয়া। সেজন্য তেইশ বছর বয়সে বোলোগনার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল শাখায় ভর্তি হন। তিনি শীঘ্রই তাঁর প্রতিভা, পড়াশোনার প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের মন জয় করে নেন। এই সময়ে বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির বিখ্যাত প্রফেসর মাসারি, তাঁর প্রতি একটু বেশী ঝোঁকেন। মাসারি, ম্যালপিজিকে তাঁর ডিসেকসানের সহকারী নিয়োগ করেন

এবং পড়াশোনার জন্য তাঁর বাড়ির নিজের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি দেন। এখানেই ভেসালিয়াস, ফ্যাব্রিজেও ও হার্ভের মত প্রতিভাবান চিকিৎসকের সেরা সেরা শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। এছাড়াও এখানেই তিনি মাসারীর ছোট বোনের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ফলস্বরূপ ভবিষ্যৎ এক সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করেন।

১৬৫৩ সালে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বোলোগনা থেকে এম. ডি. নিয়ে পাশ করেন। তাঁর মেডিক্যাল গবেষণার বিষয় বস্তু ছিল প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রেটিসের জীবন এবং অবদান। এর পরে মাসারির সুপারিশে ১৬৫৬ সালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওরেটিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, এবং সেখানেই অঙ্কের অধ্যাপক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ জিওভান্নি বোরেল্লির সঙ্গে এক গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন।

বোরেল্লি গ্যালিলিওর একজন ছাত্র থাকার সুবাদে, লেন্সের ব্যবহার খুব ভাল করে জানতেন। এই বোরেল্লির তত্ত্বাবধানেই ম্যালপিজি প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জন্তুদের কোষ-কলা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা যুগ্মভাবে হার্টের পেশীর গঠনের ওপর একটা প্রবন্ধও লেখেন। বোরেল্লির সাহসী আগ্রহই ম্যালপিজির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর আত্মপ্রত্যয় জাগাতে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যার ফলে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়।

ভগ্ন স্বাস্থ্য, পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে নিঃসঙ্গতার জন্যে, ১৬৫৯ সালে তিনি আবার বোলোগনায় ফিরে আসেন। বোলগনায় তিনি অ্যানাটমির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেখানেও নানান ধরণের কোষ-কলার ওপর গবেষণা করতে লাগলেন এবং ব্যাঙের ফুসফুসের গঠন পরীক্ষা করতে গিয়ে বায়ুথলির প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে বায়ু-থলিতে কতকগুলো ছিদ্রময় পর্দাও আছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কালে রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঢোকে ও বের হয়।

ম্যালপিজির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—ফুসফুসীয় কোষ-কলার গঠন। তিনি দেখেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালমোনারী ধমনীগুলো ছোট ছোট রক্তজালকে উপবিভক্ত। রক্তজালকের শিরাপ্রান্ত সমূহ যুক্ত হয়ে ছোট ছোট শিরা এবং ছোট ছোট শিরাগুলো যোগ হয়ে বৃহৎ শিরা গঠিত হয়। একই ধরণের ক্ষুদ্র জালক, মূত্রগ্রন্থি, বৃক্কতেও দেখেন। ১৬২৮ সালে যদিও হার্ভে রক্ত সংবহন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, কিন্তু রক্ত কিভাবে ধমনী থেকে শিরায় যায় তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। ১৬৬১ সালে ম্যালপিজি হার্ভের এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করেন। তীব্র উত্তেজনায় ম্যালপিজি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা বোরেল্লিকে

চিঠিতে লেখেন। এবং বোরেল্লিই এই চিঠি ১৬৬১ সালে প্রকাশ করেন। তিনি অণুবীক্ষণ ব্যবহারে প্রচণ্ড দক্ষ হয়ে ওঠেন। এ সময় রক্তের উপাদান হিসেবে রক্ত কণিকারও আবিষ্কার করেন। কিন্তু সুনাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বারাসলিয়া পরিবারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতাও উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তাঁরা ম্যালপিজির চরিত্রের বদনাম ও তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের অপযশ ছড়াতে লাগল। ম্যালপিজি এতই ভদ্র ও নম্র ছিলেন যে কাউকে তিনি বিন্দুমাত্র আঘাত দিতে চাইতেন না। ফলতঃ তিনি তাঁর শত্রুদের প্রতি কোনও রকম বিরুদ্ধাচরণ না করেই, পালিয়ে মেসিনায় চলে গেলেন এবং সেখানেই তিনি চার বছর থাকেন।

স্বদেশ থেকে কোন রকম সাহায্য না পাওয়ায় যখন তাঁর উৎসাহ একেবারে ভাঁটার শেষ মুখে, ঠিক তখনই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদেশ থেকে সাড়া পেলেন। সদ্যনির্মিত লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি থেকে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর জালক ও রক্তকণা আবিষ্কারের নিয়মমাফিক রিপোর্ট ছাপাবার আমন্ত্রণ পেলেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ও প্রাচীন বিখ্যাত অণুবীক্ষণবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম রবার্ট হুক ম্যালপিজিকে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৬৬৪ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির একজন সম্মানিত সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এইভাবে বিদেশের মাটিতে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৬৬১ সালে তিনি 'দি স্ট্রাকচার এ্যাণ্ড মেটামরফোসিস অফ দি সিল্কওয়াম" নামে একটা প্রবন্ধ লিখে রয়্যাল সোসাইটির কাছে পাঠান। রেশম গুটিপোকার ওপর তাঁর এই গবেষণাই প্রথম অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আভ্যন্তরীণ অ্যানাটমির সম্পূর্ণ বিবরণ। তিনিই প্রথম অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বসন, স্নায়ু, পরিপাক ও রেচন তন্ত্রের ক্রিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জালকাকারে বিস্তৃত অসংখ্য সূক্ষ্ম নালিকা বিশিষ্ট শ্বাসনালী বা ট্র্যাকিয়ার সন্ধান পান। ট্র্যাকিয়ার দ্বারাই উন্মুক্ত স্পিরাকল বা শ্বাসছিদ্র পথে বায়ু শ্বাসনালী পথে প্রবেশ করে। এ ছাড়াও ক্যানিয়াল গ্যাঙ্গলিয়া, ভেন্ট্রাল নার্ভ এবং পেরিফেরাল নার্ভের অস্তিত্ব বার করেন এবং তাদের সঠিক চিত্রও অংকন করেন। তিনি খাদ্যনালী এবং সংযোগকারী রেচন নালীকারও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। রেচন নালীকাগুলো আজও পতঙ্গ বিজ্ঞানীরা "ম্যালপিজিয়ান নালীকা" বলে অভিহিত করেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে এই সমস্ত নতুন নতুন গঠন দেখে তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়ে লেখেন ঃ "প্রকৃতির কত আশ্চর্যই আমার বিস্মিত চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এতে ভেতরে ভেতরে এক চরম পুলক অনুভব করছি, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।"

ম্যালপিজি এরপর উদ্ভিদ জগতের গবেষণা করতে শুরু করেন। তিনি অণুবীক্ষণের নীচে পাতার সরু টুকরো রেখে দেখেন যে ছোট ছোট কতকগুলো কোষের সুবিন্যস্ত সমষ্টি। তিনি এগুলোর নাম দেন "আন্ট্রিকেলস"। তার অনেক পরে স্লেডেন প্রথম গাছের কোষ সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে 'স্টোমাটা' অর্থাৎ পাতার বাহিরের দিকে এমন কতকগুলো ছিদ্র থাকে যার সাহায্যেই গাছের শ্বসন বা সালোক-সংশ্লেষ-ক্রিয়া চলাকালে বায়বীয় পদার্থ যাতায়াত করে। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন গাছেরা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গাছের সবুজ পাতাই তৈরি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক আবিষ্কারকে সমন্বয় করে উদ্ভিদ জগতের ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ "প্ল্যাণ্ট অ্যানাটমি" নামে একটা বই প্রকাশ করেন।

তাঁর পূর্বতন জীববিদ্দের মতোই তিনিও জীবনের মূল উৎস ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগলেন। তিনি সেজন্য একটা মুরগীর ডিম নেন এবং ডিম পাড়ার পর থেকে যতক্ষণ না তা ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে ডিমটাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ১৬৭৩ সালে মুরগীর ছানার বিকাশের ওপর দুটো প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বইতে তার উত্তেজনার কথাও বর্ণনা করেন: "ডিমের কুসুমের ওপর একটা ছোট্ট অস্বচ্ছ বিন্দু কিভাবে একটা জীবন্ত, পালকওলা মুরগীর ছানাতে পরিণত হলো!" কিন্তু তিনি ভ্রান্ত ধারণা করেন যে, ফোটবার কালে সমস্ত ডিমের মধ্যেই একটা ছোট্ট ভ্রূণ থাকে এবং 'তা' দেওয়ার ফলে সেটা ছানাতে পরিণত হয়। তাঁর ভ্রান্তির কারণ বোলোগনায় গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ১০৩° ফা., যা প্রায় মুরগীর দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে সমান। এই রকম অবস্থায় মুরগী ডিমের ওপর না দিলেও, ডিমের বিকাশ আপনা আপনিই হতে থাকে।

যদি ম্যালপিজি ডিমের প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি, তবু মুরগীর ছানা হওয়ার ভ্রূণগত পরিবর্তনের তাঁর যে মতবাদ তা উল্লেখযোগ্য ভাবে সঠিক ছিল। এর পরে প্রায় একশো বছর পরে কাসপার উলফ ডিমের থেকে বাচ্চা বের হওয়ার সম্পূর্ণ ইতিহাস সঠিক ভাবে আবিষ্কার করেন। তবুও সঠিক ভাবে বলতে গেলে ম্যালপিজিকেই বর্ণনাত্মক এমব্রায়োলজির জনক বলতে হয়।

এরপর তিনি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত মানবদেহের মাইক্রোসকোপিক অ্যানাটমির দিকে লক্ষ্য করেন। ফলতঃ ত্বকের বর্ণনা, জিহ্বার বর্ণনা, যকৃৎ ও পিত্তরস নির্মাণে তার ভূমিকার বর্ণনা, সুষুম্নাকাণ্ডের তন্তুর বর্ণনা এবং মস্তিষ্কের গ্রে-পদার্থের বর্ণনা এ সবই তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলো রয়াল সোসাইটি প্রকাশিত করেন। বিভিন্ন স্ট্রাকচার যেমন, ত্বকের

ম্যালপিজিয়ান স্তর, বৃক্কের ম্যালপিজিয়ান কণা প্রভৃতি আজও তাঁর নামে পরিচিত।

ম্যালপিঘি তাঁর অনুসরণকারী বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দুইই পান। কিন্তু তাঁর স্বদেশ বোলোগনায় তিনি কখনও এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পান নি। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও পুরোনো শত্রুরা তাঁর ঘরবাড়ি, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক নথিপত্র সমস্ত নষ্ট করে ফেলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ম্যালপিজির চরিত্রের বৈশিষ্ট, মানবিক পরোপকারিতাকে নষ্ট করতে পারেনি। তাঁর শত্রুদের প্রতি কোনও রকম শত্রুতায় না গিয়ে, তিনি নিঃস্বার্থ ও দ্বিধাহীন চিত্তে বোলোগনা পরিত্যাগ করেন। ১৬৯১ সালে তিনি রোমে চলে যান এবং সেখানকার রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। "ইটার্নাল সিটি", রোমে তিনি প্রথম সুখ ও সম্পূর্ণ শান্তি অনুভব করেন। অবশেষে ১৬৯৪ সালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়. তিনি কখনও খ্যাতি বা সুনামের আকাঙ্খা করেন নি। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের জন্য জগৎ তাঁকে খ্যাতির মুকুট মাথায় পরিয়ে দিয়েছে।

ক্রিস্টিয়ান হাইজেনস

(খৃষ্টাব্দ ১৬২৯—১৬৯৫)

বিগত শতাব্দীতে রাজারা তাঁদের যশলাভ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য বিজ্ঞানীদের তাঁদের রাজসভায় নিযুক্ত করত। উদাহরণ স্বরূপ, সম্রাট রুডল্ফ জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাইকো ব্রাহেকে নিয়োগ করেন এবং তাইকো ডেনমার্ক ছেড়ে প্রাগে চলে আসেন। ঠিক এ রকমটিই সপ্তদশ শতাব্দীতেও ঘটে। তখন রাজা সেই তরুণ বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁকে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভার অর্পণ করেন। এইভাবে রাজার মহানুভব প্রস্তাবের মাধ্যমেই তরুণ বিজ্ঞানী —ক্রিস্টিয়ান হাইজেনস, তাঁর প্রতিভার যথোচিত মূল্যপ্রাপ্তি লাভ করেন।

১৬২৯ সালে 'দি হগে' তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রেডা ও লেডেনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পড়াশোনা করেন। শুরু থেকেই তিনি একজন অসাধারণ ছাত্র হিসেবে পরিচিত হন এবং সেই সূত্রে মহান দার্শনিক রেনে

ডেসকার্টেসের মনোযোগের কারণ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাঁর ভাই ও এক বন্ধু, দার্শনিক বেনেডিকট স্পাইনোজার সাহায্যে টেলিস্কোপিক লেন্সের উন্নতি বিধান করেন। ১৬৫৬ সালে তার উন্নত টেলিস্কোপ দিয়েই তিনি 'কালপুরুষ' নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং গ্যালিলিওর দেখা শনিগ্রহের চতুর্দিকের 'হ্যালো' কে এই বলে নির্দেশ করেন যে সেগুলো কতকগুলো বিশাল জ্যোতির্বলয়ের সমষ্টি।

হাইজেনস সারা জীবন ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে যান। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই উপলব্ধি করেন যে, মহাজাগতিক গবেষণায় অনেক ভুলত্রুটি আছে। কারণ মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের অভাব। 'দোলকের সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা যায়'—গ্যালিলিওর এই মত্যানুসারে সময় নির্ধারণের জন্য তিনি ১৬৫৭ সালে একটা ঘড়ি নির্মাণ করেন। এতে একটা কাঁটা দোলকের প্রত্যেক দোলনের ফলে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব অতিক্রম করত। এবং এই ঘড়ি দিয়েই জ্যোতির্বিদ্গণ সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের গতিবিধির সময় যথাযথ ভাবে নিরূপণ করত।

তিনি জানতেন যে ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দোলকের দোলন-কালও পরিবর্তিত হয়। পাহাড়ের ওপরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল অনেক কম। সেজন্য তাঁর ঘড়িকে যখন পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল যে ঘড়ি ধীরে বা স্লো চলতে লাগল। নিরক্ষরেখাতেও মাধ্যাকর্ষণ বল অপেক্ষাকৃত কম। কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এখানে অপেক্ষাকৃত বড় এবং নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে যে অপকেন্দ্র বলের উৎপন্ন হয় তাও বেশী। দৈনিক ঘূর্ণনের কালে নিরক্ষরেখার ওপর কোন বস্তুর কৌণিক বেগ ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও বেশী যেখানে নিউইয়র্কে (যার অক্ষাংশ প্রায় ৪১°) কোন বস্তুর বেগ ঘণ্টায় আটশো মাইলেরও কম। ঘূর্ণন-বেগ, নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায় ততই কমতে থাকে।

যখন হাইজেনস নিরক্ষরেখায় অবস্থিত ফ্রেঞ্চ গুয়ানায় তার ঘড়িটা নিয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করেন, তখন তিনি জানতেন যে, ঘড়িটা কতখানি স্লো হবে। কিন্তু বারবার তাঁর হিসেবে ভুল হয়। কারণ ঘড়িটা দৈনিক আড়াই মিনিট করে
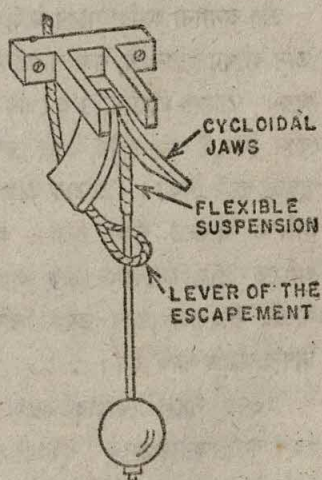
গ্নো হয় যেটা তাঁর নির্ধারিত হিসেবের থেকে বেশী। এ থেকে হাইজেনস সিদ্ধান্ত করেন নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে একটা অতিরিক্ত স্ফীত অংশ আছে, যার ফলে মাধ্যাকর্ষণ বল আরো কমে যায়। আধুনিক যুগে উন্নতিশীল যন্ত্রের সাহায্যে হাইজেনসের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এবং দেখা যায় যে নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর স্ফীতি সত্যি সত্যিই ঘটে ও নিরক্ষরেখায় অবস্থিত বস্তু সকলকে মাধ্যাকর্ষণের সর্বোচ্চ সীমার থেকে দূরে রাখেন।

চতুর্দশ লুইসের রাজত্বে থাকাকালীন অবস্থায় ১৬৬৬ সাল থেকে ১৬৮১ সাল পর্যন্ত তিনি এই রকম আরো অনেক আবিষ্কার করেন। হল্যাণ্ডে ফিরে এসে তিনি আলোক বিজ্ঞানের ওপর নানারকম গবেষণা করেন। স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর হাতের কিছু কিছু লেখা পড়েন এবং তাঁর আবিষ্কারে বিরাট আগ্রহী হয়ে পড়েন। দুজনেই প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলোকের গবেষণা করেন এবং সাদা আলোকের ভেতর লুক্কায়িত বিভিন্ন বর্ণের আলোকের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৬৭৩ সালে তিনি "ট্রিটাইস অন লাইট" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এতে তিনি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে সাদা আলোক যখন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যায় তখন প্রতিসরিত হয়ে বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিভক্ত হয়ে যায়। যার মধ্যে বেগুনী ও নীল রঙের আলোকের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশী এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোট। সবুজ ও হলুদ রঙের আলোকের কম্পাঙ্ক এদের থেকে কম কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশী। আর লাল বর্ণের আলোকের কম্পাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে দীর্ঘ।

তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে "তরঙ্গ" কথাটাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, শব্দ শক্তির মতোই আলো শক্তিও তরঙ্গের মাধ্যমে চলাচল করে। তরঙ্গের মধ্যে মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গ দুইই আছে। মুখ্য তরঙ্গের ওপর যে কোন বিন্দুই হয় গৌণ তরঙ্গ কেন্দ্রবিন্দু। তরঙ্গের দুই পরস্পর শীর্ষ বিন্দুর দূরত্বই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। প্রত্যেক তরঙ্গই গতির অভিমুখের দিক বরাবর একটা নির্দিষ্ট গতিতে গমন করে। আলোক শক্তির বেলায় তরঙ্গের গতি শূন্যে বা বায়ুতে প্রায় সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল (১,৮৬০০০)। এই সূত্রের সাহায্যে কোন তরঙ্গ নির্দিষ্ট গঠন জেনে হাইজেনস পরবর্তী তরঙ্গ গঠন নির্ণয় করতে সমর্থ হন।

১৬৭৬ সালে রোমার নামে একজন বিজ্ঞানী বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। পৃথিবী যখন সূর্য ও বৃহস্পতির মধ্যে থাকে তখনও তিনি গ্রহণ লক্ষ্য করেন, আর পৃথিবী যখন সূর্যের অপর পাশে থাকে তখনও তিনি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন পৃথিবীর এই দুই পৃথক অবস্থায় বৃহস্পতির

চাঁদের গ্রহণ আরম্ভের সময়ের পার্থক্য প্রায় ষোল মিনিট। এর কারণ দুই পৃথক অবস্থায় পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্বের পার্থক্য, যা আলোকে অতিক্রম করতে হয়। রোমারের এই আবিষ্কারকে তিনি তাঁর তরঙ্গ সূত্রের স্বপক্ষে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, আলোক কোন উৎস থেকে তরঙ্গের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এবং গাণিতিক উপায়ে বিশ্লেষিত করা যায়।

হাইজেনসের এই তরঙ্গ-থিওরির স্বপক্ষে যেমন অনেকে ছিলেন তেমন বিপক্ষেও অনেকে ছিলেন। অনেক বিজ্ঞানীই নিউটনের কণাতত্ত্ব বিশ্বাস করতেন। পরে দেখা যায় যে হাইজেনস ও নিউটন উভয়েই সঠিক এবং বর্তমানে এই দুই তত্ত্বই ব্যবহৃত হয়। আলোক বিজ্ঞানের প্রায় আশী শতাংশ ঘটনাই হাইজেনসের থিওরী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি তাঁর নিজের তৈরী প্রচণ্ড শক্তিশালী লেন্সের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। লেডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নমুনা আছে, যার ফোকাস দূরত্ব ২১০ ফুট। ১৬৯৫ সালে এই মহান বিজ্ঞানী 'দি হগে' পরলোক গমন করেন। হাইজেনের থিওরী আজও বিজ্ঞানের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়। অনেক সুদক্ষ সমালোচকের মতে, গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে ক্রিশ্চিয়ান হাইজেনস, নিউটনের সমকক্ষ।

..........এ্যান্টন ভ্যান লিউয়েন হুক..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬৩২—১৭২৩)

১৬৭৩ সাল। হল্যান্ডের ডেল্ফট্ শহরের কাপড়ের একটা দোকান। দোকানের ভেতরে প্রচণ্ড অসহ্য গরম। দোকানীর অনুরোধে এগারজন সম্মানীত ডাচ নাগরিক সেখানে উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে দুজন যাজক, একজন লেখ্য প্রমাণক ও বাকী সবাই বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁরা এক এক করে রৌদ্রালোকিত জানালার সামনে যান ও দোকানীরই তৈরি করা লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের (ব্যাকটেরিয়া) জগৎ। তারা প্রাণভরে এই আশ্চর্য জগৎ দেখেন এবং তাঁদের এই প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। বিশিষ্ট

নাগরিকগণ সবাই প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে একটা প্রশংসাপত্রে সই করে দেন। এই সই করা প্রশংসাপত্রটাই একটা চিঠির সঙ্গে যুক্ত করে ১৬৭৪ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে পাঠান হয়। চিঠির ওপরে ইংরেজীতে লেখা ছিল: "A Specimen of some Observations made by a Microscope Contrived by Mr. Leeuwenhoek concerning Mould upon the skin, Flesh, etc." এতে যদিও লেখকের অপর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করা যায়, তবুও চিঠির ভেতরের বস্তুকে সেদিন রয়াল সোসাইটির জ্ঞানী সদস্যরাও উপেক্ষা করতে পারেন নি এবং প্রথম সারির বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর গবেষণার যথার্থ মূল্যায়ন করেন, যা জীব জগতের একটা নূতন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। সেই কাপড়ের দোকানীই বিজ্ঞানী-নক্ষত্রপুঞ্জের নতুন নক্ষত্র এ্যান্টন ভ্যান লিউয়েন হক।

১৬৩২ সালে হল্যাণ্ডের ডেল্ফটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে আমষ্টারডামে এক কাপড়ের দোকানে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দেন এবং শিক্ষা শেষে ডেল্ফটে ফিরে এসে নিজেই একটা কাপড়ের দোকান খুলে বসেন। তাঁর একটা কাজই ছিল হাতে তৈরি লেন্সের সাহায্যে কাপড় যাচাই করা, সেইজন্যে লেন্সের সঙ্গে তাঁর একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সমস্ত কাজই নিজের হাতে করতেন; মিতব্যয়ীতা অংশত কারণ কিন্তু বেশীর ভাগটাই ছিল তাঁর হাতের সুদক্ষতা। সেইজন্য কোন লেন্স ভেঙ্গে-টেঙ্গে গেলে, অত্যধিক দাম দিয়ে নতুন লেন্স না কিনে সেটাকেই নিজের মত করে সারিয়ে নিতেন। ফলে তিনি স্বভাবতই লেন্স তৈরির মূলনীতি আয়ত্ত করেন এবং ধাতব ফ্রেমের ভেতর রেখে লেন্স তৈরি করতেন। তাঁর তৈরি প্রথম লেন্স এত সুন্দর হয় যে তা ব্যবসায়িক হাত লেন্সকেও লজ্জা দেয় এবং তা দিয়ে তিনি আগের চেয়ে অনেক বিবর্ধিত করে কাপড় দেখতে পারতেন।

যাইহোক, কাপড় দেখে দেখে যখন তিনি প্রচণ্ড একঘেয়েমী বোধ করেন, তখন তিনি লেন্স দিয়ে নানান ধরণের জিনিষ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন; যেমন, কীটপতঙ্গ, মানবত্বক, কাঠের চোকলা ইত্যাদি। ফলে কাপড়ের দোকানের ব্যবসা তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যায় এবং লেন্স নির্মাণ, তার ভেতর দিয়ে নানান কিছু দেখা ও পর্যবেক্ষণের ফলগুলো নথিবদ্ধ করা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি জানতেন তাঁর এই ধরণের কাজকর্মগুলোকে খুব কম লোকই গভীর ভাবে গ্রহণ করবে, সেইজন্য এ সম্বন্ধে তিনি খুব কম আলোচনা করতেন; এমন কি যখন লেন্স ও চশমা প্রস্তুত-কারকেরা তাঁর বিশেষ কারিগরী দক্ষতার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন তখনও তিনি মুখ বন্ধ করে রাখতেন। তবে তিনি ডেল্ফটের প্রতিভাবান চিকিৎসক ডঃ রেগার ডি গ্রাফকে সমস্ত কথা বলতেন। তিনিই প্রথম

লিউয়েন হুকের সাফল্যের জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর নথিপত্র রয়াল সোসাইটিতে পাঠানোর জন্য জোর করেন। এবং তারই ফলে লিউয়েন হুকের স্মরণীয় আবিষ্কারের কথা সম্যকরূপে অবগত হয়।

ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের পূর্বে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হাজার হাজার কীট দেখেন। একই ঘটনা বৃষ্টির জল, রাস্তার নর্দমায়ও দেখেন। অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের "মাইক্রোবসের" মধ্যে পার্থক্য করেন এবং তাঁর পর্যবেক্ষণের কথাও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে ইতস্তত ভ্রমণরত এইসব মাইক্রোবসকে দেখলে অনেক অজ্ঞ দর্শকেরই হয়ত হাসির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু তাঁরা হয়তো জানেন না যে এই সব মাইক্রোবসের কি অপরিসীম ক্ষমতা! পল ডি ক্রুইফের কথায়ঃ "এই সমস্ত কীটরা সমস্ত মানব জাতিকে তাদের আকারের দশ লক্ষগুণ ধ্বংস সাধন করে। এরা আগুনমুখো ড্রাগন কিম্বা হাইড্রা-মাথা-ওলা ভয়াবহ জীবদের থেকেও অনেক বেশী ভয়ংকর। এরা এমন গোপন ঘাতক যে উষ্ণ শয্যা থেকে শিশুকে এবং পাহারাধীন প্রাসাদের মধ্যে রাজাকেও হত্যা করে।"

তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে এই সমস্ত কীটরা কি সমস্ত জলেই বাস করে? তাঁর মনে হল এমনও তো হতে পারে যে এরা, যে সমস্ত পাত্রে জল রাখা হচ্ছে, সেখান থেকে আসে। এর সমাধানের জন্য তিনি বিশুদ্ধ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করেন। এর জন্য একটা প্রায় আঠারো ইঞ্চি উঁচু কাঠের পাত্রের ওপর একটা পরিষ্কার পোর্সেলিনের পাত্র তাঁর বাড়ীর বাগানে রেখে দেন। তিনি সংগৃহীত বিশুদ্ধ বৃষ্টির জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেন কিন্তু কোন মাইক্রোবসের চিহ্ন দেখতে পান না। তিনি একই জল নিয়ে প্রত্যহ দু'বার পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে চার দিন পরে তিনি মাইক্রোবস দেখতে পান। তিনি মাইক্রোবসের আকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে, তাদের সঙ্গে খালি চোখে প্রায় না দেখতে পাওয়ারই মতো পনিরের পোকাগুলোর তুলনা করেন এবং বলেন; "আমার মতে অণুপাত দুটো এরকমঃ জলের পোকা এবং পনিরের পোকার আকারের অণুপাত যেরকম ঠিক সেরকমই মৌমাছি এবং ঘোড়ার আকারের অণুপাত", তিনি এরপর সিদ্ধান্ত করেন যে মাইক্রোবস ধুলো, বায়ুর মধ্যে দিয়ে আসে। তিনি এদের সর্বব্যাপীতায় মুগ্ধ হয়ে যান।

১৬৮০ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এর আগে ১৬৭৪ সালে তিনি মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে রক্তজালক দেখতে সমর্থ হন। তিনিই প্রথম ঈস্ট, প্রটোজোয়া পেশী ও স্নায়ুকোষ কলা সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি ইত্যাদি আরো অনেক অনেক কিছুই দেখেন। তিনি পিঁপড়ের জীবন বৃত্তান্ত লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখেন সাধারণতঃ পরিচিত পিঁপড়ের ডিমগুলো আসলে এক একটা

পিউপা। তিনি ফ্লীর (পাখাহীন মাছি) জীবন বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পুরোনো তত্ত্ব—ধুলো, বালির থেকে ফ্লীর সৃষ্টি, ভুল প্রমাণিত করেন এবং আবিষ্কার করেন যে অন্যান্য পাখা বিশিষ্ট পতঙ্গের মতই তাদেরও ভ্রূণ থেকে জন্ম হয়।

শীঘ্রই নামী নামী লোকেরাও তাঁর লেন্সের মধ্যে দিয়ে এইসব অত্যাশ্চর্য জিনিষ দেখতে চাইল। ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণী, জার্মানীর সম্রাট, রাশিয়ার জার দি গ্রেট পিটার প্রভৃতি সবাই ডেল্ফটে এলেন। ১৬৯৮ সালে রাশিয়ার জার দি গ্রেট পিটার লিউয়েন হকের লেন্সের মধ্যে দিয়ে কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়ে, মাছির ব্রেণ, খাদ্যের ফেলে দেওয়া টুকরোর মধ্যে মাইক্রোবস ইত্যাদি অনেক বিস্ময়কর দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখেন।

কিন্তু লিউয়েন হকের লাগামছাড়া কৌতূহল তাঁর জীবনে এক মুমূর্ষু অসুস্থতা এনে দেয়। নব্বই বছর বয়সে তিনি রয়্যাল সোসাইটিকে দুটো চিঠি লেখেন। এতে তিনি বর্ণনাও করেন যে "মধ্যচ্ছদার এক গণ্ডগোলে তিনি ভুগছেন। অবশেষে এই রোগ সারা ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৭২৩ সালের ২৬শে আগষ্ট তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মেয়ে মারিয়াকে নির্দেশ দিয়ে যান যে তাঁর বার্ণিশ করা দেরাজ আলমারীতে ছাব্বিশটা শ্রেষ্ঠতম লেন্স রাখা আছে; সেগুলো যেন রয়াল সোসাইটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেও যান: "আপনাদের মহানুভবতায় যে সম্মান আমি পেয়েছি, তার কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমি এই লেন্সগুলো পাঠাচ্ছি।"

প্রত্যেক আধুনিক ব্যাক্টেরিয়লজিস্টই এই ডাচ কাপড়ের ব্যবসায়ীর কাছে মানবজাতির ঋণের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। লিউয়েন হকই, স্প্যালানজানি ও পাস্তুরের রাস্তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন। ডেল্ফটের গীর্জায় তাঁর স্মৃতিসৌধে নিম্নলিখিত লিপিগুলো খোদাই করা আছে:

প্রিয়, অমর অ্যাণ্টনি (এ্যান্টন) ভন লিউয়েন হকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, ইংরেজ রয়াল সোসাইটির ফেলোর উদ্দেশ্যে, যিনি তাঁর পরিশ্রমী প্রয়োগ ও যাচাই দ্বারা, তাঁর নিজের তৈরি করা আশ্চর্যজনক মাইক্রোসকোপের দ্বারা প্রকৃতির অনেক রহস্য আবিষ্কার করেন, প্রাকৃতিক দর্শনের অনেক গোপন তথ্যই তিনি ডাচ ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করেন এবং তিনি সারা জগতের সর্বোচ্চ অনুমোদন অর্জন করেন।"

রবার্ট হুক

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬৩৫—১৭০৩)

১৬৬৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক লেকচারার সদ্য প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্যদের সম্বন্ধে বলেন যে, "সদস্যগণ পক্ষহীন মাছি, উকুন এবং নিজেদের সম্বন্ধেই কেবলমাত্র উচ্চ ধারণা পোষণ করে।" এই রকম ব্যাঙ্গোক্তি কিন্তু মুখ্যত সোসাইটির গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের উদ্দেশ্যে করা হয়, যিনি সম্প্রতি "মাইক্রোগ্রাফিয়া" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বইয়ের মধ্যে তাঁর নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা পরিচিত গাছগাছড়া ও কীট পতঙ্গের সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা আছে। ইতিহাসে যদিও এটা লেখা নেই যে, তত্ত্বাবধায়ক লেকচারারের সেই ব্যাঙ্গোক্তির পাল্টা জবাব দেন কিনা; কিন্তু ইতিহাস এটা স্বীকার করে যে, তিনি ওকজাতীয় গাছের কোষকলা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের নাম দেন 'কোষ', যা আজকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষকলার একক আকারের নাম হিসেবে জগতে সুবিদিত। এ ছাড়াও স্থিতিস্থাপকতার সূত্রের—'স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুর যান্ত্রিক প্রসারণ, তার ওপর প্রদত্ত চাপের সমানুপাতিক', আবিষ্কর্তা হিসেবেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

বিজ্ঞানের নক্ষত্রপুঞ্জে এই নতুন নক্ষত্র, রবার্ট হুকের জন্ম ১৬৩৫ সালে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের কাছে উইট দ্বীপে। সমুদ্র সৈকতের নির্জন আবাসস্থলে শুধু তাঁর ছেলেবেলার নিঃসঙ্গতার কথাই লেখা আছে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রচণ্ড সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু দুর্বল থাকার জন্য খেলাধুলোয় অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। ফলে অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজেকে বাড়ীতে আবদ্ধ রাখতেন এবং সেই সময়ই তাঁর সৃজনশীল দক্ষতা দিয়ে নানান যান্ত্রিক খেলনা, যেমন, সূর্যঘড়ি, ঘড়ি, জলকল ইত্যাদি তৈরি করতেন। তাঁর বাবা পল্লীগীর্জার একজন দয়ালু সহকারী যাজক হওয়াতে, দারিদ্রতা বশতঃ তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারেন নি। কিন্তু চটপটে, বুদ্ধিমান ছেলেকে তিনি 'থ্রি-আর'স (লিখন, পঠন, পাটীগণিত) ও প্রাচীন শাস্ত্র শেখান। তেরো বছর বয়সে বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁর একমাত্র প্রিয় সঙ্গীর মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে একা হয়ে যান।

এরপর হুক লণ্ডনে চলে আসেন এবং এক শিল্পীর সহকারী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এইখানেই কিছু অর্থ জমিয়ে তিনি ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলের

কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি নিজেকে প্রতিভাবান ছাত্র বলে প্রমাণিত করেন। তাঁর অঙ্কের ওপর এত দখল ছিল যে, জ্যামিতির প্রথম দুটো বই তিনি মাত্র এক সপ্তাহে শেষ করেন। এবং পড়াশোনায় তাঁর এই প্রতিভার জন্যই তিনি অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পান।

যখন তিনি অক্সফোর্ডে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। দারিদ্র্যতা তাঁর পক্ষে শাপে বর ছিল। কারণ, যে সময় কলেজের অন্যান্যরা অসার কাজে লিপ্ত থাকত, সেই সময় তিনি জীবনের প্রয়োজনীয় সম্পদ জ্ঞান আহরণের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর গভীর মনোযোগ এবং সুপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় তাঁরই একজন শিক্ষক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল, হুকের প্রতি মনোযোগী হন। ফলে বয়েল গবেষণার কাজে হুককে সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রস্তাবে হুক নিজেকে জগতের সবচেয়ে ভাগ্যবান তরুণ বলে মনে করেন। এবং এভাবেই দুই বিজ্ঞানীর আজীবনের এক পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের শুরু হয়।

বয়েলের গবেষণাগারে প্রথম কাজ হিসেবে তিনি বায়ু-সংকোচন ও শূন্যস্থান নির্মাণের নিমিত্ত একটা পাম্প নির্মাণ করেন। এর সাহায্যেই বয়েল তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং তাঁর বিখ্যাত বয়েলের সূত্র আবিষ্কার করেন। হুকের এই কার্যের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে বয়েল রয়্যাল সোসাইটির গবেষণার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক পদে হুকের নাম সুপারিশ করেন। হুক রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। এই সদস্য হওয়ার কারণ হিসেবে বয়েলের সুপারিশই একমাত্র নয়, পৃষ্ঠটান ও কৈশিক ক্রিয়ার ওপর তাঁর মৌলিক গবেষণার কৃতিত্বপূর্ণ নথিপত্রও আছে। গবেষনার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাঁর ওপর এক বিরাট দায়িত্ব বর্তায়ঃ (১) তিনি ঠিক করতেন সোসাইটির গবেষণা কোন পথে চলবে; (২) তিনি সোসাইটির সভ্যদের গবেষণার সার্বজনীন মন্ত্রণাদাতা হিসেবে কাজ করতেন; (৩) এবং প্রত্যেক সাপ্তাহিক মিটিংয়ে সর্বসমক্ষে বিচার বিবেচনা ও আলাপ আলোচনার জন্য তিনটে কি বড়জোর চারটে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা উপস্থাপিত করতেন। রয়াল সোসাইটির দ্রুত অগ্রগতির জন্য দান হিসেবে শুধুমাত্র হুকের প্রতিভা, তাঁর অদম্য উৎসাহ, তাঁর অসাধারণ কার্য ক্ষমতাকেই প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৬৬৫ সালে হুক গ্রেসাম কলেজে জ্যামিতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এইখানেই তাঁর ঘরের ওপরে একটা ছোট চূড়ায় তাঁরই তৈরি কতকগুলো টেলিস্কোপ সাজান থাকত এবং তা দিয়ে তিনি নক্ষত্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। এইখানেই এই শান্তির পরিবেশেই হুক জীবনের বাকী দিনগুলো পরম পরিতৃপ্তিতে অতিবাহিত করেন।

১৬৬৭ সালে তিনি লণ্ডনের নগর-পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হন। ফলে তাঁর

আর্থিক স্থিতাবস্থা আসে এবং রয়াল সোসাইটির কাজকর্ম করে যেতে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই সোসাইটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন। এই সময়েই তিনি বিজ্ঞান জগতকে অনেক তাৎপর্য্যপূর্ণ দান করে যান। ফল স্বরূপ সর্বকালের মহান বিজ্ঞানীদের পাশে নিজের আসনকে পাকাপাকি ভাবে স্থাপন করেন। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের অনেক ঐতিহাসিকই তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতেঃ (১) তিনি শুধুমাত্রই একজন যন্ত্রবিদ্ এবং কিছু দক্ষতা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্যের ধারণার ওপর ভিত্তি করে নানান ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শন করতেন; (২) তিনি বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিতান্তই শখ হিসেবে চর্চা করতেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যাও খাড়া করেন কিন্তু সেগুলোর কোনটাই সমাধান করেন নি; (৩) তিনি ছিলেন একজন কলহপ্রিয় খামখেয়ালী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর কাজ কর্মের সাম্প্রতিক মূল্য নির্ধারণে দেখা গিয়েছে যে এই সমস্ত সমালোচনা ভিত্তিহীন।

হুকের আমলে ইংল্যান্ডের শৌর্য, বীর্য এমন কি তার অস্তিত্বও নির্ভর করত সমুদ্রের ওপর, তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও নৌচালনার কর্তৃত্বের ওপর। নৌচালনা আবার নির্ভর করত আবহাওয়া পরিবর্তনের সঠিক ভবিষ্যৎ বাণীর ওপর। হুকই হচ্ছেন আবহবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, কারণ তিনি আবহাওয়া পরিবর্তন নির্ধারণের জন্য যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন এবং নিয়মমাফিক আবহাওয়ার গতিবিধি নির্ধারণ করার পদ্ধতিকেও সঠিক করেন। তাঁর নির্মিত যন্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ করা যায়ঃ হুইল ব্যারোমিটার, একটা বদ্ধ এ্যালকোহল থার্মোমিটার, একটা উন্নত কনোমিটার, প্রথম হাইগ্রোমিটার, একটা উইন্ড-গেজ এবং বিভিন্ন আবহমাপক যন্ত্রের নির্ধারিত পরিমাপগুলোকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নথিবদ্ধ করার জন্য একটা আবহঘড়ি, সমুদ্রের ওপর ইংল্যান্ডের যে সর্বময় কর্তৃত্ব তা যা ভবিষ্যতেও থেকে যায় তার জন্য ইংল্যান্ড অনেকাংশে হুকের সৃজনশীল প্রতিভার কাছে চিরঋণী।

বায়ু-নিষ্কাশক যন্ত্রের সঠিকতার জন্য হুক দহনের প্রকৃতি সংক্রান্ত অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি দহনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু অবগত হন যেঃ (১) বস্তুর দহন শূন্যস্থানে সম্ভব নয়, (২) বস্তুর দহন কালে, বাতাসের একটা অংশ (অক্সিজেন) সম্পূর্ণ ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। একই দহনের পরীক্ষা তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে সম্পন্ন করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াও একপ্রকার দহন এবং এতে বাতাসের একটা বিশেষ অংশের প্রয়োজন আছে। এ সমস্ত গবেষণাই তিনি ১৬৬৫ সালে সম্পন্ন করেন। তার দুই দশক পরে বিজ্ঞানী স্টল তাঁর ত্রুটিপূর্ণ ফ্লোজিস্টান থিওরীর

প্রবর্তন করেন। এই থিওরী অনুযায়ী বস্তুর দহনের কারণ বায়ুতে বস্তুর বস্তু অংশের ক্ষয় সাধন। কিন্তু ১৭৮০ সালে ল্যাভসিয়ার এবং ল্যাপলাস এই ফ্লোজিস্টান থিওরী বাতিল করে দেন এবং দহনের সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। দেখা যায় যে এক শতক আগের রবার্ট হুকের মতবাদই সঠিক। কিন্তু এটা ভেবে অবাক লাগে যে প্রায় এক শতাব্দী ধরে হুকের দহনের ওপর গবেষণাতত্ত্ব বিজ্ঞান জগত সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় এবং দহন সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য তাঁর প্রাপ্য অগ্রাধিকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হন।

তাঁর গবেষণার ভবিষ্যত অবদানের মধ্যে সিল্কের কৃত্রিম প্রতিকল্পের কথা উল্লেখযোগ্য। মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেন যে রেশম গুটিপোকার বিশেষ গ্ল্যাণ্ড থেকে একরকম চটচটে রস নিঃসৃত হয় এবং তার থেকেই সরু সরু তন্তু বের হয়ে রেশমগুটি নির্মিত হয়। এ থেকে তিনি প্রস্তাব করেন যে কৃত্রিম আঠাল এই ধরণের বস্তু যদি নির্মাণ করা যায় তাহলে তার থেকে তন্তু বের করে নতুন ধরণের কাপড় বোনা যাবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলপ্রসূ হয়। ১৯৩৫ সালে ডু পণ্ট রাসায়নিকগণ এর ওপর আরও বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং ফলস্বরূপ নাইলন, ডেক্রন প্রভৃতি কৃত্রিম সুতো আবিষ্কার করে বস্ত্র শিল্পে এক বিপ্লবের সূচনা করেন।

এ ছাড়াও তিনি বায়ু মণ্ডলের স্বাভাবিক চাপের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম চাপ বিশিষ্ট একটা কক্ষে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং তাঁর শরীরের নানান পরিবর্তনের অবস্থাগুলো সযত্নে নথিবদ্ধ করেন। এমন কি তিনি একটা ডুবুরীর পোশাকও নির্মাণ করেন এবং সেটা পরে সমুদ্রের গভীরে ডুব দেন ও দেখেন সেই পোশাকে প্রায় চার মিনিট ধরে সমুদ্রের গভীরে চাপ সহ্য করেও কোন মানুষ থাকতে পারে।

হুকের অন্যান্য অবদানগুলো যথাক্রমে ঃ (১) তিনিই প্রথম যান্ত্রিক সমস্যা হিসেবে গ্রহগুলোর গতিবিধির থিওরিকে ফরমুলার আকার দেন; (২) তিনি মাধ্যাকর্ষণের দিকেও উঁকি দেন; (৩) তিনি টেলিগ্রাফির ব্যবহারিক যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন; (৪) তিনি ঘড়ির স্পাইরাল স্প্রিংয়েরও উদ্ভাবন করেন এবং আরও অনেক যন্ত্র নির্মাণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত যন্ত্রবিদ্।

হুক স্বার্থপর, খিটখিটে মেজাজের লোক ছিলেন। তার মধ্যে এমন কোন মানবিক গুণ ছিল না যাতে তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রিয় হতেন। প্রকৃতিও তাঁর প্রতি খুব একটা কৃপা করেন নি। তাঁর বেঁটে, কুঁজো শরীরে একমাথা জটপাকান চুল তার মুখমণ্ডলকে আরো কদর্য, কুৎসিত করে তুলত। যাই হোক

তবুও তিনি তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে অনেক বন্ধুরই সাহায্য লাভ করেন। তা সত্ত্বেও হুকের শেষ জীবন খুব একটা সুখের হয় নি। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সাথে তাঁর এক বিরোধ হয়। নিউটন তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেন যে হুক নাকি তাঁর মাধ্যাকর্ষণের ওপর গবেষণার পূর্ণ কৃতিত্ব অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখতে চাইছেন। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীর নিউটনের এই অভিযোগকে সমর্থন করেন না। রয়্যাল সোসাইটি তাঁর মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির পূর্ণ কৃতিত্বের জন্য হুকের অসামান্য প্রতিভা, মহান অবদান বৃহত্তর ভাবে দায়ী।

............স্যার আইজ্যাক নিউটন...

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬৪২—১৭২৭)

১৬৯৬ সাল। ইংল্যাণ্ডের টাঁকশালার তত্ত্বাবধায়ক একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন স্নায়ুতন্ত্রের এক অসুখে ভোগার পর সম্প্রতি সেরে উঠেছেন। জগতের বিখ্যাত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মনে একই প্রশ্ন, এই বিজ্ঞানী কি তাঁর পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছেন? তিনি কি তাঁর তীক্ষ্ম বোধ শক্তি, তীব্র সৃজনধর্মী চিন্তাধারা কি হারিয়ে ফেলেছেন? তখন ইন্টিগ্রাল ও এক্সপোনেনসিয়াল ক্যালকুলাসের গবেষণার জন্য বিখ্যাত জন বারনৌলি এই বিজ্ঞানীর কাছে একটা চিঠি পাঠান। চিঠিতে গণিতের একটা দুরূহ সমস্যার কথা ছিল যে নির্দিষ্ট কিছু গর্তের মধ্যে কোন বস্তুর ন্যূনতম সময়ে পতনের বক্ররেখা নির্ণয় করতে হবে। এর জন্য বারনৌলি জগতের গণিতজ্ঞদের ছয় মাস সময় দেন। সমস্যা সম্বলিত ছাপা কাগজটা ইংল্যাণ্ডের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে বিকেলের এক ডাকে এসে পোঁছোল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে তিনি সমাধান করে বারনৌলির কাছে একটা চিঠিতে ছদ্মনামে পাঠিয়ে দেন। যখন বারনৌলির হাতে চিঠিটা পেঁাছল, তখন তিনি সমাধানের ধরণ দেখেই ইংল্যাণ্ডের সেই বিজ্ঞানীর প্রভুত্বব্যঞ্জক হাতের পরিচয় বুঝতে পারেন এবং মন্তব্য করেন "ট্যানকোয়াম এক্স আনগুই লিওনেম", (এর মধ্যে সিংহের থাবার স্পর্শ আছে।) এই ভাবেই বিজ্ঞান জগৎ সম্পূর্ণরূপে অবগত হন যে ইংল্যাণ্ডের সেই বিজ্ঞানী, ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের

জনক স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর বৈশিষ্ট, তাঁর সৃজনশীল চিন্তাধারা এখনও হারান নি।

কিন্তু নিউটনের এই বৈশিষ্ট কোন পূর্বনির্ধারিত কিছু নয়। ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ণকাল প্রাপ্তির আগেই তাঁর জন্ম হয়। এবং এমন একটা সময় যায় যে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা দেখে কেউ বলেনি যে তিনি বাঁচবেন। তাঁর জন্মের তিন মাস আগেই তাঁর বাবা মারা যান। আইজ্যাক যখন দু' বছরের, তখন তাঁর মা আবার বিয়ে করেন। ফলে আইজ্যাক উলসথোর্পের ফার্মে তাঁর বৃদ্ধা মাতামহের কাছে এসে থাকেন। ইংল্যান্ডের এই পল্লী অঞ্চলে পিউরিটানদের প্রভাব প্রচণ্ড শক্তিশালী থাকাতে, বাবা-মা, ভাই-বোনের সঙ্গে স্বাভাবিক পারিবারিক সম্পর্ক বঞ্চিত হয়ে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে থেকে আইজ্যাক নিঃসঙ্গ ভাবে তাঁর চিন্তাশক্তি ও ধ্যান-ধারণা করার ক্ষমতাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তোলেন; যা পরে তাঁর পূর্বসূরীদের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নানান বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে ও বিশ্লেষণে প্রভূত সাহায্য করে।

বারো বছর বয়সে তিনি গ্রান্থামে কিংয়ের স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাঁর মায়ের বান্ধবীর স্বামী, ঔষধ প্রস্তুতকারক ক্লার্কের বাড়িতে থাকতেন।. তিনি এখানে নানান ধরণের যন্ত্র তৈরি করতেন, যেমন উইন্ড মিলের নমুনা, জলঘড়ি ইত্যাদি। ক্লার্কের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে নানান বৈজ্ঞানিক বই, রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল এবং অনেক ওষুধের বোতল থাকত। তিনি এই সমস্ত বইয়ের ওপর চোখ বোলাতে ভালবাসতেন। এছাড়াও তাঁর আর একটা ভালোলাগার ব্যাপারও এখানে ছিল এবং তা হল ক্লার্কের ছোট্ট সৎমেয়ে মিস স্টোরের মধুর বন্ধুত্ব।

ষোল বছর বয়সে তাঁর বি-পিতা মারা যায়। তখন তাঁর মা উলসথোর্পের খাস জমিদারীর কাজে সাহায্যের জন্য তাঁকে উলসথোর্পের বাড়ীতে ডেকে আনেন। কিন্তু এই জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে তাঁর মন আদৌ লাগে না। চাষবাস সংক্রান্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাজ বা বাজারে জিনিষের দর কষাকষির পরিবর্তে তিনি তাঁর প্রিয় বিজ্ঞানের বইগুলো নিয়ে নির্জনে সময় কাটাতেন। ফলে অবশেষে তাঁকে তাঁর পড়াশোনার জন্য কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হোল।

প্রথম বছরে কেম্ব্রিজে তাঁর প্রতিভার খুব একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। যাইহোক সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আইজ্যাক ব্যারোর সংস্পর্শে আসেন। ব্যারো নিউটনের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং ১৬৬৪ সালে গণিতের স্কলারশিপের জন্য নিউটনের নাম সুপারিশ করেন। ফলে নিউটনের বিজ্ঞানে ভবিষ্যৎ উন্নতির রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি এই সময় ডেসকার্টেসের বীজগণিতিক জ্যামিতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং জানতে পারেন

কিভাবে বিন্দু এবং সরলরেখার মাধ্যমে বীজগাণিতিক পদ্ধতি ও চিহ্নের সাহায্যে জ্যামিতিকে সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। তিনি কেপলারের আলোক বিজ্ঞানের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং আলোকের প্রতিসরণ, টেলিস্কোপের নির্মাণ পদ্ধতি ও লেন্সের নির্মাণ পদ্ধতিও অবগত হন।

যদিও নিউটন গণিতের নীতিসূত্রগুলো সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করেন, তথাপি অব্যবহারিক গণিতের থেকে ব্যবহারিক গণিতের দিকে বেশী ঝোঁকেন। তিনি বৈজ্ঞানিক সমাধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা, বিশ্লেষণ, পূর্ণ-পরীক্ষা ভিত্তির ওপর নির্ভর করতেন।

১৬৬৪ সালে গ্রেট প্লেগ সংক্রমণের ফলে সাময়িক ভাবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি তিনটি মহান আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কার ঃ দ্বিপদ সূত্র ও অনুকলন সূত্রের প্রাথমিক তত্ত্ব। তিনি অনুকলন সূত্রের প্রাথমিক তত্ত্বের নাম দেন "ফ্লাক্সানস"। এর কিছু পরেই তিনি অনুকলন তত্ত্বের বিপরীত সমাকলন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এর দ্বারা বিভিন্ন বক্রতলের ক্ষেত্রফল, ঘনবস্তুর আয়তন ইত্যাদি নির্ধারণ করা যায়। কয়েক বছর পর তিনি যখন তাঁর এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখন প্রশ্ন ওঠে তিনি অথবা জার্মাণ গণিতজ্ঞ লিবনিৎসকে আসলে অনুকলন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আপাতদৃষ্টিতে উভয়েই প্রায় একই সময়ে, স্বাধীনভাবে এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন।

তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার জগতের বস্তু সম্পর্কিত। তিনি কোপার্নিকাসের সূর্য্য কেন্দ্রিক জগতের থিয়োরী, কেপলারের উপবৃত্তাকারে গ্রহদের ঘূর্ণনের থিয়োরী, এবং গ্যালিলিওর গতিসূত্র ও গতিশীল বস্তুর থিয়োরী সবই পড়েন। কিন্তু এমন কোন থিওরীর সন্ধান পান না যার দ্বারা গ্রহদের কক্ষপথে ঘোরার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় বা এমন কোন সঠিক গাণিতিক প্রমাণের পরিচয় পান না যার দ্বারা কোপার্নিকাসের এবং কেপলারের থিয়োরী প্রমাণ করা যায়। তিনি তখন এই সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। কথিত আছে, একটা আপেল গাছ থেকে পড়া দেখে তিনি প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং পরে আবিষ্কার করেন যে "সমস্ত বস্তুই (পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমার মধ্যে) পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পৃথিবী কর্তৃক একটা নির্দিষ্ট বল দ্বারা আকর্ষিত হয়"। এই বলকেই পৃথিবীর অভিকর্ষ বল বলা হয়। তাঁর মনে প্রশ্ন এলো এই বল কি বিশাল গ্রহ ও উপগ্রহের বেলায়ও প্রযোজ্য। তিনি এজন্য 'মনে করেন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত প্রসারিত।' তিনি এরপর তাঁর সূত্র অনুযায়ী চাঁদের কক্ষপথে ঘোরার জন্য প্রয়োজনীয় বল এবং পৃথিবীর উপরি পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ বল নির্ধারণ করেন এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার

করে তাঁর সূত্রের সত্যতা প্রমাণিত। তাঁর এই সূত্র বিশ্ববিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র নামে পরিচিত। সূত্রের কথায়ঃ 'বিশ্বে যে কোন দুই বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং আকর্ষণ বলের মান ওই দুই বস্তুর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।" নিউটন কিন্তু এই সূত্রের কথা কারোর কাছে প্রকাশ করেন না কারণ তাঁর মতে এর সত্যতার সুদৃঢ় প্রমাণের জন্য আরও নিখুঁত ও সঠিক পরীক্ষা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তবুও এটাই ছিল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এর জন্যই গ্যালিলিও, কোপারনিকাস ও কেপলারের সমকক্ষ বলে প্রমাণিত হন।

১৬৬৪ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে উলসথোপে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি তাঁর তৃতীয় আবিষ্কারও সম্পন্ন করেন। এবারের বিষয়বস্তু আলোক বিজ্ঞান, তিনি প্রিজম এবং লেন্স দিয়ে আলোকের ওপর নানারকম গবেষণা করেন। এই সমস্তই তিনি আবিষ্কার করেন যে, "সাদা আলোক কতকগুলো বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমষ্টি। এই সমস্ত বর্ণের আলোকের প্রতিসরাঙ্কও বিভিন্ন।" এবং তার এই আবিষ্কারের ফলেই আলোক বিজ্ঞানে এক নতুন শাখা "বর্ণবীক্ষণের" সূচনা করে।
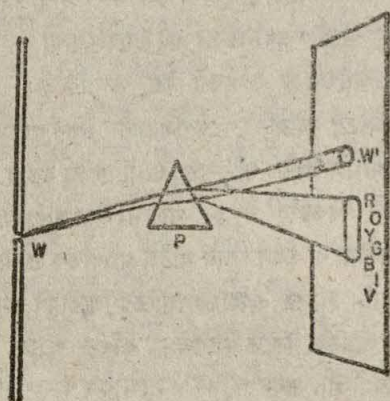
নিউটনের আমলে টেলিস্কোপের একটা বিরাট খুঁত ছিল। লেন্সের ভেতর দিয়ে যখন প্রতিবিম্ব দেখা হোত তখন প্রতিবিম্বের চারিদিকে কতকগুলো রং-বেরঙের বলয় দেখা যেত। কারণ লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো যাবার কালে বিভিন্ন বর্ণের আলোতে ভাগ হয়ে যেত এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের জন্যই জন্যই বিভিন্ন প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হোত। এই ঘটনাকে বলা হয় "ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন"। এ্যাক্রোমাটিক লেন্স তৈরি করা যাবে না এই বিশ্বাস করে নিউটন একটা টেলিস্কোপ নির্মাণ করেন, যার মধ্যে একটা অবতল দর্পণের মাধ্যমে

এ্যাক্রোমাটিক (কালার অ্যাবারেশান ছাড়া) প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয়। পরে ১৭৬০ সালে জন ওল্যান্ড নামে একজন আলোক বিজ্ঞানী এ্যাক্রোমাটিক লেন্স নির্মাণে সফলতা লাভ করেন।

তাঁর প্রিজম, আলোক ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণাই প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং এর ফলেই তিনি জাতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। তিরিশ বছর বয়সে, ইংরেজ বিজ্ঞানীর সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একজন ফেলো নির্বাচিত হন। কৃতজ্ঞতায় তিনি সোসাইটিকে তাঁর নিজের তৈরি প্রথম প্রতিফলিত টেলিস্কোপ উপহার দেন।

তাঁর এই প্রকাশনায়, তাঁকে তদানীন্তন রয়্যাল সোসাইটির রবার্ট হুকের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। হুক তাঁর প্রতি এই অভিযোগ করেন একই পরীক্ষা প্রিজমের সাহায্যে তিনিও করেন। কিন্তু এটা অংশত সত্যি কারণ হুকের গবেষণা ছিল নক্সাগত এবং মীমাংসাহীন। ক্রিশ্চিয়ান হাইজেনস ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও তাঁকে সমালোচনা করেন। যদিও তিনি এ সমস্ত সমালোচনার বিস্তৃত জবাব দেন তবুও ঠিক করেন যে আর অন্য কোন আবিষ্কার প্রকাশিত করবেন না। তিনি এ সম্বন্ধে লিবনিৎসকে এক জায়গায় লেখেন : "আমার আলোকের থিয়োরীর প্রকাশনায় যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে তাতে আমি এতই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছি যে ছায়ার পেছনে দৌড়বার জন্য আমি আমার অবিচক্ষণতার ওপর দোষারোপ করছি। এই যন্ত্রণা যত না প্রকৃত অস্তিত্বপূর্ণ সত্য হাতছাড়া করার জন্য কিন্তু তার চেয়েও বেশী আমার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার জন্য।"

নিউটন এ ছাড়াও বেশী জরুরী চতুর্থ একটা সমস্যারও মীমাংসা করেন। গ্রান্থামে যাঁর বাড়ীতে থাকতেন এবং যাঁর প্রতি তাঁর প্রবল একটা আসক্তিও ছিল সেই মিস স্টোরের সঙ্গে নিউটন বরাবর সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি মিস স্টোরকে বিয়ে করার কথাও ভাবেন। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক পদ। নিজের মনে মনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি নিজেকে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যেই আত্মোৎসর্গ করেন। ফলে ১৬৬৭ সালে তিনি কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন এবং ট্রিনিটি কলেজের সদস্য পদ লাভ করেন। পরের কুড়িটা বছর তিনি কেম্ব্রিজের অধ্যাপক পদেই কাটিয়ে দেন। রসায়ন বিদ্যায়ও নিউটনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ব্রহ্মবিদ্যাও তিনি চর্চা করেন। তিনি অদ্বিতীয়বাদে বিশ্বাস করতেন।

চেহারার দিক দিয়ে নিউটন ছিলেন বেঁটে খাটো। টানা টানা ভুরু ; বুদ্ধি-দীপ্ত মুখ ; লম্বা নাক ; এবং অন্তর্ভেদী বাদামী চোখ। তাঁর চুলগুলো সে

মুগের স্টাইলের মতই ঘাড় অবধি প্রসারিত। যদিও তিনি লাজুক, চাপা স্বভাবের ছিলেন তবুও তাঁর হাসি ছিল মনোরম, এবং কোন আলোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল চকচক করে উঠত।

১৬৮৩ সালে এডমণ্ড হ্যালি নামে একজন তরুণ জ্যোতির্বিদ্ কেম্ব্রিজে নিউটনের কাছে আসেন এবং প্রকৃতির বল হিসেবে হ্যালির মতবাদ মহাকর্ষের ব্যাপারে নিউটনকে সাহায্যের কথাও বলেন। কিন্তু হ্যালি আশ্চর্য হয়ে যান যখন শোনেন যে নিউটন এ সম্বন্ধে অনেক বছর আগেই গবেষণা করেন। তিনি তখন নিউটনকে তাঁর আবিষ্কার প্রকাশের জন্য জোরাজুরি করেন। আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও হ্যালির জোরাজুরিতেই তিনি তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করতে অবশেষে রাজী হন। পরের দু বছরে নিউটন বিজ্ঞান জগতের দুর্লভ গ্রন্থ "ফিলোজফিয়ে নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিসিয়া" লিখে ফেলেন এবং হ্যালি নিজের খরচে এই বইটা প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এই বইটা তিনটে খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে নিউটনের তিনটে গতিসূত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। তিনটে সূত্রঃ (১) বস্তু চিরকাল সরলরেখা অবলম্বন করে সমবেগে চলতে থাকে; (২) বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে; এবং (৩) প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন মাধ্যমে, যেমন গ্যাস, ফ্লুইড, বস্তুর গতির কথাই বিবৃত আছে। গ্যাসকে কতকগুলো স্থিতিস্থাপক অণুর সমষ্টি ধরে নিয়ে তিনি বয়েলের সূত্র প্রমাণ করেন। গ্যাসের ওপর চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরোক্ষ ভাবে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগও নির্ণয় করেন। তবে তাতে কিছু ত্রুটি ছিল; পরে বিজ্ঞানী ল্যাপলাস তা সংশোধন করেন।

আর তৃতীয় খণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে বস্তুর নিম্নমুখী গতি, গ্রহ-উপগ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরা, এমন কি জোয়ার ভাঁটার কারণও যে মাধ্যাকর্ষণ বল তা তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন। ফলে বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে রহস্য বা কু-সংস্কার মানুষের মন থেকে দূরীভূত হয়। জগত এখন বিশ্বের গঠনের প্রকৃত রহস্যের সারমর্ম উপলব্ধি করে। তাদের কাছে নিখিল বিশ্ব একটা ঘড়ি বা যন্ত্রের মত, যার প্রত্যেকটা অংশ একটা নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়মে চলাফেরা করছে।

"প্রিন্সিপিয়া" প্রকাশনার অল্প কিছুকাল পরেই ৬৮৯ সালে কেম্ব্রিজের হয়ে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৭০১ সালে যখন তিনি

ইংল্যাণ্ডের ট্যাকশালের প্রধান পদে নিযুক্ত হন তখন কেম্ব্রিজের পদে ইস্তফা দেন। ১৭০৩ সালে নিউটন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৭০৫ সালে কুইন এ্যান তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তখন থেকে নিউটন বিশ্ব ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে না গিয়ে, রাজনৈতিক পদোন্নতি ও সামাজিক সম্মানের দিকে তাঁর অমূল্য সময় ও শক্তি ব্যয় করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর কাজের সমালোচনাকারী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি ছোটখাটো কলহেও মাঝে মধ্যে লিপ্ত হতেন। লণ্ডনে তাঁর পরবর্তী জীবনে, যখন তিনি বিখ্যাত ও আর্থিক দিক দিয়ে প্রচুর বিত্তবান, তখন প্রিন্সিপিয়ার একটা দ্বিতীয় সংস্করণও প্রস্তুত করেন। এই সময়ে মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে পাঠান দু একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এদের মধ্যে কিছু কিছুর সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যাশ্চর্য ভাবে আধুনিক। যেমনঃ কণা থেকে বিকিরণে এবং বিকিরণ থেকে কণায় রূপান্তর, তাপ-গতি-বিদ্যার প্রাথমিক ধারণা।

নিউটনের এই দক্ষতার রহস্য কি? সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিভা একটা কারণ ছিল কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর প্রচণ্ড শক্তিশালী মনসংযোগের ক্ষমতাও আর একটা কারণ। তাঁর মনকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা এতই প্রবল যে কথিত আছে "প্রিন্সিপিয়া"র ড্রাফট তৈরির সময়ে তিনি রাত প্রায় দুটো তিনটে অবধি কাজ করতেন; সামান্য খেতেন, আবার কখনও কখনও খেতেই ভুলে যেতেন।

অবশেষে ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ কেনসিংটনে এই মহাবিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বিজ্ঞানে নিউটনের স্থান কোথায়? তাঁর গবেষণার প্রচুর সাফল্য ও বিজ্ঞান জগতে বিরাট অবদানের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে কেউ কেউ তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর আসনে স্থান দেন। যদিও পরে মহামনীষি আইনস্টাইন নিউটনের কিছু কিছু সূত্রের পরিবর্ধন, সংস্করণ ও এমন কি পরিশোধনও করেন তবুও তাঁর সূত্রের মৌলিক তত্ত্বগুলো আজও বিশ্ব ও প্রকৃতির আধুনিক ধারণার ভিত্তিপ্রস্তর। বিখ্যাত কবি আলেকজাণ্ডার পোপ তাঁর সম্বন্ধে বলেনঃ

"Nature and Nature's laws lay hid in night :
God said, 'Let Newton be!' and all was light."

............ক্যারোলাস (কার্ল) লিন্নীয়াস (কার্ল ভন্ লিন্)...... ...
(খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৭—১৭৭৮)

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে উদ্ভিদ জগতের মত নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব জগৎ আর দ্বিতীয়টি নেই ; কারণ কোন উদ্ভিদবিদের মতবাদ জনমানবে খুব একটা, বলতে গেলে কিছুই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফুলের বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে মতামত প্রকাশের জন্য একজন উদ্ভিদবিদকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড জনসমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি তিনি যখন বলেন যে গাছেরও জীবদের মত যৌন পার্থক্য আছে, তখন তাঁকে একজন অধঃপতিত এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

উদ্ভিদ জগতের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তনকারী স্বনামধন্য এই বিজ্ঞানী, কার্ল লিন্নীয়াস ১৭০৭ সালে সুইডেনের স্মল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই উদ্ভিদ জগতের প্রতি তাঁর একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ দেখা যায়। এমন কি তাঁর সমবয়সী অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো ; তখন তিনি প্রতিবেশীর বাগানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতেন এবং খুব তীক্ষ্ম নজরে গাছ-পালাগুলোকে লক্ষ্য করতেন।

তাঁর গরীব যাজকবাবা কার্লের এই শখকে আদৌও পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদ্ভিদবিদ্ তাঁর এই সমস্ত ব্যাপারে মুগ্ধ হন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। ১৭৩২ সালে উদ্ভিদ জগতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সুইডেনের একেবারে উত্তর প্রান্তের রাজ্য ল্যাপল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেন। এটাই, "বিজ্ঞানের ইতিহাসে সত্যিকারের প্রথম উদ্ভিদ জগতে ভ্রমণ" হিসেবে চিহ্নিত হয়। যাবারকালে কার্ল একটা ঘোড়া এবং কতকগুলি যন্ত্র, যেমন : টেলিস্কোপ, পরিমাপ দণ্ড, ছুরি, শিকারের বন্দুক, ডায়েরী কলমদানী, দোয়াত, মাইক্রো-স্কোপ; গাছ শুকানোর জন্য কাগজ এবং তারের একটা পোকামাকড় ধরার জাল নিয়ে যাত্রা করেন। ল্যাপল্যাণ্ডে তিনি শত শত মাইল ভ্রমণ করেন, সুমেরু প্রদেশের নানাধরণের ফুল, গাছ, পতঙ্গ তা ও জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ করেন, এবং প্রায় একশোরও বেশী নতুন নতুন প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করে আনেন। তার এই ভ্রমণে দেশের বন্য সম্পদের প্রতি তিনিই এতই মুগ্ধ হন যে, ফেরার পথে তদানীন্তন সরকারকে বন্য সংরক্ষনের পরিকল্পনার একটা প্রস্তাবও দেন। এইরকম পরিকল্পনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সত্যিই বিস্ময়কর।

ভ্রমণ শেষে তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন। এরপর কার্ল সারা লিসা মরিয়াস নামে এক ডাক্তারের মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু কার্লের প্রেমিকা সারার বাবা ভীষণ বাস্তববাদী ছিলেন এবং একজন উদ্ভিদবিদকে জামাতা করতে রাজী হলেন না। ফলে কার্লের সঙ্গে একটা চুক্তি হল এই যে, কার্ল তিন বছরের জন্য ডাক্তারী পড়তে হল্যাণ্ডে যাবে এবং কার্ল যতদিন না ডাক্তারী পড়া শেষ করে ততদিন পর্যন্ত সারা লিসা কার্লের জন্য অপেক্ষা করবে। ফলে শখের উদ্ভিদবিদ্ কার্ল তাঁর বইপত্র ও মানবশিশুটি নিয়ে হল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করল। সেখানে তিনি ডাক্তারী শাস্ত্রও অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হল্যাণ্ডের উদ্ভিদ জগতের পর্যবেক্ষণও করতে লাগলেন।

এই সময় উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের জন্য যৌন-পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, ফুলের গর্ভকেশরে গর্ভাশয়ের মত জায়গায় একটা বীজকোষ থাকে। ঐ জায়গায়ই পরাগিত বীজ থাকে। পরাগিত বীজ পরাগের মাধ্যমেই আসে এবং পরাগ ফুলের পুংকেশর থেকেই ঝরে পড়ে। তবে কার্লের উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতি কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাকৃত উদ্ভিদের যৌন পার্থক্যের চেয়েও বেশী মূল্যবান।

তাঁর পূর্বে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করা হোত নিম্নলিখিত কারণের যে কোন একটার ওপর ভিত্তি করে: (১) পাতাবহুল বা কাঁটাবহুল; (২) বর্ণমালা অনুযায়ী; (৩) গুরুত্ব অনুযায়ী; এবং (৪) মানুষের দেহের ওপর তাদের ক্রিয়া অনুযায়ী। কিন্তু কার্ল ১৭৫৩ সালে দুই খণ্ডে বিভক্ত "স্পেসিস প্লাণ্টারাম" বইয়ের মাধ্যমে তাঁর নতুন শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি উদ্ভিদের পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংখ্যা ও অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ:

১টা পুংকেশর	১টা গর্ভকেশর	ক্যানা
	২টা গর্ভকেশর	লিলাক, ভারবেনা
২টা পুংকেশর	২টা গর্ভকেশর	সুইট ভার্নাল গ্রাস (মিষ্টি বসন্তকালীন ঘাস)
	৩টা গর্ভকেশর	পিপার
৩টা পুংকেশর	১টা গর্ভকেশর	আইরিশ, ক্রোকাস
	২টা গর্ভকেশর	সকল গ্রাসই (ঘাস)
	৩টা গর্ভকেশর	সী-গ্রাস, কার্পেট উইড
৪টা পুংকেশর	১টা গর্ভকেশর	উডরাফ
	২টা গর্ভকেশর	ফরগেট-মী-নট
৫টা পুংকেশর	২টা গর্ভকেশর	জেনশিয়ান
	৩টা গর্ভকেশর	এল্ডারবেরী

যদিও তাঁর এই বিভাগ-পদ্ধতির প্রচণ্ড প্রতিবাদ হয় তবুও খুব তাড়াতাড়িই এটা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়। ফলে উদ্ভিদ-জগতের একটা সুষ্ঠু রূপ পাওয়া যায়।

ডাক্তারী ডিগ্রী পাবার পর কার্ল সুইডেনে ফিরে আসেন এবং সারা লিসাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি সাফল্যের সঙ্গে ডাক্তারী প্র্যাকটিশও করতে লাগলেন এবং রানীর ডাক্তারদের মধ্যে একজন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর মন সর্বক্ষণ থাকত উদ্ভিদ জগতে। এরই মধ্যে তাঁর উদ্ভিদবিদ্ হিসেবে সুনাম দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে তাঁর বাগানের জন্য গাছ পাঠাতে লাগলেন। কার্লের এই বাগানই পরে ইউরোপের দর্শনীয় স্থান হয়ে দাঁড়ায় এবং আজও কার্লের স্মরণে তা সুইডেন সরকার সযত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু কার্লের নানান উদ্ভিদ প্রজাতির যে বিশাল সংগ্রহ তা একজন ইংরেজ কিনে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যান এবং কার্লের মৃত্যুর পর তা লিননেয়ীআন সোসাইটির প্রদর্শন হয়ে দাঁড়ায়।

কার্লের আগে উদ্ভিদের আদর্শ কোন নামকরণ পদ্ধতি না থাকাতে অনেক প্রজাতিকে বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন নামকরণ করে ব্যবহার করত। তিনিই প্রথম নামকরণের দ্বিপদ পদ্ধতির প্রচলন করেন। প্রত্যেক গাছকে দুটো নাম দেন—একটা বর্গনাম ল্যাটিন ভাষায় বিশেষ্য হিসেবে আর একটা প্রজাতি নাম ল্যাটিন ভাষায় বিশেষণ হিসেবে। যেমনঃ প্রত্যেক গোলাপ গাছের নামের শুরু "রোসা" দিয়ে, কিন্তু বিশেষ গোলাপ গাছের জন্য বিশেষ নাম, যেমন "রোসা গ্যালিকা", "রোসা ওডোরাটা"। প্রথাগত ভাবে তাঁর প্রচলিত নামকরণের পরে তাঁর নামের প্রথম অক্ষর 'এল' উদ্ভিদের যে কোন প্রজাতির নামের পরে বসান হয়। যেমনঃ "বিটা ভালগারিস এল" (সাধারণ বীট) অথবা "ব্রাসিকা রাপা এল" (টারনিপ) ইত্যাদি।

তাঁর এই সাফল্য তাঁকে প্রভূত সম্মান প্রদান করে। ১৭৬১ সালে তাঁকে উচ্চ খেতাবে ভূষিত করা হয়, তাঁর নতুন নামকরণ হয় কার্ল ভন লিনী। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গা থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়তে আসত এবং স্বদেশে ফিরে কার্লের পদ্ধতি তাদের দেশবাসীকে অবগত করাত। স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই পদ্ধতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর লেখা প্রথম বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চৌদ্দ, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দশ বছর আগে প্রকাশিত বারোতম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই হাজার। কিন্তু তবুও তাঁর পদ্ধতিতে অনেক ভুল ছিল, যেটা পরে ডারউইন আরো মার্জিত করেন।

উদ্ভিদ জগৎ ছাড়াও তিনি মানব জাতির সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন।

যেটা পরে ডারউইন তার একটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্মত রূপ দেন। কার্লের মতে মানবজাতি উল্লুক, লেমুরের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে একই গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি এইসব ঋজু স্তন্যপায়ীদের নাম দেন "প্রাইমেটস" (মুখ্য)। তবে যেহেতু তিনি বিখ্যাত ছিলেন, সেজন্য তাঁর মানবজাতি সম্বন্ধে এই সমস্ত মতবাদের জন্য তাঁকে খুব একটা দুর্দশারও সম্মুখীন হতে হয়নি বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোক হিসেবেও চিহ্নিত হতে হয়নি। তবে তাঁকে কিন্তু প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। বিশিষ্ট ফরাসী প্রকৃতিবাদী বাফন তাঁকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি "মানব জাতির পক্ষে অপমানকর তত্ত্ব।"

অবশেষে উদ্ভিদ জগতের এই বিপ্লব সৃষ্টিকারী বিজ্ঞানী ১৭৭৮ সালে পরলোক গমন করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁকে গোঁড়া পিউরিটানীয় নীতি-বাদীদের অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হয়। তবু আজও প্রায় দুশো বছর পর তাঁর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রতি অবদানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ল্যাজারো স্প্যালানজানি

(খৃষ্টাব্দ ১৭২৯—১৭৯৯)

স্প্যালানজানিকে বলা হয় জীববিদদের জীববিদ্। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি জীববিজ্ঞানের অনেক মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন যা স্মরণে আজকের আধুনিক জীববিদ্‌দেরও মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তাঁর প্রতিভা হয়তো তাঁকে একজন উল্লেখযোগ্য ক্লাসিকাল স্কলার বা একজন বিচক্ষণ আইনবিদ্ অথবা একজন অনুরক্ত যাজকেও পরিণত করতে পারত। কারণ চঞ্চল যৌবনে এগুলোর প্রত্যেকটার প্রতিই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর এক বিচক্ষণ আত্মীয়া লরা বাসীর পরামর্শে তিনি একজন বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন এবং জীববিদ্ রূপেই তাঁর প্রায় সারা জীবন পরম শান্তিতে অতিবাহিত করেন।

উত্তর ইটালীর মোদেনা রাজ্যের একটা ছোট্ট শহর স্ক্যান্ডিয়ানোতে ১৭২৯ সালে ল্যাজারো স্প্যালানজানি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একজন আইনবিদ্ হওয়াতে, তাঁর প্রথম ছেলে বাবার নির্দেশিত পথে আইনবিদ্ হোক, এটাই চান। সেজন্য স্থানীয় রেজিও কলেজ থেকে তিনি ক্লাসিক্যাল শিক্ষা লাভ করেন।

এখানে তাঁর প্রতিভায় শিক্ষকেরা এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে পাশ করার পর তিনি রেজিও কলেজেই দর্শন এবং গ্রীক পড়ানোর জন্য শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তাঁর জীবনে পূর্বের এই প্রতিভা, ভবিষ্যতে তাঁর বিজ্ঞানী হওয়ার কোন স্বাক্ষরই বহন করে না।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর যাজকগিরি করার ভগবান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেজন্য বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁকে গীর্জার সব-সময়ের কাজে নিযুক্ত না করে ছোটো খাটো কাজে নিযুক্ত করা হয়; যদিও পরে তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁকে তদানীন্তন ফরাসী যাজকদের সম্মান সূচক পদবী 'অ্যাবে' প্রদান করা হয়। এতে মনের শান্তি না পেয়ে তিনি সেমিনারী (ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষাকেন্দ্র) পরিত্যাগ করেন এবং রেজিও কলেজে গ্রীক ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী মন অতীতের ধ্যানে, অপ্রচলিত ভাষার শিক্ষাদানে সন্তুষ্টি পেল না। ফলে অবসর সময়ে তিনি প্রকৃতির অনুসন্ধানে বেশী ব্যাপক ভাবে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখলেন।

এই সময়ই তিনি তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, বারোটি ছেলেমেয়ের মা, প্রাচীন বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংক ও পদার্থ বিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপিকা, লরা বাসীর সংস্পর্শে আসেন। লরা বাসীরই অনুভূতিশীল পরিচালনায় তাঁর বিভ্রান্ত যৌবন-হৃদয় স্থিতি লাভ করে এবং তিনি বিজ্ঞানী হবার জন্য মনস্থির করেন।

একত্রিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর স্বদেশে মোদেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তাঁর মতবাদ তাঁর নানান ছাত্রের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক রূপে তাঁর সাফল্যের কথা শুনে সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসা ব্যক্তিগত ভাবে পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১৭৬৮ সালে তিনি সম্রাজ্ঞীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও দীর্ঘদিন পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পদে বহাল থাকেন।

স্প্যালানজানি জীববিজ্ঞানের এক বিশাল ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর বিশাল গবেষণা ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল; জীবনের মূল উৎস, বংশজনন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনরুৎপাদন, পাচন ক্রিয়া, পরিবহন ক্রিয়া ও শ্বসন ক্রিয়া। যদিও তাঁর পরীক্ষাগুলো বেশীর ভাগই অসাফল্য বহন করে, তবুও তাঁর পদ্ধতিগুলো উত্তরসূরীদের তাঁরই গবেষণাকৃত বিষয়বস্তুর সাফল্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট তাৎপর্য্য বহন করে।

আজকের বিজ্ঞানেও অনাবিষ্কৃত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনরুৎপাদনের সম্বন্ধেও

তিনি গবেষণা করেন। একটা বাড়ন্ত গোসাপের নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদিত হয়, কিন্তু একটা মানুষ বা কুকুরের বেলায় তা হয় না কেন? স্তন্যপায়ী জীবদের বেলায় পুনরুৎপাদন শুধুমাত্র কোষ-কলা মেরামত বা ক্ষতস্থান আরোগ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কেন? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ১৭৬৮ সালে তিনি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। একটা পরীক্ষায় তিনি এক তরুণ সরীসৃপের লেজ এবং পা কেটে ফেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তা পুনরুৎপাদিত হয়। তিনি এরকম একবার নয়, তিন মাসের মধ্যে বার পাঁচেক করেন এবং সবিস্ময়ে দেখেন যে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অর্থাৎ অঙ্গগুলো আবার পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, কিভাবে বাড়ন্ত সরীসৃপের শরীরে ভ্রূণগত বিকাশের মতই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পুনরুৎপাদিত হয়? কোন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়? এই ধরণের পরীক্ষা তিনি ব্যাঙের ওপরও করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাঙাচি তা পুনরুৎপাদন করতে পারে কিন্তু একটা পূর্ণ ব্যাঙের সে ক্ষমতা নেই। ব্যাঙের জীবন চক্রকালে পুনরুৎপাদন ক্ষমতার নষ্ট হয়ে যাওয়া কি ব্যাঙাচি যে জলে বাস করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? কিন্তু যখন দেখেন যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা সরীসৃপকে জলের বাইরে আনলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনরুৎপাদন হয়, তখন তিনি তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। ব্যাঙাচীর মধ্যে কি এমন গঠনের 'অবিন্যাস' থাকে যা পরবর্তী রূপান্তরে লোপ পেয়ে যায়? পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা কি পূর্ণ ব্যাঙ, এমন কি স্তন্যপায়ী প্রাণী, তার মধ্যে মানুষও আছে, ইত্যাদির মধ্যে স্থাপন করার সম্ভাবনা আছে? যদিও এ সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেন না তবুও জীব বিজ্ঞানের নতুন একটা শাখার তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আজকের জীববিদগণ এখনও তাঁর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন।

স্প্যালানজানি তাঁর জীবকোষের জটিল ফিসিকো কেমিক্যাল জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করতেন যে জীবদেহের স্বতঃস্ফূর্ত বংশজনন সম্ভব নয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় জড় পদার্থ থেকে জীবদেহের সৃষ্টি হয়। কারণ দেখা যেত যে জীবজন্তুর শবদেহ রোদ্রে পচন ধরলেই ঝাঁক ঝাঁক জীবাণু আপনা আপনিই তা থেকে জন্মায়। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন বেলজিয়ান রসায়নবিদ্ ইঁদুর তৈরি করার তাঁর এক নিজস্ব প্রস্তুত প্রণালী নির্দেশ করেন। তিনি একটা মাটির পাত্রে খাবার রেখে তার মুখ লিনেন কাপড় দিয়ে ভাল করে বেঁধে দেন এবং পাত্রটাকে একটা ভূ-গর্ভস্থ ঘরের এক কোণে রেখে দেন। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা যায় যে তার মধ্যে ইঁদুর

তৈরি হয়েছে। অবশ্য ১৬৬৮ সালে ফ্রানসেসকো রেডি এই স্বতঃস্ফূর্ত বংশজননের মতবাদকে ভুল বলে প্রমাণিত করেন। কিন্তু ১৬৬৩ সালে লিউয়েন হকের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কারের ফলে আবার অজীবজনি থিওরী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এবারের মতবাদ—আনুবীক্ষণিক জীব আপনা আপনিই বিভিন্ন জৈব মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। ১৭৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডে বহিস্কৃত হয়ে আসা জে. টি. নীডহ্যাম নামে একজন আইরিশ যাজক এই মতবাদের স্বপক্ষে একটি পরীক্ষা করেন। তিনি মাংসের ঝোলকে গরম করে কাচের শিশিতে বন্ধ করে রেখে দেন। কিছুদিন পরেই তার মধ্যে আনুবীক্ষণিক জীবের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এই সমস্ত জীব আপনা আপনিই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু স্প্যালানজানি নীডহ্যামের মতের যথার্থতা সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করেন। সেজন্য তিনি নীডহ্যামের পরীক্ষাটা আবার করেন এবং দেখান যে বন্ধ শিশিতে পোরার আগে মাংসের ঝোলকে সযত্নে গরম করার ফলে সেটা নিশ্চিত ভাবে নির্বীজিত হয়ে গেছে। তখন নীডহ্যাম বলে যে অতিরিক্ত গরম করার ফলে মাংসের ঝোলের মধ্যে জীবনের প্রয়োজনীয় "ভেজিটেটিভ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এরপরেও স্প্যালানজানি শিশিগুলোর সীল ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার মধ্যে আনুবীক্ষণিক জীবের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। জীবের এই স্বয়ম্ভবন মতবাদ নিয়ে বিতর্ক অক্সিজেন আবিষ্কারের পরও চলতে লাগল। এই মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা দাবী করল যে, স্প্যালানজানির বন্ধ শিশিতে বায়ু না থাকার জন্য জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমস্ত বিতর্কের সমাধান হয় তারও একশো বছর পর, যখন লুই পাস্তুর তাঁর বিখ্যাত "হাঁসের গলা" ফ্লাস্ক পরীক্ষাটি করেন। পাস্তুর প্রমাণ করেন যে নীডহ্যামের "ভেজিটেটিভ শক্তি" সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সুতরাং স্প্যালানজানিকে তাঁর গবেষণার তাৎপর্যের জন্যই পাস্তুরের সঠিক পূর্বসূরী বলে উল্লেখ করা যায়।

লালা ও পাচক রসে পাচক পরিবর্ধক এনজাইম আবিষ্কারের অর্ধশত বছর আগেই স্প্যালানজানি প্রমাণ করেন যে, পরিপাক ক্রিয়া যদিও যান্ত্রিক ক্রিয়া তবে বেশীরকম ভাবে তা রাসায়নিক ক্রিয়া, তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে, রুটি চিবানোর কিছুক্ষণ বাদেই তা মুখে খুব মিষ্টি লাগে। তিনি পরিপাক ক্রিয়ায় পাচক রসের ভূমিকা নির্ধারণে একটা পরীক্ষাও করেন ঃ এক টুকরো মাংসকে তারের জালের একটা ছোট্ট খাঁচার মধ্যে রাখেন এবং সুতো দিয়ে বেঁধে তা গিলে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে খাঁচাটাকে বাইরে বের করে এনে দেখেন মাংসের টুকরোটা দ্রবীভূত হয়ে গেছে এবং খাঁচার মধ্যে লেগে থাকা পাকস্থলী নিঃসৃত পাচক রস দেহের বাহিরেও মাংস পরিপাক করতে ব্যবহৃত করা যায়। এইভাবে স্প্যালানজানি

১৮০৬ সালে থিয়োডরের পেপসিন আবিস্কারেও এক বিরাট অবদান রেখে যান।

১৭৮৫ সালে স্প্যালানজানি "এক্সপেরিমেণ্টস আপ অন দি জেনারেশান অফ অ্যানিম্যালস এণ্ড প্ল্যাণ্টস" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইতে জীব বংশজননের ওপর অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষার বর্ণনা আছে। হার্ভের মতে স্তন্যপায়ী জীবের ডিম্ব বিকাশে বীর্যপ্রদত্ত বাষ্পের এক বিরাট ভূমিকা আছে। স্প্যালানজানি ব্যাঙের ওপর তাঁর নিজস্বকৃত পরীক্ষার ভিত্তিতে বর্ণনা করেন যে, বীর্যপ্রদত্ত বাষ্প ডিম্ব বীজকরণে অসমর্থ। কিন্তু ওই একই বীর্য্য যদি ডিম্বের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হয় তাহলেই ভ্রূণ তৈরি হয়। যদিও তিনি যথার্থ কারণেই আবিস্কারে সমর্থ হন, তবুও তিনি বীর্য্যের মধ্যে অবস্থিত শুক্রকীটের অস্তিত নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন। যা পরে ১৮৫৪ সালে জর্জ নিউপোর্ট আবিস্কার করেন।

তিনি বংশজননের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা শুধুমাত্র উভচরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি জন্তুদের নিয়েও পরীক্ষা করেন। একবার এক তরুণী স্প্যানিয়েল কুকুরীকে তিনি আলাদা করে একটা বন্ধ ঘরে রেখে দেন। তারপর একটা স্বাস্থ্যবান পুরুষ কুকুরের বীর্য্য ঐ কুকুরীর ঋতু চক্রের সঠিক সময়ে তার শরীরের জরায়ু পথে সিরিঞ্জ দিয়ে প্রবেশ করান। ঠিক সময়েই কুকুরীটা গর্ভবতী হয় এবং বাষট্টি দিন পরে তিনটি কুকুর বাচ্চা প্রসব করে। এই পরীক্ষার সাফল্যে তিনি খুশী হয়ে বলেন: "এই পরীক্ষার সাফল্য আমাকে আমার অন্যান্য পরীক্ষার থেকে সবচেয়ে বেশী খুশী করে।" আজকে পশু-সম্পত্তির উন্নতির জন্য কৃত্রিম প্রজননের জন্য তাঁর এই অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও তিনি বাদুড়ের রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা নিয়েও পরীক্ষা করেন এবং প্রমাণ করেন যে কানের বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করেই বাদুড় রাতের কালো অন্ধকারে সমস্ত বিঘ্ন কাটিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করে। কিন্তু কানের বিশেষ ক্ষমতা নির্ধারণ করতে পারেন না। পরে ১৯২০ সালে এক ইংরেজ শরীরতত্ত্ববিদ্ নির্ধারণ করেন যে বাদুড় চলাকালে এক ধরণের শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তার প্রতিধ্বনি কান দিয়ে শুনে ঠিক করে যে সামনে কোন বাধা আছে কিনা। আজকাল এই শব্দোত্তর তরঙ্গ বহুল ব্যবহৃত হয়, যেমন সমুদ্রের গভীরতা নির্ধারণে। সুতরাং স্প্যালানজানির বাদুড়ের ওপর পর্যবেক্ষণের ফলেই আজ তা সম্ভব হয়েছে।

অবশেষে জগতের বিজ্ঞান জগতকে এক গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন করে ১৭৯৯ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইউরোপের সমস্ত দেশের জ্ঞানপীঠেই

তাঁকে সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করা হয়। তাঁর সমসাময়িক ফরাসী জীবিবিদ চার্লস বনেট এক জায়গায় লেখেন : বিজ্ঞানের সমস্ত অ্যাকাডেমীগুলো অর্ধ শতকে যা করেছে তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু স্প্যালাইজানি মাত্র কয়েক বছরে আবিষ্কার করেছেন।" চার্লসের এই মত অনেক বিজ্ঞানীই নির্দিধায় মেনে নেন।

হেনরী ক্যাভেণ্ডিস

(খৃষ্টাব্দ ১৭৩১—১৮১০)

লণ্ডনের সৌখীন টাউন হাউসের পেছনের দরজাটা আস্তে খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্ত্তি। পরণে বিশ বছর আগেকার প্রচলিত পোশাক। বেরিয়ে এসে লুকিয়ে একবার রাস্তার এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিলেন। আশেপাশে কেউ নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে রাস্তায় সন্ধ্যার অন্ধকারে পা বাড়ালেন। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার এক প্রান্ত থেকে এক চার চাকাওয়ালা গাড়ী শব্দ করে তাঁর সামনে হাজির হলো। আরোহী মহিলা দুজন পোষাকাবৃত ছায়ামূর্ত্তিকে দেখে ফেলল এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলল : "শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ক্যাভেণ্ডিস"। কথা শুনে তিনি এক মুহূর্ত্ত তাকালেন। তারপর তাঁর গ্রেট কোটের ভেতর মুখ লুকিয়ে তীরবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করেন। ইনি কে চোর? না গোয়েন্দা? না খুনী? না, এদের মধ্যে কোনটাই নন। তাহলে কি ইনি সান্ধ্য ভ্রমণে নির্গত কোন অসাধারণ প্রতিভাধর? ঠিক তাই; ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেণ্ডিস।

ক্যাভেণ্ডিস একজন আশ্চর্য স্বভাবের লোক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের সর্বাধিক শেয়ারের অধিকারী হয়েও তিনি কয়েক পাউণ্ডের মধ্যেই মিতব্যয়ীর মত সপ্তাহ চালাতেন। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য সবাই তাঁর সান্নিধ্য চাইত; কিন্তু তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। তাঁর বিখ্যাত প্রতিভা, অভিজাত বংশ-মর্যাদা, প্রভূত সম্পত্তির জন্য বিবাহযোগ্য পাত্র হিসেবে তাঁর প্রচণ্ড চাহিদা ছিল কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস মেয়েদের দেখলেই কিরকম শারীরিক অসুস্থতা বোধ করতেন।

এই হেনরী ক্যাভেণ্ডিস ১৭৩১ সালে নাইস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম লর্ড চার্লস ক্যাভেণ্ডিস। তাঁর পূর্বপুরুষরা অনেকেই বিখ্যাত

ছিলেন। যেমন, তৃতীয় এডোয়ার্ডের লর্ড চিফ জাস্টিস স্যার জন ক্যাভেণ্ডিস, টমাস ক্যাভেণ্ডিস যিনি দ্বিতীয় ইংরেজ হিসেবে পৃথিবীকে জলপথে প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর পিতামহও ছিলেন একজন ডিউক। তাঁর মায়ের নাম লেডী অ্যান। তাঁর দু বছর বয়সকালে লেডী অ্যান মারা যান। যদিও খুঁটিনাটি জানা যায় না, তবুও এটুকু জানা যায় যে তিনি বোর্ডিং স্কুলের পর কেম্ব্রিজে ভর্তি হন। কিন্তু কেম্ব্রিজে পাঠ্য সূচীর ধর্মীয় মতবাদের অংশ গ্রহণে অস্বীকার করে তিনি কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করেন এবং প্যারিসে চলে যান। তারপর প্যারিসের শিক্ষা সমাপ্ত করে আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন। লণ্ডনে বাবার সঙ্গে সখের বিজ্ঞানী হিসেবে রয়্যাল সোসাইটির অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দর্শন করেন। এই সমস্ত পরীক্ষা তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য তাঁর বাবা বাড়ীতেই একটা গবেষণাগার নির্মাণ করান এবং সেখানেই হেনরী তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় রাত-দিন নিমগ্ন হয়ে থাকতেন।

সে সময় "ফ্লোজিস্টন থিওরী" বহুল প্রচলিত। এই থিওরী অনুযায়ী ফ্লোজিস্টন নামে একটা দাহ্য পদার্থ প্রত্যেক দহনশীল বস্তুতেই উপস্থিত থাকে এবং ফ্লোজিস্টন নিঃশেষ হয়ে গেলে দহনক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য ক্যাভেণ্ডিস এই রহস্যময় ফ্লোজিস্টন আবিষ্কারের চেষ্টায় রত হলেন। অবশেষে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সঙ্গে টিন বা লোহা বা দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সংমিশ্রণ করে এক গ্যাস তৈরি করতে সমর্থ হলেন। এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্কা এবং নীল শিখার সঙ্গে জ্বলে। তিনি এর নাম দেন ফ্লোজিস্টন এবং ১৭৬ সালে তাঁর এই আবিষ্কারের কথা রয়্যাল সোসাইটিকে জানান।

লোকে পরে এই গ্যাসের বায়ুর চেয়ে হাল্কা হওয়ার ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হয় এবং নানারকম মজার মজার খেলায় ব্যবহার করতে থাকে। যেমনঃ কোন পার্টিতে অতিথিদের মুগ্ধ করবার জন্য কাগজের বাক্স গ্যাস ভর্তি করে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হোত ; সার্কাসে লোকেরা মুখ ভর্তি করে গ্যাস নিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার সামনে ফুঁ দিত এবং গ্যাস নীল শিখার সঙ্গে জ্বলন্ত দেখে মনে হোত যেন মুখ থেকে নীল আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। যদিও এ সমস্ত ঘটনায় ক্যাভেণ্ডিস বিস্মিত হতেন না। তবে একটা ব্যাপারে তিনি খুব অবাক হয়ে যেতেন যে এই গ্যাস জ্বলা শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট হিসেবে কিছু জলকণা পাওয়া যায়। তিনি এর কারণ নির্ধারণের জন্য বায়ু এবং এই গ্যাসের মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ চালনা করেন ; দেখা যায় যে এর ফলে জল উৎপন্ন হয়। একবার নয় বারবার পরীক্ষা করে তিনি দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে অবশেষে ১৭৮৪

সালে প্রকাশ করেন যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়। জলের মধ্যে ফ্লোজিস্টন থাকে। দুই আয়তন ফ্লোজিস্টন এবং এক আয়তন ফ্লোজিস্টন বিহীন বায়ুর (অক্সিজেন) সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। পরে ল্যাভসিয়র ক্যাভেণ্ডিসের এই এই ফ্লোজিস্টনের নামকরণ করেন হাইড্রোজেন (গ্রীক ভাষায় অর্থ জল নির্মাতা)।

হাইড্রোজেন সবচেয়ে সরল মৌল। অন্যান্য মৌল বা যৌগের যোজ্যতা, পারমাণবিক ভর ইত্যাদি নির্ধারণে হাইড্রোজেনকে ধরা হয় তাদের মাপকাঠি। সুতরাং হাইড্রোজেন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে ক্যাভেণ্ডিসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অন্যান্য আবিষ্কার না করলেও, হাইড্রোজেন আবিষ্কারার্থ শুধুমাত্র তাঁকে বিখ্যাত করবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস হাইড্রোজেন আবিষ্কার ছাড়াও আরও অনেক কিছু উল্লেখযোগ্য অবদানও বিজ্ঞান জগতে রেখে যান; পৃথিবীর ঘনত্বের সঠিক নির্ধারণ, নাইট্রিক অ্যাসিডের আবিষ্কার, স্থির তড়িত বিজ্ঞানে কিছু কিছু আবিষ্কার ছাড়াও তাপ ও তড়িত বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কিছু মন্তব্য করে যান যা ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হয়।

কিন্তু খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে আরো বেশী মানব সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। বাবা মারা যাবার পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এক বিরাট অংকের অর্থের মালিক হন। এর পর তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ হতেও বেশ কিছু অর্থ পান। ক্রমে ক্রমে জমতে জমতে তাঁর অর্থের পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁর জীবনের গতিপথের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তিনি বোধহয় তাঁর সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিত্তবান ব্যক্তি। ঐতিহাসিকের মতে তিনি "প্রতিভাধরদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তবান এবং বিত্তবানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর ছিলেন।"

ক্রমে ক্রমে তিনি লোকজগত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন নিজেকে। এজন্য তিনি বাড়ীর পেছনদিকে একটা সিঁড়ি তৈরি করেন যাতে করে তিনি চাকরবাকরদের অলক্ষ্যতে যাতায়াত করতে পারেন। প্রত্যেক সকালে চাকরেরা এক টুকরো কাগজে তাঁর দৈনিক খাবারের তালিকা পেত। খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে তারা খাবার ঘরে তা রেখে আসত এবং ক্যাভেণ্ডিস নিঃশব্দে খাবার ঘরে প্রবেশ করার আগেই চাকরেরা খাবার ঘর পরিত্যাগ করত। এইভাবে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবশেষে ১৮১০ সালে উনআশী বছর বয়সে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পরে গ্রেট ব্রিটেনে বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগার স্থাপিত হয়। যে অর্থ তিনি নিজ জীবনে ব্যয় করতে

ব্যয় করতে পারেন নি তা পরে অজানাকে জানার জন্য আজকের প্রতিভাধরদের পেছনে ব্যয় করা হয়। এটা নিশ্চিত যে এতে ত'ার মহান আত্মার পূর্ণ সম্মতিই আছে।

............জোসেফ প্রিস্টলি..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৩—১৮০৪)

লণ্ডনের এক ছোট অডিটোরিয়ামে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন সবেমাত্র তাঁর ইলেকট্রিসিটির ওপর বক্তৃতা শেষ করলেন। শ্রোতার দল তাঁকে ঘিরে অভ্যর্থনা ও নানারকম প্রশ্ন করছেন। এমন সময়ে জনতার মধ্যে থেকে কালো পোষাক পরিহিত এক তরুণ যাজক সামনে এগিয়ে এলেন এবং ফ্রাংকলিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "মিঃ ফ্রাংকলিন, আমি আপনার ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলোয় খুব গভীর ভাবে আগ্রহী। এই আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে কিভাবে আমি আরো বেশী জানতে পারব?" যাজকের কৃশ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রাংকলিন তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে যাজক বললেন, "জোসেফ প্রিস্টলি স্যার।" ফ্রাংকলিন করমর্দনের জন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: "খুব ভালো, রেভারেণ্ড প্রিস্টলি। তবে যদি আগামীকাল পর্যন্তও তুমি ইলেকট্রিসিটিতে আগ্রহী থাক তাহলে আমার বাড়ীতেই আমার সঙ্গে দেখা কোর।" যাইহোক পরে ফ্রাংকলিন রেভারেণ্ড প্রিস্টলির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর সাধ্যমত সাহায্য তাঁকে করেন।

লীডসের এই গরীব প্রেসবাইটেরিয়ান যাজক, বিজ্ঞানী প্রিস্টলি চার্চের ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্যে এবং পার্ট-টাইম টিউটরের কাজ করে তাঁর পরিবারের খরচ চালাতেন। তাঁর লেখা প্রথম বই "হিস্টোরী অফ ইলেকট্রিসিটি" তাঁকে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য পদে নির্বাচিত করে।

জোসেফ প্রিস্টলি, ১৭৩৩ সালের ১৩ই মার্চ, ইংল্যাণ্ডের ছোট শহর ফিল্ডহেডে, এক গরীব টেক্সটাইল কর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যুর পরে, তিনি তাঁর এক কাকার কাছে এসে থাকেন। তাঁর এই কাকা ডিসেণ্টার নামে প্রটেস্ট্যাণ্ট এক দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই দলের আদর্শ ছিল "হাই থিংকিং" এবং "প্লেন লিভিং"। সেজন্য এখানে প্রিস্টলি

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত খেলাধুলো না করে বই পড়ে এবং বয়স্কদের ধর্মীয় আলোচনা শুনে সময় কাটাতেন। সাহিত্যে তাঁর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা থাকার দরুণ তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মাণ এমন কি আরবী ভাষাও দুর্দান্ত ভাবে রপ্ত করেন।

১৭৫২ সালে যাজকবৃত্তির জন্য দাভেন্দ্রির ছোট্ট নন-কনফরমিস্ট এ্যাকাডেমীতে ভর্তি হন। সেখানে গ্র্যাজুয়েশানের ওপরে পড়বার খুব কম সুযোগ ছিল। ডিসেন্টারের সমাবেশ খুব অল্প থাকার জন্য ধর্ম প্রচারের কাজ তাঁকেই করতে হয়। বারো বছর ধরে তিনি অল্প অল্প যাজকের কাজ করেন এবং ভাষা ও ইংরাজী ব্যাকরণের ওপর পার্ট-টাইম টিউটরের কাজও করেন। চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি মিল হিল চ্যাপেলের যাজক পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সাক্ষাৎ পান এবং এখান থেকেই তিনি বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন শাস্ত্রের ওপর হিসেবে বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েন।

তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অনেক বই পড়েন এবং গ্যাসের ওপর নানান ধরণের পরীক্ষা করেন। তিনি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2) আবিষ্কার করেন। যদিও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামটি তাঁর দেওয়া নয়। তাঁর এই আবিষ্কারে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির নজরে পড়েন। সাধারণ লবণকে (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ভিট্রিয়লিক অ্যাসিডের (সালফিউরিক অ্যাসিড) সঙ্গে উত্তপ্ত করে তিনি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস আবিষ্কার করেন; যা জলের সঙ্গে মিশে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এছাড়া তিনি হার্টস্হর্ণের (ছয় বছরের বড় পুরুষ হরিণের শিং) মধ্যের পদার্থকে (অ্যামোনিয়া জল) উত্তপ্ত করে এক ধরণের ঝাঁঝাল গ্যাস তৈরি করেন। তিনি এর নাম দেন "ক্ষারকীয় বায়ু", যার আজকের পরিচিতি "অ্যামোনিয়া"। তবে অ্যামোনিয়া (NH_3) বা অন্যান্য জলে দ্রবীভূত গ্যাস আবিষ্কার করার পেছনে প্রিস্টলির নতুন গ্যাস সংগ্রহ পদ্ধতির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নতুন পদ্ধতিতে তিনি গ্যাসকে জলের বদলে পারদ অপসারণ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করেন। এ ছাড়াও তিনি গ্যাস সংগ্রহের জন্য ইলাস্টিক ব্লাডার না ব্যবহার করে কাঁচের ফ্লাস্ক ও জার ব্যবহার করেন।

যদিও লীডসে তিনি গীর্জার দায়িত্ব ও রসায়ন-শাস্ত্রের বিভিন্ন আবিষ্কারের দিকে নিমগ্ন থাকতেন, তবুও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থনে মাঝে মধ্যেই তাঁর লেখনী গর্জে উঠত। এই সময় তিনি আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন করে ব্রিটিশ সরকারের তাদের ওপর ব্যবহারের সমালোচনা করে পামফ্লেট ও নানান ধরণের চিঠিপত্রও লেখেন।

১৭৭২ সালে প্রিস্টলি লীডসের যাজকপদ পরিত্যাগ করেন এবং লর্ড

শেলবার্ণের কাছে তাঁর সাহিত্য সঙ্গী হয়ে গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আট বছর কাটান। সেখানকার সুসজ্জিত যন্ত্রপাতি সম্পন্ন গবেষণাগার পাওয়াতে এবং পরীক্ষার ওপর নিশ্চিন্তে বেশী সময় দেওয়াতে সেই আটটা বছর প্রিস্টলির পক্ষে অর্থাৎ রসায়ন জগতের পক্ষে দারুণ ফলপ্রসূ হয়। এখানেই ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলি তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার—অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। যদিও অক্সিজেন নামটি প্রিস্টলির দেওয়া নয়, তিনি প্রথম নামকরণ করেন। "ডিফ্লোজিস্টিকেটেড এয়ার"। পরে ল্যাভসিয়ার "অক্সিজেন" নামকরণ করেন। প্রিস্টলি পারদের রেড অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে পারদ অপসারণ দ্বারা অক্সিজেন তৈরি করেন। উত্তপ্ত করার জন্য তিনি এক ফুট ব্যাসের একটা উত্তল লেন্সের সাহায্য নেন। লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে তিনি বকযন্ত্রের মধ্যে রেড অক্সাইডকে রেখে উত্তপ্ত করেন।

প্রিস্টলি অক্সিজেন গ্যাসের কিছু কিছু ধর্মও পর্যবেক্ষণ করেন। যেহেতু তিনি "ফ্লোজিস্টন থিওরী"তে বিশ্বাসী ছিলেন, সেজন্য অক্সিজেন বা বায়ুর বিস্তৃত ধর্ম পর্যবেক্ষণ করতে অসমর্থ হন। পরে ল্যাভসিয়ার তা পূরণ করতে সমর্থ হন। তবুও প্রিস্টলি এটুকু পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত "ফ্লোজিস্টিকেটেড বায়ুতে" জ্বলন্ত বস্তু আরো বেশী করে জ্বলে এবং জীবরা ইহা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে আরো বেশী সতেজ হয়।

যাইহোক ১৭৮০ তিনি বার্মিংহামে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি "লুনার সোসাইটির" সদস্য হন। এই সোসাইটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে স্টীম ইঞ্জিনের বিখ্যাত আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াট, চার্লস ডারউইনের পিতামহ এরাসমাস ডারউইন, লেখক ও সুবিদিত রসায়নবিদ্ জেমস কার প্রমুখ এঁরাও ছিলেন। এই সোসাইটির নাম "লুনার সোসাইটি" দেওয়া হয় এই কারণে যে, প্রত্যেক পূর্ণিমায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মিলিত হতেন এবং বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ডিসেন্টার প্রিস্টলি বিপ্লবীদের "স্বাধীনতা, সাম্যতা, সৌভ্রাত্রের" সংগ্রামকে প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করেন। এর ফলে গ্রেট ব্রিটেনের সরকার ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের তাঁর বিরোধী করে তোলেন। যতই ফরাসী বিপ্লব উচ্চ আদর্শ ছেড়ে গিলোটিনের দিকে আরো বেশী করে এগোতে লাগল ততই ব্রিটেনবাসীরা তাদের সমর্থন তুলে নিতে লাগল। ডিসেন্টারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে তারা নাকি ফরাসী বিপ্লবের ধরণে ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত গীর্জা ব্যবস্থাকে তুলে নিতে চায়। ফলে ১৭৯১ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিলের পতনের উৎসবে, এক উত্তেজিত জনতা প্রিস্টলির বাড়ী এবং সংলগ্ন তাঁর

নিজস্ব গীর্জা পুড়িয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরীক্ষার অনেক মূল্যবান নথিপত্রও নষ্ট হয়ে গেল।

ফলে বারসিংহাম ত্যাগ করে তিনি লণ্ডনে এসে থাকতে লাগলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধল। এই অবস্থায় মনের বিরাগবশত অবশেষে ১৭৯৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে বসবাস করতে চলে গেলেন। ফিলাডেলফিয়াতে তাঁর পুরোনো বন্ধু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁকে এক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁকে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করালেন। এ ছাড়াও একেশ্বরবাদী গীর্জার নেতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট পদেও নিযুক্ত হলেন। অবশেষে পেনসিলভানিয়ার নর্দামবারল্যাণ্ডে তিনি তিন ছেলেকে নিয়ে স্থায়ী হলেন। এই সময় তিনি টমাস জেফারসন, জর্জ ওয়াসিংটন এবং আরো অনেক বিশিষ্ট আমেরিকান নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৭৯৭ সালে আমেরিকাকে আরও কিছু আবিষ্কার প্রদান করেন ঃ সাদা উত্তপ্ত চারকোলের (কার্বন) ওপর স্টীম (বাষ্প) চালনা করে কার্বন মনোক্সাইড (CO_2) তৈরি করেন এবং আজকের পরিচিত "লাফিং গ্যাস" অর্থাৎ নাইট্রাস অক্সাইডও (N_2O) আবিষ্কার করেন।

অবশেষে ১৮০৩ সালে এই মহান, স্ব-শিক্ষিত রসায়নবিদের মৃত্যুর পরে তাঁর বাড়ী এবং রসায়নাগার জাতীয় প্রদর্শনশালা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে দর্শনার্থীরা আজও তাঁর ব্যবহৃত বকযন্ত্র, ফ্লাস্ক, জার প্রভৃতি গবেষণার যন্ত্রপাতি দেখতে যান। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে তাঁর আবিষ্কারে বায়ুমণ্ডলের—যে বায়ুমণ্ডলে আমরা বাস করি এবং যার দ্বারা আমরা বেঁচে আছি তার স্বরূপ নির্ধারণে একটা ভিত্তি প্রস্তর।

জেমস ওয়াট

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৬—১৮১৯)

"জেমি, তোমার মত এরকম অদ্ভূত ছেলে আমি কোনদিন দেখিনি। তুমি অন্যান্য ছেলেমেয়ের মত খেলাধুলো কর না কেন? কি সারাদিন উনুনে বসান কেটলির মধ্যে দেখ?"—কথা কটা একজন ছেলেকে তাঁর একজন আত্মীয়া চা খেতে খেতে বললেন। কারণ এই ছেলে সারাদিন কেটলির মধ্যে জল ফোটা তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করে। কি করে কেটলির ঢাকনাটা ওঠে নামে? কি করে তার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে? তখন কি কেউ জানত যে এই ছেলেই ভবিষ্যতে বাষ্পের ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাষ্পীয় যানের আবিষ্কর্তা হিসেবে নিজেকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করবে!

বাষ্প-যানের এই আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াট ১৭৩৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী, স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোর কাছে গ্রীনক গ্রামে, এক দরিদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় ক্ষীণজীবি থাকাতে মার কাছেই তাঁর লেখাপড়ার হাতে-খড়ি হয়। তের-চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু মাঝে মধ্যেই তিনি বিদ্যালয়ে দীর্ঘ কামাই করতেন। তবুও রসায়ন, পদার্থ এবং জ্যামিতি শাস্ত্র তিনি ভাল ভাবেই রপ্ত করেন। তাঁর এই বিদ্যালয়-জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ মায়ের মৃত্যুতে তিনি বাধ্য হয়ে কাজের সন্ধানে বেরোন।

প্রথমে তিনি গ্লাসগোর এক চশমার দোকানে কাজে ঢোকেন। চশমার দোকানী শুধুমাত্র লেন্সই তৈরি করতেন না, বেহালা সারান, মাছ ধরার ছিপ প্রভৃতি নানান বিষয়ে একজন সুদক্ষ কারিগরও ছিলেন। তবুও জেমসের শীঘ্র নানান বিষয়ে আয়ত্তের ক্ষমতা ও সুদক্ষতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এরপর জেমস বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল আয়ত্তের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এক দোকানে শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করেন। তখন যন্ত্র নির্মাতাদের একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ ছিল। তাদের নিয়মে সাত বছর শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করলে তবেই সেই সঙ্ঘের সভ্য হওয়া যায়। তা সত্ত্বেও জেমস এক বছর কাজ করবার পর লণ্ডন ছেড়ে দেন। ফলে যখন জেমস সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন, তখন তারা তাকে সদস্য করতে অস্বীকার করে। তখন তাঁর পরিবারের কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘরে কাজ করার অনুমতি পান, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এই সঙ্ঘের আওতা বহির্ভুক্ত। এখানে তিনি নানান

ধরণের যন্ত্র, এমন কি সঙ্গীতের অনেক যন্ত্র মেরামত ও নির্মাণ করতেন। এই করতে তিনি এই সমস্ত যন্ত্রের মূলনীতি ও কার্যকৌশল খুব ভালভাবে জানতে গিয়ে নানারকম বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেন। যাতে করে এদের উপর লেখা মূল ভাষায় বইগুলো পড়তে পারেন। এই সময়ই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম অরগ্যান বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করেন। এর মধ্যেই তিনি সঙ্গীতের সুর ও স্বর সম্বন্ধে যে কোন সঙ্গীত অধ্যাপকের থেকে বেশী সম্যক জ্ঞান আহরণ করেন। এই কারণে এই স্ব-শিক্ষিত কারিগরের কারখানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির অধ্যাপক এবং প্রতিভাধরদের সমাগম ঘটে। এদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ জন রবিনসন ও জোসেফ ব্ল্যাক।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিশিষ্ট দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জোসেফ ব্ল্যাক, জেমসের দক্ষতায় প্রচণ্ড মুগ্ধ হন এবং তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি নির্মাণের ভার জেমসের ওপর অর্পণ করেন। ফলে জেমসের সঙ্গে ব্ল্যাকের এক ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ব্ল্যাকের তাপ বিজ্ঞানের গবেষণা জেমসের বিখ্যাত বাষ্প-যান আবিষ্কারের পেছনে প্রভূত সাহায্য করে। বাষ্পের এই ক্ষমতার ব্যবহারই তাপ বিজ্ঞানকে গাণিতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করে।

কিন্তু ১৭৬৪ সালে জেমসের কারখানায় মেরামতের জন্য "নিউকোমেন ইঞ্জিন" তাঁর ভবিষ্যত জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এই ইঞ্জিন তখনকার দিনে গ্রেট ব্রিটেনের কয়লা খনি থেকে জল নিকাশের জন্য ব্যবহৃত হোত। এই ইঞ্জিনে বাষ্পের সাহায্যে শূন্যস্থান সৃষ্টি করা হোত এবং সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য বাইরের বায়ুচাপকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন কাজ করত এতে জেমস দেখলেন যে প্রচুর পরিমাণ বাষ্প নষ্ট হয়। সেজন্য এই যন্ত্র মেরামতের আগে বাষ্প নিয়ে নানান ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তাতে তিনি লক্ষ্য করেন যে ২১২° ফারেনহাইট উষ্ণতার এক পাউণ্ড বাষ্প, পাঁচ পাউণ্ড জলকে ৩২° থেকে ২১২° ফা. পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে পারে। জেমস বাষ্পের এই সুপ্ত ক্ষমতা—যার আজকের পরিচিত "বাষ্পের লীন তাপকে"কে কাজে লাগিয়ে "বাষ্প-যান" নির্মাণ করার চিন্তা করেন। এজন্য ১৭৬৫ সালে বাষ্পকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে, প্রায় একমাস ধরে পরিশ্রম করে প্রথম একটা মডেল-ইঞ্জিন তৈরি করেন। ইঞ্জিনটা যদিও কাজ করে, কিন্তু পিস্টন এবং অন্যান্য সংযোগস্থল থেকে বাষ্প বেরিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যেই তিনি দেনায় জড়িয়ে পড়েছেন এবং ইঞ্জিনের আরো অনেক আনুসঙ্গিক খরচের জন্য তাঁকে তাঁর পরিকল্পনা থেকে বিরত হতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় জেমসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিখ্যাত ক্যারন আয়রন ওয়ার্কসের ডঃ জন রোয়েবাক এগিয়ে আসেন। চুক্তি হল যে, রোয়েবাক সমস্ত খরচ বহন

করবেন বদলে লাভের দুই তৃতীয়াংশ তাঁকে দিতে হবে। অবশেষে ১৭৬৯ সালে ব্রিটিশ এবং জগত শিল্পে আলোড়নকারী জেমসের বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়। কিন্তু তবুও দেখা গেল যে অব্যবহারিক বা খাতা কলমের ইঞ্জিনের সঙ্গে বাস্তব ইঞ্জিনের অনেক পার্থক্য থেকে গেছে। জেমস বুঝতে পারলেন যে, এর জন্য দরকার নিখুঁত ভাবে তৈরি সিলিন্ডার, পিস্টন এবং ধাতব অংশ। কিন্তু তখন যন্ত্র বা সুদক্ষ কারিগর দুটোরই অভাব স্কটল্যাণ্ডে। কিন্তু ঠিক এই সময়ই ১৭৭৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহামের কাছে সোহোর জগদ্বিখ্যাত বৃহত্তম লোহার কারখানার মালিক ম্যাথিউ বোল্টন, জন রোয়েবাকের কারখানা কিনে নিলেন।

যেহেতু সোহোতে বোল্টনের অধীনে ইউরোপের সেরা সেরা কারিগররা কাজ করত; ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াটের আদি ইঞ্জিন একটা প্রচণ্ড পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করল। কিছু ছোটখাট উন্নতিবিধানও করা হল। ১৭৮৩ সালের মধ্যেই একমাত্র ওয়াটের কারখানার নিউকোমেন ইঞ্জিন ছাড়া বাকী সমস্ত নিউ-কোমেনের ইঞ্জিনের জায়গা দখল করে নতুন ওয়াটের "বাষ্প-ইঞ্জিন"। ১৮০০ সালে ইঞ্জিনের অধিকার সত্ত্বের মেয়াদ পার হবার আগেই তাঁদের সন্তানদের হাতে এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা অর্পণ করা হয়।

বাষ্প ইঞ্জিন ছাড়াও জেমস ওয়াট আরো নানান আবিষ্কার করেন: ম্যানস-ক্রিপটের জন্য ছাপাখানা, অংকন-মেসিন, গ্রহ ও তারাদের দূরত্ব নির্ধারণের জন্য যন্ত্র ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি স্বাধীনভাবে জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটা যৌগ তাও প্রমাণ করেন। ১৮০০ সালের পরে অবসর জীবনে তিনি বারমিংহামের লুনার সোসাইটির সদস্য হওয়ার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং এই লুনার সোসাইটির শেষ কর্মী হিসেবে ১৮১৯ সালে চুরাশী বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

কার্ল উইলহেলম শীল

(খৃষ্টাব্দ ১৭৪২—১৭৮৬)

১৭৭৪ সালে, ইংরেজ যাজক, শখের রসায়নবিদ্ জোসেফ প্রিস্টলির নাম অক্সিজেন আবিষ্কর্তা হিসেবে সুনিন্দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর এক কি দু বছর আগে একজন সুইডিস বিজ্ঞানী প্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। যদিও তিনি তা তখন প্রকাশ করেন নি। ১৭৭৭ সালে যখন তিনি প্রকাশ করেন তখন ইতিমধ্যেই প্রিস্টলি আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। এরকমই ভাগ্যের ফের বিজ্ঞানী কার্ল উইলহেলম শীলের। তবে যদিও তিনি অক্সিজেন আবিষ্কর্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারেন নি, তাহলেও অ ঠারো শতাব্দীর বিশিষ্ট পরীক্ষা মূলক রসায়নবিদ্ হিসেবে আজও বিজ্ঞান জগতে সমধিক পরিচিত।

১৭৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুইডেনের রাজ্য পোমারানিয়ার অন্তর্গত স্ট্রলসান্তে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে খুব একটা বেশীদূর তিনি লেখাপড়া করতে পারেন নি কারণ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই এক ওষুধ নির্মাতার কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষার্থী জীবনে তিনি প্রচুর কষ্ট করেন। এ সময় তিনি মালিকের বাড়ীতেই থাকতেন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। সারাদিন ধরে যাবতীয় কাজকর্ম, সে ঘর ঝাঁড় থেকে আরম্ভ করে মায় ওষুধের দুর্গন্ধযুক্ত বোতল, জার ইত্যাদি পরিষ্কার করা সবই করতেন। তিনি কিন্তু কোন কষ্টকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না এবং প্রত্যেক জিনিষকেই খুব তীক্ষ্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। ফলে তাঁর মালিকের ঘরে রাখা প্রত্যেকটা রাসায়নিক পদার্থের নাম ও ধর্ম আয়ত্ত করেন। আট বছর শিক্ষার্থী থাকার পর তিনি ওষুধ নির্মাতার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রথমে মালমো, তারপরে স্টকহোম এবং অবশেষে ১৭৭০ সালে আপসালাতে যোগদান করেন।

গবেষণাগারের সীমিত যন্ত্রপাতি এবং খুব কম সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি নিজেকে একজন সুদক্ষ রসায়নবিদ্ হিসেব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৭০ সালে তিনি টারটারিক অ্যাসিড তৈরি করেন। তিনি টারটারিক অ্যাসিডের প্রস্তুত প্রণালী ও ধর্ম, বিশেষ করে উল রং করার কথা, একটা প্রবন্ধে লেখেন। এই টারটারিক অ্যাসিড পরে খাবার সোডা, নানারকম ফেনায়িত পদার্থ এবং অধুনা ছবি তোলার তরল পদার্থেও ব্যবহার করা হয়। ১৭৭৪ সালে তিনি ক্লোরিণ আবিষ্কার করেন। এর কিছু পরেই ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড বিশ্লেষণ করতে করতে ম্যাঙ্গানিজ যে

ধাতু তা প্রমাণ করেন। এই সময় তিনি নানান ম্যাঙ্গানেট আবিষ্কার করেন এবং কাচ রং করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। এ ছাড়াও তিনি লোহা, পারা এবং তামার জারণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এ সম্বন্ধে প্রবন্ধও লেখেন। পরের বছরই আর্সেনিয়াস অ্যাসিড বিশ্লেষণ করতে করতে কপার আর্সেনাইট ও আর্সাইন আবিষ্কার করেন।

১৭৭৫ সালে তাঁর কাজকর্মের সাফল্যের পরিচিতি হিসেবে তিনি "স্টকহোম এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস"র সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এই সময় বার্লিনের ফ্রেডরিক, দি গ্রেট তাঁর সভা-রসায়নবিদ্ হিসেবে শীলকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশভক্তির জন্য শীল তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বদেশ সুইডেনেই থেকে যান। সুইডেনেই কোপিতে একট ছোট ওষুধের দোকান কেনেন। সেই নোংরা, জনবহুল দোকানে তিনি দিনের বেলা ওষুধ বিক্রি করতেন আর সন্ধ্যে এবং রাতে তাঁর প্রিয় রাসায়নিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন।

১৭৭৭ সালে তিনি "কেমিক্যাল ট্রিটাইস অন এয়ার অ্যান্ড ফায়ার" নামে একটা বই প্রকাশ করেন! এর মধ্যে বিগত বছরগুলোয় তাঁর করা গবেষণার সমস্ত বর্ণনা আছে। এর মধ্যে তাঁর অক্সিজেন আবিষ্কারও প্রকাশ পায়। তিনি অক্সিজেনের নামকরণ করেন "ফায়ার-এয়ার"। তবে তিনি অক্সিজেন অন্যান্য পৃথক উপায়ে আবিষ্কার করেন ; যেমন সল্টপিটার (পটাসিয়াম নাইট্রেট), মারকিউরিক অক্সাইড ইত্যাদি উত্তপ্ত করে কিন্তু তিনিও প্রিস্টলির মতোই "ফ্লোজিস্টন থিওরীতে বিশ্বাস করতেন। ফলে তিনিও অক্সিজেনের সঠিক নিরূপণ করতে অসমর্থ হন। এছাড়া তিনি বায়ুর অন্যতম উপাদান হিসেবে নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন। তিনি এর নাম দেন "ফাউল-এয়ার"। তিনি বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের অনুপাত নির্ণয় করেন ৩ঃ১। পরে অবশ্য ক্যাভেন্ডিস আরো বেশী সঠিক বিশ্লেষণ করেন।

অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে তিনি সিলভারের যৌগের ওপর আলোকের প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। ফলস্বরূপ ফটোগ্রাফির ভিত স্থাপিত হয়। শীল দুধ টকে যাওয়ার কারণ হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিডের আবিষ্কার করেন। জৈব রসায়নেও তিনি অনেক কিছু অবদান রেখে যান। তিনি সাইনট্রিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড ও বেনজয়িক অ্যাসিডের ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দেন। গ্লিসারিণ, প্রুসিক অ্যাসিড ও শীলাইট (ক্যালসিয়াম টাঙ্গস্টেট) থেকে টাঙ্গস্টিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন।

কিন্তু বিজ্ঞানে কার্লের গভীর ধ্যানের ফলস্বরূপ তাঁর জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে। কারণ তিনি যে ঘরে রাসায়নিক গবেষণা করতেন, সেটার মধ্যে

দিয়ে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা মোটেই ছিল না বললেই হয়। ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের (যেমন ক্লোরিণ, আরসেনেটস এবং প্রুসিক অ্যাসিড) অনবরত ধোঁয়ায়, গন্ধে, অবশেষে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, ১৭৮৬ সালের ২১শে মে পরলোক গমন করেন। শীল তাঁর কাজের বদলে শুধুমাত্র আবিষ্কারের আনন্দই উপভোগ করতে চান, অন্য কোন পুরস্কারের সন্ধান তিনি করেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখে রেখে গেছেন ঃ "...............to watch new phenomena—this is my desire".

আঠারো শতাব্দীতে সুইডেনে মহান জীববিদ্ লিননেইয়াস, বিখ্যাত রসায়নবিদ্ বার্জেলিয়াস এবং কার্ল শীল জন্মগ্রহণ করেন। যদিও শীল তাঁর প্রাপ্য সমস্ত কৃতিত্ব পান নি, তবুও শীল বিজ্ঞান আকাশে তাঁর দুই স্বদেশবাসীর মতোই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে জ্বল জ্বল করছেন।

..........অ্যান্টনি লরেন্ট ল্যাভসিয়ার..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৩—১৭৯৪)

১৭৮০ সালের ঘটনা। জাঁ পল মারাট নামে এক ব্যক্তি "ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীয়ে ডেস সায়েন্সের" সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু ঐ সংস্থার একজন প্রভাবশালী সদস্য, যিনি কিনা তদানীন্তন কালে ফ্রান্সের একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীও বটে, মারাটের যোগ্যতার বিপক্ষে রায় দেন। ফলে মারাটের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই ঘটনার প্রায় বারো বছর পরে মারাট, তখন ফরাসী বিপ্লবের একজন নেতা এবং এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক; প্রতিশোধস্পৃহা বশতঃ সেই বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, বিজ্ঞানী নাকি বিপ্লবের শত্রু; তিনি নাকি স্বেচ্ছাচারীদের সঙ্গী, অজ্ঞ, হাতুড়ে এক বৈজ্ঞানিক। যদিও এই অভিযোগ অযৌক্তিক, তবুও কেমন করে যেন এটা জনগণের মনে লেগে গেল। ফলে সেই বিজ্ঞানীকে গ্রেপ্তার করা হল এবং বিচারের রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে গিলোটিনে তাঁর শিরশ্ছেদ করার হুকুম দেওয়া হল। তাঁর বন্ধুরা তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য শাস্তি মকুবের আবেদন করেন। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। কথিত আছে এই আবেদনের জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন ঃ "প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের কোন

প্রয়োজন নেই।” ফলে ১৭৯৪ সালে সেই হতভাগ্য মহান বিজ্ঞানী অ্যাণ্টনি লরেণ্ট ল্যাভসিয়ারকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

অ্যাণ্টনি লরেণ্ট ল্যাভসিয়ার প্যারিসে ১৭৪৩ সালে এক বিত্তবান ব্যবসায়ী ও জমি-মালিকের ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তার মা মারা যান। তিনি তখন তাঁর ঠাকুমার বাড়ীতে চলে যান এবং সেখানেই তিনি বড় হন। বাবার নির্দেশে আইন পড়ার জন্য তিনি প্যারিসের মাজারিন কলেজে ভর্তি হন। আইন পড়া সত্বেও, বিজ্ঞান বিশেষ করে রসায়ন শাস্ত্রও তিনি ভালমত আয়ত্ত করেন।

ল্যাভসিয়ারের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য তাঁর দুই অধ্যাপকের প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক তাঁর রসায়ন অধ্যাপক রৌল্লে। রৌল্লে রসায়ন শাস্ত্রের তত্ত্বগুলো পড়াবার সময় হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে সেগুলোর বর্ণনা দিতেন। ফলে ল্যাভসিয়ার তাঁর থেকে এটুকু শিক্ষালাভ করেন যে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির জন্য গবেষণাগারে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, শুধুমাত্র প্রাচীনদের তত্ত্ব মুখস্থ করলেই হবে না। দ্বিতীয়, তাঁর মণিকবিদ্যা ও ভূবিদ্যার অধ্যাপক গুয়েটার্ড। এঁর থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, নির্ভুল পর্যবেক্ষণ এবং যত্নশীল পরীক্ষার মূল্য উপলব্ধি করেন।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি প্যারিসের রাস্তাঘাটের আলোক ব্যবস্থা উন্নত করার পরিকল্পনার জন্য পুরস্কৃত হন। সেই সময়েই তিনি ওসগেস পর্বতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ এবং জিপসাম লবণের গঠনের ওপর রাসায়নিক গবেষণার জন্য “ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমিয়ে ডেস সায়েন্সের” সদস্যপদে মনোনীত হন।

এই সময়ই তিনি জ্যাকুইস পালজের সঙ্গে পরিচিত হন ; জ্যাকুইসের পরামর্শে ল্যাভসিয়ার ট্যাক্স-ফার্মের একটা মেম্বারশিপ ক্রয় করেন। এই ট্যাক্স-ফার্ম কতকগুলো লোককে নিয়ে গঠিত হোত। তারা রাজাকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ প্রদান করত এবং বদলে তারা ট্যাক্স আদায়ের অধিকার অর্জন করত। তাদের বলা হোত ফার্মের জেনারেল। এই জেনারেলদের নিযুক্ত লোকেরা খুব নির্মম ভাবে গরীব, কৃষকদের থেকেও জোর করে ট্যাক্স আদায় করত। কিন্তু ল্যাভসিয়ার কোনরকম লোভের বশবর্তী হয়ে ট্যাক্স-ফার্মের মেম্বারশিপ ক্রয় করেন নি। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাতে কোনরকম অর্থনৈতিক অসুবিধে না হয় তার জন্যই এই মেম্বারশিপ ক্রয় করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে ফরাসী বিপ্লবের তদন্ত কমিশনই এটা তাঁর বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

আঠাশ বছর বয়সে তিনি মঁসিয়ে পালজের সুন্দরী, হাসিখুশী, বুদ্ধিমতী মেয়ে চতুর্দশী মেরী অ্যানের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। মেরী অ্যান, তাঁর

বাড়িতে আসা কিছু বিখ্যাত লোকের যেমন, প্রিস্টলি, ফ্রাংকলিন, ল্যাপলাস প্রভৃতিদের নিজের হাতে অতিথিসেবা করতেন। এছাড়া মেরী তাঁর স্বামীকে ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে সাহায্য করতেন এবং ল্যাভসিয়ারের গবেষণগুলো চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা, সাজান ও লেখার ব্যাপারে সহকারীর কাজও করতেন।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই, ল্যাভসিয়ার অস্ত্রাগারের পরিচালক পদে বহাল হন। এখানেই তিনি উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। গবেষণাগারে অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে সেই সময়কার সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদী তুলাযন্ত্রও ছিল। নতুন গবেষণাগারে উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে অতঃপর তিনি রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় মন দিলেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলগুলো রসায়ন শাস্ত্রকে প্রাচীন কু-সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বের করে আনে এবং তাকে সম্পূর্ণ এক নতুন বিজ্ঞান সম্মত রূপদান করে'

প্রাচীন অ্যালকেমীবিদ্‌দের বিশ্বাস ছিল যে জল প্রথমে মাটিতে পরিবর্তিত হয় এবং ঐ মাটি থেকে পরে সোনায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ল্যাভসিয়ার প্রথম প্রমাণ করেন যে জল সরাসরি সোনা ত দূরের কথা মাটিতেই পরিবর্তিত হয় না।

তাঁর সময়কার অনেক রসায়নবিদ্‌, যেমন রবার্ট বয়েল, বিশ্বাস করতেন যে হীরার একটি রহস্যময় ধর্ম আছে। উচ্চতাপে হীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে হীরা কার্বনেরই এক রূপ। উচ্চতাপে হীরা বায়ুর (অক্সিজেন) সঙ্গে বিক্রিয়া করে "ফিক্সড এয়ার" (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) উৎপন্ন করে। তাছাড়া তিনি এও প্রমাণ করেন যে, হীরার দহনের জন্য বায়ুর অবশ্যই প্রয়োজন।

তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—দহনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ। এজন্য তিনি একটা আবদ্ধ কাচের বকযন্ত্রে কিছু পরিমাণ পারদকে বারো দিন ধরে উত্তপ করেন এবং দেখেন যে পারদ লাল বর্ণের পাউডারে (মারকিউরিক অক্সাইড) পরিণত হয়েছে ও বকযন্ত্রের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ বায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। বকযন্ত্রের অবশিষ্ট বায়ুতে (নাইট্রোজেন) ছোট ছোট প্রাণীরা, যেমন ইঁদুর, বাঁচতে পারে না। তারপর সেই লাল রঙের পাউডারকে আবার বকযন্ত্রে উত্তপ্ত করেন। ফলে লাল বর্ণ অন্তর্হিত হয় এবং কিছু গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসকে তিনি সংগৃহীত করেন এবং দেখেন যে তার পরিমাণ আগের হারিয়ে যাওয়া এক-ষষ্ঠাংশ বায়ুর সঙ্গে সমান ও এতে প্রাণীরা প্রশ্বাস নিতে পারে। তিনি গ্রীক শব্দ অক্সিসের (অ্যাসিড) অনুকরনে এই গ্যাসের নাম দেন

"অক্সিজেন", কারন তিনি বিশ্বাস করতেন যে অক্সিজেন সমস্ত অ্যাসিডেরই একটা উপাদান। এইভাবে তিনি দহনের বহুল প্রচলিত "ফ্লোজিস্টন থিওরী" বাতিল করে দেন এবং প্রচলিত করেন যে, দহন এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যাতে কোন পদার্থ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। "ফ্লোজিস্টন থিওরী" অনুযায়ী দহনশীল পদার্থে ফ্লোজিস্টন কণা থাকে এবং দহনের সময় সেই কণাগুলোই জ্বলতে থাকে। যখন কণাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন দহনও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ দহনশীল বস্তুকে দহনের ফলে কিছু কণা হারাতে হয়। কিন্তু ল্যাভসিয়ার দেখান যে দহনের ফলে পদার্থের ওজন কিছু বাড়ে। এখান থেকেই তিনি "পদার্থের নিত্যতা" সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্র অনুযায়ীঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থ যুক্ত বা পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোন পদার্থকে শূন্যে মিলিয়ে দেয়া বা শূন্য হতে কোন পদার্থ সৃষ্টি করা অসম্ভব। এই "পদার্থের নিত্যতা" সূত্রই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সমীকরণ ও সংকেতের ভিত।

ল্যাভসিয়ার শরীরের পরিপাক ক্রিয়ার ওপরেও গবেষণা করেন। ফলে দেহাভ্যন্তরের অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনের কথাই তিনি জানতে পারেন। খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ এবং কঠিন, তরল পদার্থ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ, এই দুইই পরিমাপ করে তিনি আবারও "পদার্থের নিত্যতা সূত্র"ই প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৭৪ সালে ফরাসী সরকারের অনুরোধে তিনি এবং তাঁর কিছু সহকর্মী বিজ্ঞানী মিলে গানপাউডারের মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। এরই ফলে আমেরিকান কলোনীগুলোতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রয়োজনমত গানপাউডার সরবরাহ করা ফরাসী সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়। ১৭৮২ সালে ক্যাভেণ্ডিসের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রমাণ করেন যে জল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি রাসায়নিক যৌগ। এটা সেকালে সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে যে হাইড্রোজের মত দহনশীল গ্যাস ও অক্সিজেনের মত দহন-সহায়ক গ্যাস মিলে কিভাবে অগ্নিনির্বাপক তরল জল উৎপন্ন হয়।

যাইহোক, ১৭৮৭ এবং ১৭৮৯ সালে ল্যাভসিয়ার "নমেনক্লেচার" ও "এলিমেণ্টারী ট্রিটাইস অফ কেমিস্ট্রি" নামে দুটো বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি ও তাঁর সমসাময়িক কিছু বিজ্ঞানী মিলে পদার্থের কু-সংস্কার ও পুরানো ভিত্তিক প্রথাগত নাম পরিবর্তন করে নতুন বিজ্ঞান সম্মত নামকরণ করেন। যেমনঃ "ইলাস্টিক ফ্লুইড" পরিবর্তিত হয়ে হয় "গ্যাস"; "টেরা ফোলিয়াটা টারটরি"র বদলে আসে "পটাশ", "ক্যাল্কস অফ এ মেটাল" পরিবর্তিত হয় "অক্সাইড"তে ইত্যাদি। এছাড়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমেত

পঞ্চান্নটা মৌলকে তিনি তালিকাবদ্ধ করেন। ধাতু, যৌগ, লবণের নামও তালিকা ভুক্ত এবং এদের সংজ্ঞাও তিনি তৈরি করেন। আধুনিক রসায়নাগারের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ওপর সরাসরি ভিত্তি করেই আজকের রসায়ন শাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জীবনের শেষ চারটি বছর ধরে তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করে ফ্রান্সের জন্য ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রাম ও মিটার ভিত্তিক একটা একক পদ্ধতিরও প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে এটা বলা হয় যে, ল্যাভসিয়ার নিজে কোন নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি ; তিনি শুধুমাত্র অন্যের আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই যা কিছু করে গিয়েছেন। এটা যদিও সত্য, তবে এতে তাঁর রসায়ন শাস্ত্রে যে বিরাট অবদান তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় দেশের জন্যও তিনি অনেক কিছু করে যান। তিনি এমন কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেন যা সত্যিই একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। যেমন, রাস্তার জন্য চাষীদের ওপর জোরপূর্বক আরোপিত শ্রম হ্রাসের কথা, বেকারদের জন্য পাবলিক ওয়ার্কশপ, বৃদ্ধ-বয়স বীমা, সেভিংস ব্যাংক, শিল্পাঞ্চলের আবহাওয়া শুদ্ধিকরণ, খনি শ্রমিকের উন্নতি, আদর্শ খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক যুব-শিক্ষা প্রচলন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিকরণ ইত্যাদি।

দেশের প্রতি এত দান থাকা সত্ত্বেও খুবই দুঃখের কথা যে, সেই দেশেই তাঁরই দেশবাসীর দ্বারা তিনি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক স্বেচ্ছাচারিতা ও বিশ্বাসঘাতকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন ; এবং মাত্র একান্ন বছর বয়সে নৃশংস ভাবে তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। তবে তিনি এক বিশাল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে বিশেষ করে রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। উপসংহারে, ল্যাভসিয়ারের প্রতিভার সম্যক উপলব্ধির জন্য, তাঁর গিলোটিনে হত্যার সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাগরাঞ্জের সেই বিশেষ উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা যায় : "It took but a moment to cut off his head but it will take a century to produce another like it".

জঁা ব্যাপটিস্ট লামার্ক

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৪—১৮২৯)

ইতিহাস স্বীকার করে যে, ১৭৬৬ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ১৭৬৬ সাল থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত সাত বছর ধরে চলে। যুদ্ধের ফলাফল ও বিশদ বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় সযত্নে তোলা থাক। আমরা বরঞ্চ এই যুদ্ধের একটা ছোট্ট দৃশ্যে মনঃসংযোগ করি। দৃশ্যে দেখা যায় যে, জার্মান সেনাবাহিনীর এক সর্বনাশা আক্রমণে ফরাসী এক পদাতিক সেনাবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। অধিকাংশই মৃত বা অর্ধমৃত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জীবিতদের মধ্যে এক নবাগত তরুণ ফরাসী সৈন্যও আছেন। তাঁর চারপাশে আহত ও মুমূর্ষুদের কাতর আর্তনাদ। এরই মধ্যে সেই তরুণের কানে এক অস্পষ্ট আদেশ আসে: "লামার্ক, এখন তুমিই এই সেনাবাহিনীর প্রধান।" তিনি বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে যান। কারণ যেখানে প্রত্যেক অফিসারই মৃত, সেখানে তাঁর মতো আনকোরা, অনভিজ্ঞের কাঁধেই এই বিরাট গুরুদায়িত্ব। তিনি তো সবেমাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপনা ছেড়ে এই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। যাইহোক, আদেশের প্রতি মর্যাদা রেখে এবং তাঁর বীরত্ব ও দক্ষতার প্রতি সুনাম রেখে, তিনি অবশিষ্ট সেনার সাহায্যে পরের দিনই জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং পরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান বাহিনীকে জোর করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। লামার্ক, তাঁর এই বীরত্বে, তেজস্বীয়তায়, প্রতিভায় সেবারে এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, তিনি যদি ফরাসী সেনাবাহিনীতে থাকতে পারতেন তাহলে, সেনাবাহিনীতেই একটা বিরাট কিছু ভবিষ্যতে হতে পারতেন। কিন্তু একদিন তামাশার ছলে তাঁরই এক সহকর্মী যখন তাঁর মাথার দুপাশ ধরে তাঁকে ওপরদিকে তোলেন তখন তাঁর লালাগ্রন্থি ভীষণ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়; এবং ফলে তাঁকে সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এইভাবে বিধাতার অমোঘ নির্দেশে, এই ছোট্ট ঘটনা যদিও তাঁকে তাঁর সামরিক ভবিষ্যৎ উন্নতি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু তাঁকে এক বিরাট উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর দিকে ঠেলে দেয় এবং পরে তিনি নিজেকে একজন পথিকৃৎ জীববিদ্ হিসেবে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

লামার্ক ১৭৪৪ সালে ফ্রান্সের বাজানটিন শহরে এক দরিদ্র অথচ অভিজাত

পিতার একাদশতম ছেলে হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। পরে অ্যাথিয়েনসের জেসুট কলেজে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই তিনি সেনাদলে যোগ দেন। পরে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়ে, দারিদ্র্যের কথা ভেবে তিনি প্যারিসে এক ব্যাংক কর্মচারীর পদে যোগ দেন। কিন্তু এই কর্মচারীর পদে নীরসতা অনুভব করে, তিনি প্রথমে এক সংবেদনশীল সংবাদপত্রে সাংবাদিকের কাজ শুরু করেন। পরে এক সঙ্গীতবিদ এবং অবশেষে এক মেডিক্যাল শিক্ষার্থী হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি সৌভাগ্যবশতঃ বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ্, দার্শনিক জাঁ জ্যাকুইস রুসোর সংস্পর্শে আসেন। রুসোর সঙ্গে লামার্ক অনেকবার ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং প্রকৃতি বিশেষ করে উদ্ভিদ বিদ্যার ওপর প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে পড়েন। ফলে তিনি গাছ, ফুল ইত্যাদির ওপর নানান ধরণের বই পড়েন। ভ্রমণকারীদের থেকে নানান গাছের বিবরণ যোগাড় করেন এবং বিভিন্ন ধরণের নমুনা সংগ্রহ করেন। এভাবে প্রায় দশ বছর ধরে যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করে "ফ্লোরে ফ্রাংকাইস" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এতে তিনি উদ্ভিদ প্রজাতিকে উপজাতিতে বিভক্ত করে লিননেয়ীসের শ্রেণী বিভাগকে আরো উন্নত করেন এবং কোন উদ্ভিদকে সহজে আরো সঠিক ভাবে চেনার পদ্ধতি নির্ধারণ করেন।

এই সময় প্রভাবশালী ফরাসী প্রকৃতিবিদ্ কাউণ্ট বাফন, লামার্ককে ইউরোপীয় যাদুঘর ও বাগানগুলোর শিক্ষামূলক ভ্রমণে তাঁর ছেলের সঙ্গী হতে বলেন। লামার্ক বাফনের এই প্রস্তাব স্বীকার করে নেন। ফলে বাফনের সাহায্যে তিনি মহিমান্বিত "ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীয়ে ডেস সায়েন্সেসে"র সদস্য পদে মনোনীত হন। এরপর যখন ষোড়শ লুই উদ্ভিদবিদ্ হিসেবে লামার্কের প্রতিভার কথা শোনেন, তখন লুই তাঁর সুন্দর বাগান "জার্ডিন ডু রই"-এর গাছপালা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক পদে লামার্ককে নিযুক্ত করেন। লামার্কের তত্ত্বাবধানে লুইয়ের বাগান আন্তর্জাতিক দর্শনীয় স্থান হয়ে দাঁড়ায়। বাগানের রং, রূপ, গন্ধ সত্যিই অবর্ণনীয়! কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে লুইয়ের সরকারের সঙ্গে লামার্কের পরিচিতি জনগণের মধ্যে খুব একটা প্রচারিত হয়নি। ফলে বাস্তিলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যখন লুই-এর শিরশ্ছেদ হয়, তখন লামার্ক রেহাই পেয়ে যান। বিপ্লবী সরকার "জার্ডিন ডু রই" নাম বদলে "জার্ডিন ডেস প্লাণ্টেস" করেন।

লামার্ক কোন রকম চালাকি করে প্রাকৃতিক ইতিহাস সংযুক্ত যাদুঘরে প্রাণী বিদ্যার অধ্যাপক পদটিতে নিযুক্ত হন। তিনি এখানে কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় এবং আনুবীক্ষণিক জন্তুদের সম্বন্ধে পড়াতেন এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানী জিওফ্রয় সেণ্ট-হিলারী পাখি ও স্তন্যপায়ী জন্তুদের সম্বন্ধে পড়াতেন। এই

সমস্ত শাখাকে লামার্ক একত্রিত নামকরণ করেন "বায়োলজি" (জীববিদ্যা) বলে।

এখান থেকেই লামার্কের মহান কর্মকাণ্ড ভরা দিনগুলোর শুরু হয়। বিজ্ঞানে তাঁর বিরাট অবদান, বিবর্তনবাদের পূর্বাভাস ইত্যাদি অনেক কিছুই শুরু হয়। কিন্তু তাঁর জীবন যেন একটা বিয়োগান্তপূর্ণ কাহিনী, তিনি চার চারবার বিয়ে করেন; কিন্তু চার চারবারই তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। ঘরে ছেলেমেয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্য বাস্তবিক ভাবে তিনি প্রায় কিছুই করতে পারেন না। এমন কি শেষ জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তখন তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর এক কন্যা কর্ণেলিয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হোত।

তবুও এত সব কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েও তিনি নিরলস ভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করে যান। মানুষের জীবনের মূল উৎস এবং সমস্ত জীবের মধ্যেকার এক সম্পর্ক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তিনি সারাজীবন গবেষণা করে যান। ফলস্বরূপ, ১৮০৯ সালে তিনি "ফিলজফিয়ে জুওলজিকিউ" নামে একটা বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের মাধ্যমে আলোচিত তিনটি প্রধান অংশের সারমর্ম নিম্নরূপঃ (১) পরিবেশ উদ্ভিদ ও জীবের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে—মেরু প্রদেশে বসবাসকারী প্রাণীদের গায়ে গরমের জন্য প্রচুর পুরু লোম থাকে। (২) ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটে—ব্যালে নাচিয়েদের পায়ের পেশীগুলো শক্তিশালী হয়, কামারের হাতগুলো বলবান হয়। (৩) স্বোপার্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়—গাছের ওপরের পাতা খাওয়ার জন্য জিরাফের গলা লম্বা হয় এবং একই সঙ্গে সমস্ত জিরাফ সন্তানেরও গলা লম্বা হয়।

তাঁর এই সমস্ত সিদ্ধান্তে, তাঁকে সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু এই ব্যাপারেই নয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁকে একটা না একটা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর জীবন দারিদ্র্যতা, অসুস্থতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতির একটা মূর্ত প্রতিলিপি। এত সত্ত্বেও অন্ধ অবস্থায়ও প্রাণী বিদ্যার ওপর তাঁর ষষ্ঠতম বইটি তিনি কোনও ক্রমে শেষ করেন। অবশেষে ১৮২৯ সালে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনের ওপর এক দুখের যবনিকা নেমে আসে।

লামার্কের সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের (ডারুইনের নীতি) দিকে মনোযোগ দেন নি। তা সত্ত্বেও লামার্ককে ডারুইনের বিবর্তনবাদের সূত্রের অগ্রদূত বলা যায়। তিনি অমেরুদণ্ডী প্যালিঅন টোলজি (পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টির

ইতিহাসের উপাদান সংগ্রাহকর জীবাশ্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান) স্থাপন করেন। বিজ্ঞানীরা তাঁর স্বোপার্জিত বৈশিষ্ট্যের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। কিন্তু এত সত্বেও সবাই একমত যে জীববিদ্যার ইতিহাসে লামার্কের স্থান সুনির্দিষ্ট।

আলেজান্দ্রা ভোল্টা

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৫—১৮২৭)

১৭৮০ সালে ইটালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক লুইগি গালভানি একটি ধাতব শলাকায় ঝোলানো সদ্য কাটা ব্যাঙের পায়ের স্নায়ু ও পেশীগুলোর বর্ণনা দিতে দিতে ঘটনাক্রমে তাঁর শল্যচিকিৎসার ছুরিটা দিয়ে ব্যাঙের পাটা স্পর্শ করেন। বিস্ময়ে দেখেন যে ছুরিটা লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই মরা পা মৃদু সংকোচিত হল। তখন তিনি বার বার সেই ছুরিটা, মরা সেই ব্যাঙের পায়ের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করালেন এবং সেই একই ঘটনা বারবার ঘটতে লাগল। এরপর প্রায় এগার বছর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার "এনিম্যাল ইলেকট্রিসিটি" প্রকাশ করেন। ফলে সেই সময় প্রায় সবাই মরা ব্যাঙের পা নিয়ে নানান ধরণের পরীক্ষা করতে থাকেন। এর মধ্যে কিন্তু একজন—পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি কিন্তু এই "এনিম্যাল ইলেকট্রিসিটির" থিওরী মেনে নিলেন না। তিনি এই ইলেকট্রিসিটির (তড়িৎ) সত্যিকারের উৎস জানবার প্রতিবেশী আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ফলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখলেন যে মরা ব্যাঙের পায়ে যদি একটা ধাতু স্পর্শ করা যায় তাহলে পায়ের সংকোচন হয় না বা কোন ধাতুই যদি না ব্যবহার হয় তাহলেও একই ঘটনা ঘটে। তখন তিনি এর ওপর ভিত্তি করে, তাঁর জিভে একটি সোনার আর একটি রুপোর মুদ্রা রাখলেন এবং তার দিয়ে যুক্ত করাতে সঙ্গে সঙ্গে জিভে একটা মৃদু সংকোচন অনুভব করলেন। এরপর তিনি আর একটি ঐতিহাসিক পরীক্ষাও করেন। দুটো বিসদৃশ ধাতুদণ্ডকে যুক্ত করে, এক প্রান্ত মুখের ভেতর আর এক প্রান্ত চোখ ছুঁইয়ে রাখেন। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আলোর এক তীব্র অনুভূতি বোধ করেন। এইভাবে তড়িৎকে দর্শন করে এবং স্বাদ নিয়ে সেই পদার্থ বিজ্ঞানী "তড়িতের

স্পর্শ থিওরী” আবিষ্কার করেন তিনি তড়িতের এক নতুন সত্যিকারের স্বরূপ নির্ধারণ করেন।

তড়িতের স্বরূপ নির্ধারণকারী, আলেজান্দ্রো ভোল্টা ১৭৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, উত্তর ইটালীর কোমো শহরে, এক দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত সম্মানীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অধ্যয়ন শুরু হয় কোমোর এক পাবলিক স্কুল থেকে। শিক্ষা সমাপ্তে ১৭৭৪ সালে কোমো শহরেরই এক হাই স্কুলে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৭ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। এখানে সৌভাগ্য ক্রমে তিনি অনেক জ্ঞানী, বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসেন; যাদের মধ্যে একজন ভলটেয়ার। এরপর ১৭৭৯ সালে তিনি পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বহাল হন। ১৭৮০ এবং ১৭৮২ সালে তিনি যথাক্রমে ফ্লোরেন্স ও বোলোগনা এবং জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন এবং লাভসিয়ার, প্রিস্টলি ও ল্যাপলাসের মত প্রমুখ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কোমোতে শিক্ষক থাকাকালীন অবস্থায়ই তিনি “ইলেকট্রোফোরাস” নামে একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে আবেশ পদ্ধতিতে সামান্য পরিমাণ স্থির তড়িৎ সৃষ্টি করা হোত এবং পদার্থ বিজ্ঞান পড়ানোর কালে, স্থির তড়িৎ দ্বারা কোন বস্তুকে তড়িতাহিত করার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ভোল্টা এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন। ভোল্টার অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা নির্মিত এই যন্ত্র এতই সুবেদী ও সঠিক যে প্রায় দুশো বছরেরও ওপর এই যন্ত্রের কোনওরূপ উন্নতি বিধানের প্রয়োজন হয় নি।

তড়িৎবিজ্ঞানে অবদান হিসেবে, তাঁর উদ্ভাবিত ইলেকট্রোস্কোপের জন্য ১৭৯১ সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির বিদেশী ফেলো পদে নির্বাচিত হন। তাঁর এই নতুন ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্র আগের যন্ত্রের চেয়ে অনেক সুবেদী ছিল। আগের যন্ত্রে পিথ-বল ব্যবহার করা হোত। কিন্তু এই যন্ত্রে তিনি ল্যাকারের পাতলা অন্তরক প্রলেপ দ্বারা পৃথক করা দুটো ধাতুর পাত ব্যবহার করেন। ফলে এই যন্ত্র এতই সুবেদী হল যে, এর সাহায্যে তিনি কয়লা পোড়ানোতে যে ধোঁয়া ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়, তার মধ্যেকার তড়িতের উপস্থিতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন।

এর পরেই তাঁর “তড়িতের স্পর্শ থিওরী”র স্বপক্ষে তিনি একটা অকাট্য প্রমাণ হাজির করেন। তিনি তড়িৎ অন্তরকে হাতলওয়ালা অ-তড়িতাহিত দুটো— একটি তামার ও আর একটি দস্তার পাত, ক্ষণিকের জন্য একে অপরের সঙ্গে স্পর্শ করালেন। পরে আলাদা আলাদা ভাবে দুটো পাতকেই তাঁর নতুন উদ্ভাবিত

ইলেকট্রোস্কোপের সামনে এনে দেখেন যে দুটোতেই তড়িৎ আধান উপস্থিত। তাঁর এই ধাতব তড়িতের গবেষণার প্রকাশের ফলে ১৭৯৪ সালে রয়্যাল সোসাইটি থেকে তিনি "কপলে পদক" পুরস্কার পান।

ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি নানান ধরণের ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং দেখতে লাগলেন কোন ধাতুদ্বয়ের সংযোগে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তড়িচ্চালক বল পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তড়িৎ উৎপাদনে তরল তড়িৎ পরিবাহীর ভূমিকা নিয়েও গবেষণা করতে লাগলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৮০০ সালে তিনি বিখ্যাত "ভোল্টাইক পাইল" (ভোল্টীয় স্তূপ) আবিষ্কার করেন। যাতে সর্বপ্রথম তড়িতাধান তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গমন করে। অর্থাৎ সেই প্রথম চল-তড়িতের সৃষ্টি হল ; যা কিনা এক স্থান থেকে অন্যত্র অবিরাম নিয়মিত যাতায়াত করে। ভোল্টা, তড়িতের এই অবিরাম প্রবাহের জন্য, একটি তামা ও একটি দস্তার দণ্ড লবণ জলে ভেজান ব্লটিং-কাগজ দিয়ে পৃথক করে রাখেন। সাজানটা নিম্নরূপ : তামা, লবণ জলে ভেজান ব্লটিং-কাগজ, দস্তা ; তামা, কাগজ, দস্তা ; এবং এইভাবে চলতে থাকে। লবণজলে ভেজান কাগজ দ্বারা পৃথক করা তামা ও দস্তার দণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে এই স্তূপ বা ব্যাটারির ক্ষমতা বাড়ান যায়। এছাড়া তিনি সেই সময়ে আর এক ধরণের ব্যাটারিরও উদ্ভাবন করেন এবং নাম দেন "ক্রাউন অফ কাপস"। এতে তিনি একটি লবণ জল দ্বারা অর্ধপূর্ণ কাপে, একটি তামা ও দস্তার দণ্ড প্রবেশ করান। এই আবিষ্কারের কথা তিনি ১৮০০ সালেই এক চিঠিতে রয়্যাল সোসাইটিকে জানান।
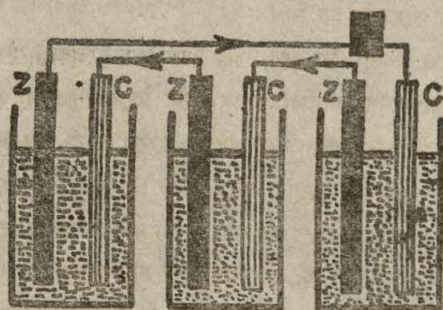
তাঁর এই বিখ্যাত আবিষ্কারের ফলস্বরূপ, তিনি প্রভূত সম্মান ও পুরস্কারে বিভূষিত হন। ব্রিটিশরা ভৌত বিজ্ঞানে খুব বেশী উন্নত করায় নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মনে একটা ক্ষোভ ছিল। সেজন্য তিনি ভোল্টাকে তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ দিতে "ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে" ১৮০১ আমন্ত্রণ জানান। ভোল্টা এই আমন্ত্রণ স্বীকার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ দর্শন করতে সে যুগের

অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীই হাজির হন ; যেমন কুলম্ব, বায়ট, ল্যাপলাস ও আরো অনেকে। জনতা এমনকি নেপোলিয়ানও এই ব্যাটারী থেকে মৃদু তাড়িৎ-শক পাওয়ার জন্য এতই অধীর হয়ে যান যে ভোল্টা তাঁর বক্তৃতাও শেষ করতে পারেন না। ফ্রান্সে ভোল্টার সম্মানে এক সোনার পদক চালু করা হয় এবং তাঁকে "ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও নেপোলিয়ান তাঁকে দু-হাজার ফ্রাঁ (ফরাসী মুদ্রা) পুরস্কৃত করেন, কাউন্ট উপাধি প্রদান করেন ও লম্বার্ড রাজ্যের সেনেটর করেন। ১৮০৪ সালে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক পদে অবসর নিতে চান। কিন্তু তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ নেপোলিয়ান তাঁকে ছাড়তে চান না। নেপোলিয়ান তাঁকে একান্ত অনুরোধ করেন যে তিনি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন ; এমন কি ভোল্টা যদি বছরে একটা লেকচারও দেন তাহলেও তাঁকে পূর্ণ বেতনই দেওয়া হবে। কিন্তু অবশেষে ১৮১৯ সালে তিনি অবসর নিয়ে তাঁর মাতৃভূমি কোমোতে ফিরে আসেন এবং এখানেই চরম শান্তিতে ১৮২৭ সালে পরলোক গমন করেন।

ভোল্টার এই আবিষ্কার গবেষণার অনেক নতুন দিক উন্মুক্ত করে। তাঁর এই ব্যাটারীর সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় ; ফলে বিজ্ঞানের নতুন শাখা "তড়িৎ রসায়ন" সৃষ্টি হয়। ভোল্টার ব্যাটারীর শক্তি দিয়েই স্যার হামফ্রে ডেভি সোডিয়াম ও পটাসিয়াম মৌল আবিষ্কার করেন। অবশেষে তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের প্রতি যথাযত সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৮৮১ সালে "ইন্টার ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেস" তাঁরই নামানুসারে তড়িচ্চালক বলের এককের নামকরণ করেন "ভোল্ট"।

..........এডোয়ার্ড জেনার..........

(খৃীষ্টাব্দ ১৭৪৯—১৮২৩)

বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যে যত ভয়ার্ত গল্প আছে, তাঁর মধ্যে অন্যতম ১৭২২ সালে প্রকাশিত ড্যানিয়েল ডিফোর "এ জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার"। যদিও এর মধ্যে কিছু কিছু কল্পনা আছে, তবুও বেশীর ভাগই মহামারী আক্রান্ত শহরের সন্ত্রাসের একটা বিস্তৃত, সত্য প্রতিলিপি এর মধ্যে পাওয়া যায়। ডিফোর কিছু কিছু বর্ণনা থেকে এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় অনুবাদ করা কিছু

বর্ণনা ঃ "বাড়ীর দরজা-জানলায় মেয়ে ও শিশুদের কাতর আর্তনাদ................ বাড়ীর ভেতরেই মৃত অথবা মৃতপ্রায় আত্মীয়..............শোক-বিলাপে পৃথিবীর যে কোন নির্দয়তম ব্যক্তিরও অন্তরাত্মা বেদনায় গুমরে ওঠে...............শহরের সর্বত্রই মাঠে, ঘাটে মহামারী আকারে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়েছে...............রাস্তা ঘাটে লোক আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে..............সবচেয়ে বড় কথা সাহস করে কেউই তাদের কাছে আসছে না বা তাদেরকে একটু সাহায্য করছে না।"

সমস্ত পৃথিবীর কাছেই তখন গুটিবসন্ত মহামারীর সন্ত্রাসের কথা অজানা কিছুই নয়। ৯০০ সালে একজন পারসীয় চিকিৎসক প্রথম হাম থেকে গুটি বসন্তকে পৃথক করে দেখান। কিন্তু এর বিধ্বংসী ক্ষমতার কথা তারও বহু শতাব্দী আগেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা এর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। ১৬১৪ সালে এর আক্রমণে ইউরোপের প্রায় এক-দশমাংশই শেষ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডেও ১৬৬৬ থেকে ১৬৭৫ সাল পর্যন্ত এর আক্রমণে ইংল্যান্ডবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের ভারতবর্ষও এর থেকে রেহাই পায়নি এবং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ভারতেরও প্রায় এক-দশমাংশ জনগণ এই রোগের কবলে প্রাণ হারায়।

১৭১৭ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম চীনা পদ্ধতিতে গুটি বসন্তের টীকার প্রচলন হয়। লেডী মন্টাগু প্রাচ্য পদ্ধতিতে রোগীর হাতে একটুখানি জায়গা কেটে দিয়ে গুটি বসন্তের পুঁজ মিশ্রিত তরলে ভেজানো একটা সুতো সেই জায়গার ওপর বুলিয়ে দিতেন। যদিও নীতিটা সঠিক ছিল, কিন্তু পদ্ধতিটা এতই সাংঘাতিক ছিল যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা সংক্রামিত হয়ে যেত।

যাইহোক কার্যকরী ভাবে এই ভয়ংকর গুটি বসন্তকে যিনি জয় করেন তিনি হলেন মুকুটহীন সম্রাট, এডোয়ার্ড জেনার। জেনারের জন্ম ১৭৪৯ সালের ১৭ই মে, ইংল্যান্ডের বার্কলেতে। স্কুল জীবন শেষ করে তিনি ডাক্তারী পড়ার জন্য স্থানীয় এক শল্যচিকিৎসকের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ঐ শল্যচিকিৎসক তাঁকে লন্ডনে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ডাক্তার জন হান্টারের অধীনে কাজ করতে পাঠান। লন্ডনে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসের কাছে প্রাণীবিদ্যাগত নমুনা তৈরি করবার পার্ট-টাইম কাজও করতেন। এগুলো ১৭৭১ সালে ক্যাপ্টেন কুকের প্রথম যাত্রা থেকে জোসেফ সংগ্রহ করেন। জেনার, কুকের দ্বিতীয় অভিযানের সঙ্গী হবার জন্য ঠিক করেন। কিন্তু পরে আবার মত বদল করে বার্কলেতে ডাক্তারী চর্চার জন্য ফিরে আসেন। এই সময় তাঁকে প্রায়ই গো-বসন্ত সারাবার জন্য ডাকা হোত। গো-বসন্ত এমন একটা সংক্রামক ব্যাধি যা গরুর বাঁট থেকে গো-পালাকদের হাতে

স্থানান্তরিত হোত। অনেক গোয়ালারই প্রায় হাতভর্তি পুঁজওয়ালা ছোট ছোট ফুসকুড়ি হোত; কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি ভালও হয়ে যেত। জেনার তাদের বলতে শুনতেন যে, যেহেতু আগেই তাদের গো-বসন্ত হয়ে গেছে সেজন্য তাদের আর গুটি বসন্ত হবে না। ধারণাটা তাঁর মনে হঠাৎ ধরল এবং ১৭৯৫ সাল থেকেই তিনি গো-বসন্ত ও গুটি বসন্তের মধ্যেকার সম্পর্ককে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

গবেষণার ফলে দেখলেন যে দু ধরণের গো-বসন্ত আছে। তার মধ্যে একটির গুটি-বসন্ত প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে এবং তা তখনই সম্ভব যদি একটা বিশেষ অবস্থায় অসুস্থ গরুর বা গো-বসন্ত আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে টীকা তৈরি করে অন্যকে দেওয়া হয়। তাঁর এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে, ১৭৯৬ সালে তিনি গো-বসন্তে আক্রান্ত এক রোগীর ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ নিয়ে একটা আট বছরের ছেলের শরীরে টীকা দেন। দুমাস পরে আবার সেই ছেলেটার শরীরেই গুটি বসন্তের পুঁজ নিয়ে টীকা দেন। কিন্তু রোগজীবাণুর যথেষ্ট পুষ্টিসাধনের জন্য দু সপ্তাহ অপেক্ষা করেও দেখা গেল ছেলেটির কিছুই হয় নি—সে ভালই আছে।

অতএব তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে, ১৭৯৮ সালে এই তত্ত্ব "ইনকোয়ারী ইনটু দি কস অ্যান্ড এফেক্টস অফ ভ্যারিওলেই ভ্যাকসিনেই" নামে এক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। প্রতিদিনই তিনি অজস্র চিঠি পেতে লাগলেন। কেউ সিরাম চেয়ে, কেউ আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, আবার কেউ বা অতিরিক্ত কিছু এ সম্বন্ধে সংবাদ চেয়ে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। চিঠির পরিমাণ এত হতে লাগল যে তাঁকে শুধুমাত্র সংবাদ আদান প্রদানের জন্য বেশ কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত করতে হয়। এই সময় তিনি ঠাট্টাচ্ছলে বন্ধু-বান্ধবদের বলেন যে তিনি নাকি "জগতের কাছে একজন ভ্যাকসিন ক্লার্ক" হয়ে উঠেছেন। তবে কিন্তু এ ছাড়াও কিছু কিছু ডাক্তার ও গোঁড়া লোকের কাছ থেকে তীব্র তিরস্কার পূর্ণ চিঠিও তিনি পেতেন। তারা তাঁকে অজ্ঞ, হাতুড়ে ডাক্তার ও মানব জাতির আতংক বলে বর্ণনা করতেন। তাদের মতে টীকাগুলো যথেষ্ট ভাবে যাচাই করা হয়নি এবং এর ফলে হয়ত গুটি বসন্ত আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়বে।

তাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ কষ্টকল্পিত বলে প্রমাণিত হল। টীকা দেবার পরে মাত্র কয়েক'শ লোকই গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। কিন্তু জেনার প্রমাণ করেন যে সেই কয়েক'শ লোককে যে টীকা দেওয়া হয়, সেই টীকাগুলোর প্রস্তুত পদ্ধতি ভুল ছিল ফলে তাতে সংক্রমণ দেখা দেয়। তখন তিনি দেখিয়ে দেন যে তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতে টীকা কতখানি নিরাপদ। আস্তে আস্তে টীকা

সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি স্বীকৃত হতে লাগল। আঠারো মাসে ইংল্যাণ্ডে প্রায় বারো হাজার লোককে টীকা দেওয়া হয় এবং গুটি বসন্তের বাৎসরিক শিকার ২,০১৮ থেকে কমে ৬২২-এ দাঁড়ায়।

শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, এই মূল্যবান টীকা ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশ-গুলোতেও পেঁছোয়। হাভানা, যেখানে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোক গুটি বসন্তে মারা যেত, সেখানে দু বছর ব্যাপক হারে টীকা দেওয়ার পরে দেখা গেল যে গুটি বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য। ১৮০৩ সালে বিশ্ব টীকা ও তার মহিমান্বিত উদ্দেশ্য নিমিত্ত রয়্যাল জেনারেল সোসাইটি লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানব জাতির আর এক অভিশাপ জেনারের প্রতিভা ও দক্ষতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। কিন্তু ১৮২৩ সালে অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী জেনারের নশ্বর দেহ প্রকৃতির নিয়মের দাসত্ব থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে না।

..........মার্কুইস পিয়েরে সাইমন ডি ল্যাপলাস.................... —

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৯—১৮২৭)

আঠারো বছরের এক তরুণ, যিনি ইতিমধ্যেই ছোট্ট শহর বিউমণ্টের মিলিটারী স্কুলের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও গণিতজ্ঞ, মনে মনে স্থির করলেন যে, বিজ্ঞানের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে হলে প্যারিসে যেতেই হবে। সেজন্য ১৭৬৭ সালে সুপারিশ পত্র নিয়ে সেরা ফরাসী গণিতজ্ঞ ডি অ্যালেম্বার্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্যারিস অভিমুখে রওনা দিলেন। ডি অ্যালেম্বার্টের বাড়ীতে এসে যদিও তিনি তাঁর সুপারিশ পত্রগুলো দেখালেন তবুও ডি অ্যালেম্বার্টের সাক্ষাৎ পেলেন না। তাঁর সুপারিশ পত্রগুলো কোন কাজেই এলো না। তবুও তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থাকলেন। শেষে একটা অন্য রাস্তা ধরলেন। তিনি বলবিদ্যার নীতির ওপর একটা প্রবন্ধ লিখলেন ও সেটা ডি অ্যালেম্বার্টের কাছে পাঠিয়ে তাঁর সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর যোগাযোগের জন্য বিজ্ঞানের এই ভাষার মাধ্যম ডি অ্যালেম্বার্ট সম্যক উপলব্ধি করলেন। ডি অ্যালেম্বার্ট এই তরুণের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ দেখা করার জন্য বললেন। এই সম্বন্ধে ডি অ্যালেম্বার্টের উক্তি: "তোমার নিজস্ব কাজের

সুপারিশ ছাড়া অন্য কোন পরিচিতির দরকার নেই।" পরে ডি অ্যালেম্বার্টের সাহায্যেই সেই তরুণ প্যারিসের "ইকলে মিলিটেয়ারে" গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এবং এইভাবে বিজ্ঞানের বৃহত্তর জগতে তিনি প্রবেশ করেন ও পরে নিজেকে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসেবে জগতের কাছে ল্যাপলাস নামে পরিচিত করেন।

আজকের বিখ্যাত, সেদিনের সেই তরুণ ল্যাপলাস, নরম্যাণ্ডির ছোট্ট শহর বিউমন্ট-এন-অগে, ১৭৪৯ সালে ২৮শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একটা ছোট ফার্মের মালিক হওয়ার দরুণ ল্যাপলাসকে স্কুলে বেশীদূর পড়াতে পারেন নি। কিন্তু পড়াশোনায়, বিশেষ করে গণিতে, অসাধারণ প্রতিভার জন্য তাঁর আত্মীয় ও স্বচ্ছল কিছু প্রতিবেশীর সাহায্যে তিনি কেইনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশান সমাপ্তির অল্প কয়েক বছর পরেই, তিনি ডি অ্যালেম্বার্টের সহায়তায় ইকলে মিলিটেয়ারে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

ল্যাপলাসের প্রথম মহান বৈজ্ঞানিক সাফল্য—মহাজাগতিক গতিবিদ্যায় গণিতের প্রয়োগ, স্যার আইজ্যাক নিউটন ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণও গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে গ্রহগুলোর বিচ্যুতির কারণ ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হন। উদাহরণ স্বরূপ, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ তাদের নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে কখনও সামনে এগিয়ে আসে আবার কখনও পেছনে চলে যায়। কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে, গ্রহগুলোর মধ্যেকার মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণের ফলেই এটা হয়। কিন্তু ল্যাপলাস গাণিতিক প্রমাণ সাপেক্ষে এই সম্বন্ধে সূত্র নির্ণয় করেন এবং এই সূত্র অনুযায়ী কোন আকস্মিক বিচ্যুতিই হঠাৎ ঘটে না। এই বিচ্যুতি আপনা আপনিই ঘটে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলো আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যায়। জগতের মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সম্পর্ক নির্ধারণে এই সূত্র এক মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

পরের বছরগুলো ল্যাপলাস অত্যন্ত ফলপ্রসূ গবেষণা করেন এবং তারই ফলস্বরূপ তিনি প্রকৃতি ও বিশ্বের মৌলিক বলগুলোর সঠিক বৈজ্ঞানিক স্বরূপ নির্ধারণ করেন। এই সময় তিনি অভিকর্ষজ বল, অভিক্ষেপের গতি, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা, বিষুবরেখার অয়নচলন, শনির বলয়ের আকার এবং ঘূর্ণগতি ও আরো অন্যান্য বিষয়ের ওপর বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া ঘূর্ণায়মান তরল পদার্থের সাম্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও পৃষ্ঠ-টানের সূত্রেরও কথা বলেন—যা তরলের আনবিক সংযোজন ও আসঞ্জন ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করা আধুনিক মতবাদেরই অনুরূপ। ল্যাভসিয়ারের সঙ্গে কাজ করতে করতে তিনি বিভিন্ন বস্তুর দহন ক্রিয়া ও আপেক্ষিক তাপ নির্ধারণ করেন এবং আধুনিক তাপ-গতি

বিজ্ঞানের ভিত স্থাপন করেন। বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের জন্য তিনি একটা যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন। যার নাম "ল্যাপলাসের বরফ ক্যালরিমিটার"। এতে কোন নির্দিষ্ট ওজনের নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উষ্ণ বস্তুর সাহায্যে কিছু বরফকে গলিয়ে ফেলা হয়। পরে গলিত বরফের ওজন নির্ণয় করে গাণিতিক এক পদ্ধতিতে সেই বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করা হয়। বাহিরের কোন বস্তুর ওপর কোন গোলকের মাধ্যাকর্ষণ বল গবেষণা করতে গিয়ে তিনি "ল্যাপলাসের সমীকরণ" নামে একটি সমীকরণ আবিষ্কার করেন। এই সমীকরণের সাহায্যে অবিরত গতিতে থাকাকালীন কোন ভৌত রাশির যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভব নির্ণয় করা যায়। এই সূত্র শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেই নয়, তড়িৎ, হাইড্রো-ডাইনামিক (জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ সংক্রান্ত শক্তি বিজ্ঞান) ও পদার্থ বিজ্ঞানের আরো অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া তরঙ্গের ক্ষেত্রে নিউটনের এক সূত্রকেও তিনি পরিশোধন করেন। তিনি কাণ্টের বিশ্বজগতের গঠনের নীহারিকা সংক্রান্ত প্রকল্পকে সমর্থন করেন এবং তার উন্নতিবিধানও করেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী, মহাবিশ্ব একটা বিশাল ভরসম্পন্ন ঘূর্ণায়মান গ্যাসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পিণ্ড ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে মোটা ঘূর্ণায়মান চাঁইগুলো ছিটকে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে এগুলো পিণ্ডাকারে জমা হয়েছে এবং কঠিন হয়ে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। যদিও সৌরজগৎ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর এই যুক্তি গ্রাহ্য করা হয় না, তবে সৌরজগতের বাহিরে দূরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জের বেলায় তাঁর ব্যাখ্যা আজও মেনে নেওয়া হয়।

তাঁর এই সমস্ত, পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞাতের ওপর আবিষ্কার ও প্রকল্পগুলো তিনি প্রবন্ধ আকারে অ্যাকাডেমিয়ে ডেস সায়েন্সেসে উপস্থাপিত করেন। ১৭৯৯ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ল্যাপলাস তাঁর সমস্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধকে একত্রিত করেন এবং পাঁচটা খণ্ড সম্পন্ন "মেকানিকিউ সেলেসটে" বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা ইতিহাস প্রকাশ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞদের গবেষণালব্ধ ফলগুলোকে ধারাবাহিক সাজিয়ে তিনি সৌর জগতের গতিভিত্তিক সমস্যাগুলোর একটা সম্পূর্ণ সমাধান দিতে চেষ্টা করেন। তাঁর কাজকর্মকে আরো বেশী জনপ্রিয় করার জন্য "এক্স-পোজিশান ডু সিস্টেমে ডু মণ্ডে" এবং সম্ভাবনা সূত্রের ওপর ১৮১২ সালে "থিয়োরীয়ে অ্যানালাইটিকিউ ডেস প্রবাবিলিটেস" নামে দুটো বই প্রকাশ করেন।

কিন্তু অনেকের মতে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তাঁর বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলোর মত অত বিশিষ্ট কিছু নয়। তাঁর ব্যর্থতার জন্য তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের অবদানের কৃতিত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং সেজন্য অবহেলা ভরে, তিনি যে

সমস্ত উৎস থেকে সিদ্ধান্ত নিতেন, তাদের কখনও প্রকাশ করতেন না। ল্যাভসিয়ার গিলোটিনে নিহত হন। কিন্তু ল্যাপলাস ক্ষমতায় আসা বিভিন্ন শাসক বর্গের সঙ্গে সুন্দর ভাবে নিজেকে প্রত্যেকবারই খাপ খাইয়ে নেন। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তিনি প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করেন; নেপোলিয়ানের নামে বইয়ের পরবর্তী এক সংস্করণ উৎসর্গ করেন; আবার যখন নেপোলিয়ান নির্বাসিত হন তখন তিনি নতুন ক্ষমতায় আসা বুরবোঁ রাজাকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর এই হীন তোষামোদের জন্য তিনি বুরবোঁ সম্রাটের থেকে "মার্কুইস" উপাধি লাভ করেন। ল্যাপলাস প্রায় আটাত্তর বছর অবধি বেঁচে ছিলেন। শেষ জীবনটা তিনি অর্ধ অবসর প্রাপ্ত হয়ে আরকুয়েলে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি প্রতিবেশী হিসেবে রসায়নবিদ্ কাউন্ট ডি বার্থোলেটকে লাভ করেন, এবং এখানেই তিনি সমস্ত জগৎ থেকে আসা বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে খোশগল্প করে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর সম্বন্ধে যে যাই মন্তব্য করুক না কেন, এটা নিশ্চিত যে, গাণিতিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর মতবাদ, বিজ্ঞান জগতের পক্ষে একটা বিরাট অবদান। তাঁর সময়ের অন্যান্য চল্লিশজন অমর বিজ্ঞানীর মতো তিনিও ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীতে নির্বাচিত হন। কিন্তু তবুও তাঁর মরণশীল শরীর ১৮২৭ সালে আকাঙ্খিত মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে।

...........বেঞ্জামিন থম্পসন রাম্‌ফোর্ড ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৩—১৮১৪)

আজকে আমরা জানি যে, শক্তির ক্ষয় নেই। এক শক্তি শুধুমাত্র আর এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। গতিশক্তির ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি। কিন্তু ১৭৯৮ সালের আগে পর্যন্তও এ তত্ত্ব অজানা ছিল। সে সময় তাপের "ক্যালরিক" মতবাদ বহুল প্রচলিত। "ক্যালরিক" মতবাদ অনুযায়ী, বস্তুর মধ্যে অবস্থিত ভারহীন পদার্থ "ক্যালরিক"ই তাপের উৎপন্নের একমাত্র কারণ বলে বিবেচিত হোত। কিন্তু ১৭৯৮ সালে কাউন্ট রামফোর্ড নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করেন যে, তাপ গতিশক্তির ফলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি। এই ধারণা কাউন্টের মস্তিষ্কে সেই সময়েই প্রথম আসে যখন তিনি মিউনিখের এক সমরাস্ত্র কারখানায় গিয়ে দেখেন যে, পেতলের বন্দুক ছেঁদা

করার ফলে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। পরে তিনি এক পরীক্ষায় জলের ভেতরে একটা কামান রেখে সেটাকে এক ভোঁতা ড্রিল দিয়ে ছেঁদা করতে থাকেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে, যে জলের ভেতর কামান রাখা আছে, তা ফুটতে আরম্ভ করেছে। এই পরীক্ষায় প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ "যখন দর্শকরা দেখল যে সম্পূর্ণ ভাবে আগুন ছাড়াই সেই বিরাট পরিমাণ ঠাণ্ডা জল গরম হয়ে ফুটছে, তখন তারা যে কি পরিমাণ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হল, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।" ১৭৯৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির এক পত্রিকায় এই মতবাদ যদিও প্রকাশিত হয়, তবুও চল্লিশ বছরেরও বেশ পরে ১৮৪০ সালে এটা কার্য্যকরী হয় যখন জেমস প্রেসকট জুল তাপবিদ্যার প্রথম সূত্রটা আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞানী কাউণ্ট রামফোর্ডের আসল নাম কিন্তু বেঞ্জামিন থম্পসন। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, কাউণ্ট রামফোর্ড নামটা তিনি কিন্তু ১৭৯১ সালে খেতাব হিসেবে পান। বেঞ্জামিন থম্পসন, বেঞ্জামিন ও রুথ থম্পসনের একমাত্র ছেলে। ১৭৫৩ সালে উডবার্নের ম্যাসাচুসেটসে (বর্তমানে কনকর্ড, নিউ হ্যাম্পশায়ার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দু বছর বয়স হবার আগেই তাঁর বাবা পরলোক গমন করেন। কিন্তু তাতে তাঁর বাল্যশিক্ষার কোন অসুবিধেই হয় নি। চৌদ্দ বছর বয়স হবার আগেই তিনি সালেমের এক দোকানে কর্মচারীর কাজ শিখতে ঢোকেন। এখানে তিনি তিন বছর থাকেন। সে সময় তিনি একই সঙ্গে পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং শীঘ্রই গণিতে এবং অঙ্কন শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞানেও বেশ আগ্রহী হয়ে পড়েন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই, প্রায় চার সেকেণ্ডেরও কম ভুলে তিনি সূর্য্য গ্রহণের কাল নির্ণয় করেন। ১৭৬৯ সালে তিনি বোস্টনে স্টোর ক্লার্কের চাকরী করতে করতে ফরাসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৭৭১ সালে জন হে'র অধীনে মেডিসিন ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাচারাল ফিলজফিও পড়তে শুরু করেন। শীঘ্রই মাত্র উনিশ বছর বয়সে, ১৭৭২ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকের কাজও করতে থাকেন। স্কুল শিক্ষক অবস্থায় তাঁকে দেখে রেভারেণ্ড টিমোথি ওয়াকার তাঁর নাম দেন ম্যাসাচুসেটসের রামফোর্ড বলে। তাঁকে দেখতে নাকি অসাধারণ সুন্দর ছিল—প্রায় ছয় ফুট লম্বা, নিখুঁত, সুদর্শন, সোনালী পীত বর্ণের একমাথা চুল—যা দেখে যে কোন মেয়েই তাঁর প্রতি এক সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। ১৭৭২ সালে তিনি তাঁর থেকে প্রায় এগারো বছরের বড় রেভারেণ্ডের বিত্তবান, বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেন।

১৭৭৪ সালে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, দেশবাসীরা তাঁকে

"ব্রিটিশের চর" বলে সন্দেহ করে এবং জেরার জন্য কনকর্ডের এক পিপলস কমিটির কাছে তাঁকে আসতে হয়। প্রমাণাভাবে তিনি বেকসুর খালাস পান। কিন্তু তবুও জনগণের সন্দেহ থেকে অব্যাহতি পান না। উচ্ছৃঙ্খল জনতার রোষ এড়াতে সেজন্য তিনি উডবার্ণ ত্যাগ করেন এবং ১৭৭৫ সালে তাঁর স্ত্রী ও সদ্যজাত কন্যাকে ফেলে রেখে নিউপোর্ট বন্দর থেকে ব্রিটিশ ফ্রিগেট "স্কারবোরাফে" ওঠেন এবং চিরকালের জন্য অকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীকে পরিত্যাগ করে বোস্টনে চলে আসেন। ১৭৭৬ সালে তেইশ বছর বয়সে তিনি রাজা তৃতীয় জর্জের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন।

শীঘ্রই, খুব সহজেই তিনি উপনিবেশ সংক্রান্ত ষ্টেট-সেক্রেটারী লর্ড জর্জ জার্মেইনের অনুগ্রহ ভাজন হন। উপনিবেশ সম্বন্ধে সরাসরি সংবাদের জন্য জার্মেইন তাঁকে বর্জিয়া রাজ্যের সেক্রেটারীর পদে বহাল করেন। উপনিবেশ সম্বন্ধে খবরাখবরের অবসরে রুম্পোর্ড নানান ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও প্রবন্ধ লেখায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। যেমনঃ সমরাস্ত্র সম্বন্ধে নানান গবেষণা, গানপাউডারের বিস্ফোরক ক্রিয়া, বুলেটের গতিবেগ, বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রের গঠন। এছাড়া তিনি সমুদ্রে সংকেত পদ্ধতিরও উন্নতি সাধন করেন। তিনি তাঁর এই সমস্ত গবেষণালব্ধ ফল নিয়ে রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্যার জোসেফ ব্যাংকসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর এই সমস্ত গবেষণা ও নৌবাহিনী-সংক্রান্ত স্থাপত্য শিল্পের ওপর লেখা একটা প্রবন্ধের ফলস্বরূপ ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৭৭৯ সালে রয়্যাল সোসাইটির একজন ফেলো নির্বাচিত হন।

১৭৮১ সালের শেষের দিকে তিনি রাজার সৈন্যবাহিনীর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হয়ে ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করে লং আইল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে জাহাজের ডেকেই তিনি হাল্কা কামানগুলো নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং চাঁদের বিভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণও করেন। এগুলো পরে তাঁর লেখা প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। ১৭৮৩ সালে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ইংল্যাণ্ডে আবার ফিরে আসেন এবং কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। ফলে জীবনের বাকী দিনগুলোর জন্য অর্ধেক মাইনের পেনসনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ মহাদেশ ভ্রমণকালে তিনি ব্যাভারিয়ার ইলেক্টরের (মনোনয়ন কর্তা) সঙ্গে পরিচিত হন। ইলেক্টর তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ব্যাভারিয়ার আসার আমন্ত্রণ জানান। বৈদেশিক রাজ্যে চাকরী করবার জন্য তিনি রাজার অনুমতি নিতে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। রাজা শুধুমাত্র অনুমতিই নয়, যাবার আগে তাঁকে "স্যার" উপাধিতেও ভূষিত করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ব্যাভেরিয়ায় যান। সেখানে তিনি

এগার বছর অতিবাহিত করেন। ব্যাভারিয়ায় প্রথমে কর্ণেল ও পরে জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ১৭৮৮ সালে সেখানকার প্রিভি-কাউন্সিল পদে ও ১৭৯১ সালে তাঁর কাজকর্মের জন্য তাঁকে কাউন্ট করে দেওয়া হল। এছাড়াও তিনি ব্যাভারিয়ায় থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন। যেমনঃ যুদ্ধ-মন্ত্রী, পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেন্ট। এ সময়ে তিনি নানান ধরণের কাজকর্মও করেন। যেমন, ভিক্ষা দূরীকরণের জন্য মিলিটারী ওয়ার্ক-হাউস প্রতিস্থাপন, শ্রমিকদের আলোর সুব্যবস্থার নিমিত্ত ফটোমিটারের উদ্ভাবন, যাতে করে বিভিন্ন গঠন প্রণালীর বাতিদান হতে নির্গত আলোর আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যেত। তবে তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার হল তাপের স্বরূপ নির্ধারণ করা। এছাড়া পুষ্টিকর খাবার সস্তায় নির্মাণ ও উৎপাদন করার জন্য তিনি উনুন ও চিমনির উন্নতি সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। ১৭৯২ সালে, তড়িতের জন্য তাঁর স্বদেশবাসী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার পাবার প্রায় ঊনচল্লিশ বছর পরে, "ভ্যারিয়াস পেপারস অন দি প্রপার্টিস অ্যান্ড কমুনিকেসন অফ হিট" প্রবন্ধের জন্য রামফোর্ড রয়্যাল সোসাইটি থেকে একই কপলে পদক পান।

এরপর ১৭৯৫ সালে তাঁর মোটমাট আঠারোটা রচনা প্রকাশের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যাভারিয়া ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন এবং তাঁর বাইশ বছরের মেয়েকে সেখানে নিয়ে আসেন। দীর্ঘ বাইশ বছর পর বাবা মেয়ের মিলন হয়। তাঁর পরের তিন বছরের অধিকাংশ কার্য্যাবলীই, তাঁর মেয়ের সযত্নে রক্ষিত দিনলিপি থেকে পাওয়া যায়।

১৭৯৬ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটি এবং আমেরিকান একাডেমী অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, যাতে করে মানব জাতির উন্নতির জন্যে তাপ ও আলোকের ওপর প্রয়োজনীয় আবিষ্কার ও উন্নতিকারককে পুরস্কৃত করা হয়। ১৮০২ সালে রামফোর্ডই স্বয়ং রয়্যাল সোসাইটি থেকে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন।

১৭৯৭ সালে "দি প্রপাগেমন অফ হিট ইন ফ্লুইডস" নামক তাঁর সপ্তম রচনাটি সমাপ্ত হয়। "সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাপ সর্বদিকে বাধাহীন ভাবে সঞ্চালিত হয়"— এই তত্ত্বে বিশ্বাস নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বায়ু ও কাঠ তাপের কু-পরিবাহী এবং তরল পদার্থও সর্বদিকে তাপকে সমান ভাবে সঞ্চালিত করে না।"

এর পর তাঁর মেয়ে সারা যখন আমেরিকায় আবার ফিরে যান, তখন তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউসন নামে এক ট প্রতিষ্ঠান করার দিকে মন দেন। এই ইনস্টি-টিউসনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত নতুন এবং কার্যকরী বিকাশের জ্ঞান জনগণের

মধ্যে দ্রুত এবং ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দেয়া। শীঘ্রই কাজকর্মের ফলে এই ইনস্টিটিউসন অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করে এবং ১৮০০ সালের জানুয়ারীতে পার্লামেন্ট দ্বারা স্বীকৃতিও লাভ করে। ডেভি এবং ফ্যারাডের মত বিজ্ঞানীও এই ইনস্টিটিউসনের সঙ্গে গোড়ার দিকে সংযুক্ত ছিলেন। ইনস্টিটিউসনের প্রকাশিত জার্নালে রামফোর্ডের দুটো রচনা—"অন দি মীনস অফ ইনক্রিজিং দি হিট অবটেইনড দি কমবাসসন অফ ফুয়েল" এবং "অন দি ইউজ অফ স্টীম অ্যাজ এ ভেহিকেল ফর কনভেয়িং হিট" প্রকাশিত হয়।

১৮০০ সালে রামফোর্ড এডিনবার্গের রয়্যাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন এবং এডিনবার্গের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টরেট অফ ল" প্রদান করে। ১৮০২ সালে ফ্রান্সে ভ্রমণরত অবস্থায় মাদাম ল্যাভসিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মাদামকে দেখে তিনি তাঁর প্রতি এক আসক্তি অনুভব করেন। বেশ কয়েক বছর প্রায় প্রার্থনার পর অবশেষে ১৮০৫ সালে তাঁদের বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বিবাহ সুখের হল না এবং ১৮০৯ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি ফরাসী ইনস্টিটিউটের বিদেশী সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তাঁর শেষ রচনার নাম "দি এক্সসেলেন্ট কোয়ালিটিজ অফ্ কফি অ্যান্ড দি আর্ট অফ মেকিং ইট টু পারফেকশন।" এবং সেটা আজকের "ড্রিপ" (ফোঁটায় ফোঁটায় ঝড়ান) পদ্ধতির একটা প্রাচীন পন্থা ছিল। ১৮১১ সালে তিনি এক ক্যালরিমিটারও তৈরি করেন। এছাড়া দুটো বস্তুর মধ্যে খুব অল্প তাপমাত্রার ব্যবধান নির্ণয় করতে তিনি একটা থার্মোস্কোপও উদ্ভাবন করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখায় ব্যস্ত থাকতেন এবং "নেচার অ্যান্ড দি এফেক্টস অফ অর্ডার" নামে একটি রচনাও লিখেছিলেন। কিন্তু অকাল-মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করে। খুবই অল্প কয়েকদিনের অসুস্থতায় তিনি ১৮১৪ সালের ২১শে আগস্ট পরলোক গমন করেন।

রামফোর্ড একাধারে একজন দক্ষ গণিতজ্ঞ, নিষ্ঠাবান পর্যবেক্ষক ও তাপ ও আলোকের ক্ষেত্রে এক প্রবর্তক ছিলেন। ১৮১৬ সালে তাঁরই সম্মানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রেখে যাওয়া তাঁরই অর্থ দিয়ে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "রামফোর্ড অধ্যাপকবৃত্তি" প্রচলিত করা হয়। মানব কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানে তাঁর যে অবদান, তার কৃতিত্বস্বরূপ তাঁকে আজও জগতবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে।

জন ডালটন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৬—১৮৪৪)

রাজা ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বন্ধু-সভার" এক সভ্যের সামনে পরিধানের জন্য হাঁটু অবধি সুন্দর ভেলভেটের পাজামা, মসৃণ ও ঝকঝকে বগলস-আঁটা জুতো এবং উজ্জ্বল চকচকে তলোয়ার রাখা হয়েছে। কারণ যে প্রথাগত উৎসবে রাজা ষষ্ঠ জর্জ সেই সভ্যকে বিশিষ্ট গবেষণার জন্য সম্মানিত করবেন, সেখানে তাঁকে এই সমস্ত পোশাক পরিধান করে যেতে হবে। কিন্তু সভ্যের ধর্মবিশ্বাস তাঁকে এই সমস্ত পোশাক বা তরবারি পরতে নিষেধ করল। তাঁর কথা অন্য কোন সভাসদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। কি করা যায়? একদিকে রাজা সভায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। সভ্যের এই একগুঁয়েমীতে রাজা রাগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছেন। অপরদিকে এই সভ্য তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের ওপর সভার কোনও রকম আদব কায়দার হস্তক্ষেপ মানতে রাজী নন। এই সময় এক তরুণ মেধাবী রাজ-কর্মচারী এ থেকে সেই সভ্যকে রক্ষা করলেন। সেই তরুণ তাঁকে বললেন যে, তিনি যে পোশাক পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "অনারারী ডিগ্রী" আনেন সেই পোষাকটাই পরে যেন রাজার সামনে চলে যান। ফলে সেই সভ্যর গায়ে উঠে এলো একটা টকটকে লাল রঙের গাউন এবং সেটা পরেই তিনি অবশেষে রাজার সামনে হাজির হন। তাঁর গায়ে ঐরকম লাল রঙের গাউন দেখে অন্যান্য সভ্যদের তো প্রায় দমবন্ধ অবস্থা ; কারণ কোন সভ্যেরই ঐ রঙের পোশাক পরার অনুমতি নেই। কিন্তু সেই সভ্য বর্ণান্ধ থাকায়, তাঁর কৃত ভুল সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন।

যাইহোক, একজন দরিদ্র ইংরেজ তাঁতীর ছেলে হয়েও সেই সভ্যের রাজসভায় হাজির হওয়াটা সত্যিই এক স্মরণীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু তার থেকেও আরো বেশি স্মরণীয় এই সভ্যের নাম এবং তা হল, অন্যতম ইংরেজ রসায়নবিদ্ জন ডালটন। জন ১৭৬৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কাম্বারল্যাণ্ডের ঈগলস্‌ফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি তাঁর বাবা যোসেফ ডালটন ও শিক্ষক জন ফ্লেচারের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তাঁর সমবয়সী প্রায় অধিকাংশ ছেলেই সেই ছোট্ট গ্রাম ঈগলস্‌ফিল্ড পরিত্যাগ না করে সেখানকার মাটিতেই কোনক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করে কাটান। সেখানে জন ডালটন তাঁর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত অধ্যবসায় ও মেধার প্রাচুর্য দ্বারা জগতে এক বিশিষ্ট জ্ঞানীর স্থান

অধিকার করেন। তরুণ জন সে সময়ের চলতি প্রথা অনুযায়ী একজন অতিশয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রতিভার কথা অনেক দূর অবধি লোকের জানা ছিল। সেজন্য বারো বছর বয়সে জন যখন শূন্য গোলাবাড়ীতে তাঁর নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তখন লোক তাঁর কাছ থেকে আরো বেশী কিছু পাবার আশায় রইল। জন সারাদিন মাঠে কাজ করবার পর সন্ধ্যেবেলায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা পড়াতেন। লোকেরা তাঁর সংখ্যার প্রতি আগ্রহ, দুর্দান্ত কঠিন সব গাণিতিক সমস্যা সমাধান করবার দক্ষতা, পরীক্ষার জন্য বাড়ীতে তৈরি যন্ত্রের কথা এবং প্রত্যহ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করা স্তূপীকৃত নোটবইয়ের কথা সবই জানত। তারা নিশ্চিত ছিল যে জন ডালটনের জন্য ভবিষ্যতে এক বিরাট কিছু অপেক্ষা ক   ।- পরে একদিন ভবিষ্যতে তাদের এ ধারণা সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত হয়।

তবে এক সময় এ   মনে হয়েছিল যে, জন ডালটন বুঝি ঈগলসফিল্ডের চোরাবালিতেই ডুবে যাবে। তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই বুঝি নিষ্ফল হবে। তবে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে ডালটন অবশেষে ঈগলস্‌ফিল্ড থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১৭৮১ সালে কেণ্ডালে আসেন। সেখানে বারো বৎসর অধ্যাপনার পর ১৭৯৩ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে যান এবং সেখানকার কলেজের গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিল্পাঞ্চল ম্যাঞ্চেস্টারে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন আলোচনার অনেক সোসাইটি ছিল। এখানে এক সোসাইটিতে তিনি সদস্য পদে নির্বাচিত হন। পরের কয়েক বছরে এখানকার বিখ্যাত সদস্য হয়ে পড়েন এবং আলোচনা সভায় তাঁকে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে ডজন ডজন প্রবন্ধ পড়তে হোত।

এখানে তিনি বর্ণান্ধ সম্বন্ধে গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বর্ণান্ধ সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম আন্তরিক ভাবে গবেষণা করেন, জন ডালটন তাঁদের একজন। আজকের দিনেও এই ঘটনাকে প্রায়শই "ডালটনিজম" বলে অভিহিত করা হয়।

তবে ১৮০০ সালে তিনি প্রথম গ্যাসের প্রসারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। এই সম্বন্ধে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ফলস্বরূপ তাঁর বিখ্যাত "আংশিক চাপ সূত্র" আবিষ্কৃত হয়। এই সূত্র অনুযায়ীঃ "কোন গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ, মিশ্রণের আলাদা আলাদা সমস্ত উপাদানের পৃথক পৃথক চাপের যোগফলের সমষ্টির সঙ্গে সমান।" তাপমাত্রা এ চাপের পরিবর্তনের ফলে গ্যাসের ভৌত ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য, ডালটনের এই সূত্র ভিত স্বরূপ বিবেচনা করা হয়।

বায়ু ও বায়ু-চাপের ওপর তিনি প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিলেন। ফলে বায়ু নিয়ে তিনি নানান গবেষণা করতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর মনে পদার্থের

গঠনের একটা ধারণা জন্মে। ফলস্বরূপ তিনি তাঁর বিখ্যাত "পরমাণুবাদ" ব্যক্ত করেন। তিনি পরমাণু বা অ্যাটম কথাটা গ্রীক শব্দ "অ্যাটমস"এর অনুকরণে করেন। যার অর্থ অখণ্ড বা অবিভাজ্য। কারণ তিনি গ্রীক পড়তে পড়তে এক জায়গায় আবিষ্কার করেন যে, প্রাচীন গণিতজ্ঞ ডেমোক্রিটাস বস্তুর সম্ভবপর ক্ষুদ্রতম কণার নামকরণ করেন 'অ্যাটম' বলে। যাইহোক, তাঁর পরমাণুবাদের সারাংশঃ (১) সমস্ত বস্তুই অবিভাজ্য, সূক্ষ্মতম কণা পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং যতরকমের মৌল আছে ততরকমের পরমাণু আছে; (২) বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন। বিশেষ করে ওজনে এবং একই মৌলের সমস্ত পরমাণু একই রকমের; (৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সব পরমাণুই অংশ গ্রহণ করে; যৌগে পরমাণুগুলার পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র পুনর্বিন্যাস ঘটে; (৪) পরমাণু সৃষ্টি করাও যায় না, আবার ধ্বংস করাও যায় না; তাঁর মতবাদকে আরো বেশী পরিষ্কার করার জন্য তিনি প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর এক স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহার করতেন। যেমন, কার্বন পরমাণুর জন্য কালো বল, সাদা বল বোঝাতে অক্সিজেন পরমাণুকে। এছাড়াও তিনি মোটামুটি সঠিক একটা পারমাণবিক-ভর-তালিকাও প্রস্তুত করেন। তিনি সর্বোত্তম লঘু হাইড্রোজেনের পরমাণুর মান ধরেন '1'। ডালটনের এই তথ্য পরে অনেককেই প্রভাবান্বিত করে; যেমনঃ বার্জেলিয়াস, মেণ্ডেলিয়ার যিনি পারমাণবিক ভরের ওপর ভিত্তি করে মৌলের "পিরিয়ডিক টেবিল' তৈরি করেন, এবং মোসলে যিনি পারমাণবিক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে মৌলের "পিরিয়ডিক টেবিল তৈরি করেন, এছাড়াও আইনস্টাইন, ফার্মি প্রভৃতি পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের মূল ভিতও ছিল ডালটনের পরমাণুবাদ। কিন্তু কিছু কিছু ত্রুটিও ছিলঃ যেমন তিনি জানতেন না যে, একটা অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়। ফলে অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর '১৬'এর জায়গায় তিনি '৮' বার করেন।

পরমাণুবাদ ছাড়াও তিনি আরো অনেক আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথম বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিমাপ করেন এবং তা বায়ুর সংকোচনের ফলে সেটাও ব্যাখ্যা করেন; সমস্ত গ্যাসই উচ্চ চাপে এবং কম তাপমাত্রায় তরলে রূপান্তরিত করা যায় তা ১৮১১ সালে ব্যক্ত করেন। তিনিই প্রথম উদীচী ঊষা বা সুমেরু প্রভাব তড়িৎ ধর্ম আবিষ্কার করেন।

তাঁর কাজকর্মের জন্য ১৮১৭ সালে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার বিজ্ঞান সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ডালটন, অন্যান্য মহান বিজ্ঞানী বিসদৃশ, দেশবাসীরা তাঁকে ঘিরে প্রশংসাধ্বনি উপভোগ করতে খুব ভালবাসতেন। এজন্য ১৮২৬ সালে এক জনসভায় রাজার সামনে রয়্যাল সোসাইটির পদক তাঁকে প্রদান করা

হয়। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁকে ফরাসী অ্যাকাডেমীয়ে ডেস সায়েন্সেসের সদস্য পদে মনোনীত করেন। অবশেষে ১৮৪৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁর শবদেহ জাঁকজমক করে সমাধিস্থ করা হয় এবং সেই শোকানুষ্ঠানে দেশের হাজার হাজার জনতা বিনীত শ্রদ্ধায় শবানুগামী হন। ইংল্যাণ্ডের সর্বোত্তম কৃতী সন্তানের প্রতি সত্যিই সুন্দর মহান শ্রদ্ধা নিবেদন!

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে মৃত্যুর পরেও ডালটনের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের নোট বইটা আপ-টু-ডেট করা ছিল। যার দ্বারা তারই ব্যবহৃত কথা "নিখিল-বিশ্ব-সংক্রান্ত অধ্যাবসায়" প্রতিফলিত হয়। বস্তুত মৃত্যুর দিনেও তিনি টুকতে ভোলেন নি তাঁর শেষ পর্যবেক্ষণটা—প্রায় দু লাখ পর্যবেক্ষণের ওপর আরো একটা।

............জর্জেস কাভিয়ার............

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৯—১৮৩২)

দুজন ফরাসী মজুর মণ্টমার্টারের জিপসাম খনি খুঁড়তে খুঁড়তে কিছু একটা দেখে দুজনে দুজনের দিকে ভয়ে এবং বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। দেখা গেল যে বেলচা দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা বিরাট কঙ্কালের কিয়দংশ আবিষ্কার করেছে। কঙ্কালটা না মানুষের না অন্য কোন পরিচিত জন্তুর। বেলচার প্রত্যেক আঘাতে সেই অচেনা দৈত্যের কঙ্কালের অন্যান্য অংশগুলো ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করছে। দেখতে দেখতে অন্যান্য মজুররাও সেখানে ভীড় করে দাঁড়াল। এই দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে নানান অঙ্গভঙ্গ করতে লাগল। কঙ্কালটা কিসের হতে পারে তা নিয়ে নানারূপ কথাবার্তা চলতে লাগল। কঙ্কালটা কি কোন আদিম জন্তুর না কি বহুকাল পূর্বের কোন গুহা মানবের? কিন্তু কেউ কিছুই ঠিক করতে পারল না। তখন একজন প্রস্তাব করল যে কঙ্কালটা প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরের তরুণ প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক জর্জেস কাভিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক এবং তারই ফলস্বরূপ কাভিয়ার সেই জীবাশ্ম কঙ্কালটা তাঁর কাছে পেলেন।

জর্জেস লিওপোল্ড কাভিয়ার কঙ্কাল পরীক্ষার ব্যাপারে একজন আদর্শ লোক ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্যালিঅনটোলজি বা মেরুদণ্ডীদের তুলনামূলক অঙ্গ গঠনতন্ত্র বিদ্যা সম্বন্ধে সমগ্র ইউরোপে লিওপোল্ডের থেকে

কেউই বেশী জানত না। শুধুমাত্রই এই নয় অন্যান্য প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি সেকালের অনেকের থেকেই বেশী জ্ঞান রাখতেন। তাঁর এই জ্ঞানের কারণ হিসেবে, প্রথমতঃ তিনি নানান ধরণের বই পড়তেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ; এবং তৃতীয়তঃ তাঁর মা তাঁকে একজন অত্যন্ত চটপটে ও অতিশয় আগ্রহসম্পন্ন একজন পড়ুয়া তৈরি করেন।

জর্জেসের বাবা সুইস আর্মিতে একজন প্রাক্তন অফিসার থাকায় বাল্যকালে জর্জেসের ওপর একদম নজর দিতে পারতেন না। ফলে তিনি তাঁর মায়ের অধীনেই প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস, সঙ্গীত, অংকন ও বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু জর্জেসের প্রিয় বই ছিল জন্তু জগতের ওপর লেখা বাফনের ছত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত বইটা। তরুণ জর্জেসকে সব সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হোক বা গাড়ীতে চেপে যেতে হোক, এর যে কোন একটা খণ্ড পড়তে দেখা যেত।

সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে স্টাটগার্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে চারবছর ধরে পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি নরম্যাণ্ডির এক খেতাবধারী পরিবারে শিক্ষকের কাছ নেন। এই চাকরী তাঁর জীবনে প্রচুর সুফল এনে দেয়। কারণ প্রথমতঃ, নরম্যাণ্ডির সমুদ্রতীরে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম ও সামুদ্রিক প্রাণী পাওয়া যেত; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর নিয়োগকর্তার এক সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল, যার মধ্যে লিনেয়াসের বই "সিস্টেমা ন্যাচারা"ও ছিল; তৃতীয়তঃ, তিনি অ্যাবে টেসিয়ার নামে একজন বিশিষ্ট কৃষিবিদ্ ও জ্ঞানকে প্রতিবেশী হিসেবে পান। এবং ১৭৯৫ সালে টেসিয়ারের প্রভাবেই তিনি প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরে অ্যানাটমি অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৭৯৬ সালে কাভিয়ার ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীতে তাঁর গবেষণা প্রথম পেশ করেন। এতে তিনি ব্যক্ত করেন যে, প্রাচীন যুগের জন্তুদের সঙ্গে আজকের দিনের জন্তুদের এক বিরাট পার্থক্য আছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি জিপসাম খনি থেকে পাওয়া দুটো কংকালকে পুনর্গঠন করেন এবং দুটো বিশাল তৃণভোজী জীবের নমুনা তৈরি করেন। যেগুলো পৃথিবী থেকে কমকরেও পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এ দুটোর একটার নাম দেন "এ্যানোপ্লো-থেরিয়াম" (অস্ত্রবিহীন বন্য প্রাণী) এবং অপরটার নাম দেন "প্যালিও থেরিয়াম" (প্রাচীন বন্য প্রাণী)।

ফলে তাঁর নাম "জীবাশ্ম-কংকাল" ব্যক্তি হিসেবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ফ্রান্স থেকে লোকেরা তাঁর জন্য মানুষ, হাতী, তিমির কংকাল পাঠাতে লাগল। প্রত্যেকবারই যাদুঘরের গেটকীপাররা কাভিয়ারের গবেষণার জন্য গাড়ী গাড়ী, কংকাল যাদুঘরের সামনে রেখে দিত। তিনি প্রথম বিলুপ্ত পক্ষী

জাতীয় সরীসৃপ "টেরোড্যাক্টাইলের" হদিশ বার করেন। তাঁর এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে "প্যালিঅনটোলজি" একটা পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৯৮ সালে তিনি "টেবলস্ এলিমেনটেয়ার ডি এল' হিস্টোথরী ন্যাচারাল্লে ডেস এ্যানিমক্স" নামে একটা বই প্রকাশ করেন। এ বইয়ের মাধ্যমে মৌলিক টাইপের গঠন সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রাণী জগতকে পুনর্গঠন করেন। তাঁর মতে সমস্ত প্রাণী জগতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণী; শম্বুকজাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী (যেমনঃ শামুক, ঝিনুক); গ্রন্থিযুক্ত প্রাণী (যেমনঃ কাঁকড়া, পতঙ্গ); এবং রেডিয়েটেড প্রাণী (যেমনঃ প্রবাল কীট)। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক প্রজাতিই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও একটা নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করার জন্য তৈরি হয়েছে। কোন প্রজাতির সৃষ্টির জন্য অপর প্রজাতির কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ প্রজাতি সৃষ্টিতে বিবর্তন সূচক কোন পারস্পরিক সম্পর্ক হতে পারে না। এই মতবাদ নিয়ে তার পুরোনো বন্ধু, প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরের অধ্যাপক, এটিয়েন সেইন্ট হিলারীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। অবশ্য পরে ডারুইন তাঁর যুগান্তকারী বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করে জগতের কাছে এই মত বিরোধের মীমাংসা করেন।

কাভিয়ার একের পর এক সম্মানে বিভূষিত হতে লাগলেন। এর মধ্যেই তিনি জগতের একজন সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে সম্যক পরিচিতি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত "জার্ডিন ডেস প্ল্যান্টেসের" অধ্যাপক পদে এবং পরে "ইনস্টিটিউট ডি ফ্রান্সের" চিরস্থায়ী সেক্রেটারী পদে বহাল হন। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ান তাঁকে "ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটি"র কাউন্সিল পদে নিযুক্ত করেন এবং আলপস্ ও রাইন পর্বতমালার ওপারে ফ্রান্স দ্বারা সদ্য অধিকৃত জেলা-গুলোয় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে খবরাখবরের ভারও তাঁর ওপরে ন্যস্ত করেন। ১৮০৮ সালে তিনি ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীর একজন সদস্য পদে মনোনীত হন এবং পরের বছরই সরকার তাঁকে এর অন্তবর্তী কমিটির প্রধান পদে বহাল করেন। ১৮৩১ সালে লুইস ফিলিপ্পে স্টেটের কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পদে তাঁকে নিয়োগ করেন। ১৮২৮ সালে তিনি পঁচিশ বছরের গবেষণালব্ধ ফলগুলোকে একত্র করে বিশাল বই "ন্যাচারাল হিস্টোরী অফ ফিশ" প্রকাশিত করেন। এর মধ্যে পাঁচ হাজারেরও বেশী প্রজাতির বর্ণনা আছে। এ ছাড়াও তিনি প্যালিঅনটোলজি, জীবাশ্ম-কঙ্কাল এবং তুলনামূলক অঙ্গ গঠন তন্ত্রের ওপরও নানান বই লেখেন। অবশেষে ১৮৩২ সালে কলেরা রোগে এই মনীষির জীবনাবসান হয়।

কাভিয়ারের একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, যখন নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা তাঁর কোন ভুল দেখান হতো বা তিনি দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা মেনে নিতেন। এ সম্বন্ধে কথিত আছে বলে তাঁকে থামিয়ে দেন। সুতরাং বেঁচে থাকলে এবং ডারুইনের বিবর্তনবাদের সত্যতা দেখলে তিনি নিশ্চয় তাঁর সুমধুর, স্পষ্ট মন্তব্য পুনরাবৃত্তি করতেন।

..........আলেকজাণ্ডার ও হামবোল্ট..........

(খৃষ্টাব্দ ১৭৬৯—১৮৫৯)

তাঁর সমগ্র ভবিষ্যত যে আকার ধারণ করে, তার জন্য সঠিক দায়ী কোন সঠিক মুহূর্ত বা ঘটনা বা ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করা যায়, তাহলে জবাবে ফ্রেডরিখ আলেকজাণ্ডার ওন হামবোল্টের ক্ষেত্রে ওঁর প্রথম শিক্ষক, জোয়াচিম ক্যাম্পের নাম করা যায়; যিনি কিনা "রবিনসন ক্রুশোর" অনুবাদ করে আলেকজাণ্ডারকে দূরবর্তী অনেক জায়গার গল্প বলেন।

আলেকজাণ্ডার ওন হামবোল্ট, মেজর আলেকজাণ্ডার জর্জ ওন হামবোল্টের দ্বিতীয় ছেলে হিসেবে ১৭৬৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। আলেকজাণ্ডারের জন্মের সময় তাঁর বাবা কিংস চেম্বারলেইনের অফিস সদ্য ইস্তফা দেন এবং গ্রামের বাসস্থল ভেজেলে আসার মনস্থির করেন। ভেজেল, বার্লিন থেকে প্রায় আট মাইল দূরে হ্যাভেল নদীর তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত এক জায়গা। ১৭৬৯ সালে শুধুমাত্র আলেকজাণ্ডারই জন্মগ্রহণ করেন নি, নেপোলিয়ান ও ওয়েলিংটনও জন্মগ্রহণ করেন।

১৭৭৭ সালে ক্রিস্টিয়ান কান্থের কাছে মেজর হামবোল্টের দুই ছেলের পড়াশোনা আরম্ভ হয়। কান্থ আলেকজাণ্ডার ও তাঁর দাদাকে এই শিক্ষাই দেন যে মুখস্থ না করে প্রত্যেক জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করবে, পরীক্ষা করবে এবং তারপর নিজের মনে প্রশ্ন করবে। আলেকজাণ্ডার প্রথম থেকেই প্রাকৃতিক ইতিহাসের দিকে বেশী আগ্রহী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁকে প্রায়ই ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতি এবং পাথর সংগ্রহ করতে দেখা যেত। তাঁর এই সংগ্রহ অভ্যাস তিনি পরেও চালু রাখেন এবং এরই ফলস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি প্রায় ষাট হাজার গাছের নমুনা বর্ণনা করেন।

১৭৮৩ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর চার বছর পর, তাঁদের দুই ভাইকে গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের ভবিষ্যতে উন্নতি হয়। ১৭৮৯ সালে তাঁরা দুভাই তখনকার সেরা বিজ্ঞানকেন্দ্র গাটনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, দর্শন, সাহিত্য, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি জর্জ ফস্টারের সঙ্গে পরিচিত হন, যিনি ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় পৃথিবীব্যাপী অভিযানে প্রকৃতিবিদ হিসেবে সঙ্গী হন। ফস্টারের কাছ থেকে তিনি রোমাঞ্চকর সব অভিযানের বর্ণনা শোনেন এবং অনুপ্রাণিত হন। মাত্র দুমাসের এক ভ্রমণে তিনি একুশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "মিনার‍্যালজিক্যাল অবজারভেশনস অন সাম ব্যাসাল্টস অফ দি রাইন" প্রকাশিত করেন। এর মাধ্যমেই তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রকৃতির অন্তবর্তী সম্পর্কগুলোকে বোঝার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

পরিবারের মতানুসারে হ্যামবার্গের বাণিজ্যিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে হিসাব রক্ষণ ও হিসাব সম্বন্ধীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যা ও খনিকবিদ্যাও পড়তে থাকেন। পরে অবশ্য তিনি ফ্রেইবার্গের স্কুল অফ মাইনসে ভর্তি হন এবং গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক সূত্র, বীজের লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অঙ্কুরিত হওয়া ও খনির গাঢ়তম অন্ধকারে জন্মান উদ্ভিদের রং সবুজ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেন।

ফ্রেইবার্গে থাকাকালীন অবস্থায়, মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি ব্যাভারিয়া রাজ্যের ব্যারিয়ুথ খনির সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে যান। সেখানে খনির কাজকর্মের উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খনি অঞ্চলে জন্মান নানান উদ্ভিদও পর্যবেক্ষণ করতেন। খনির বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পরিবার ও খনি শ্রমিকের উন্নতির জন্য নানান সংগ্রাম করেন। তরুণ ও বৃদ্ধদের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, পেনসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এছাড়া খনি শ্রমিকের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার নিমিত্ত এক ধরণের শ্বাসযন্ত্রের উদ্ভাবনা করেন এবং ভূগর্ভস্থিত বিস্ফোরণের সন্ত্রাস হ্রাস করার জন্য এক ধরণের বাতিরও উদ্ভাবনা করেন।

১৭৯৬ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। ফলে জীবনে কোন পিছুটান আর থাকে না। সেজন্য ১৭৯৯ সালে এক তরুণ প্রকৃতিবিদ্ এ. জে. এ. বনপ্ল্যাণ্ডকে নিয়ে মাদ্রিদে যাত্রা করেন। সেখানে স্পেন সরকারের অধিকৃত আমেরিকান অঞ্চলের দিকে অভিযানের অনুমতি লাভ করেন। সেই বছরের জুন মাসেই "পিজারো" নামের ফ্রিগেটে চড়ে কিউবার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু জাহাজে এক

ধরণের জ্বর সংক্রামিত হওয়ায় তাঁরা কিউবার বদলে বর্তমান ভেনেজুয়েলাতে নামেন। তাঁদের এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে ভৌগোলিক পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা এবং প্রকৃতির বল কিভাবে একে অপরের ওপর ক্রিয়া করে; অর্থাৎ অন্যভাবে প্রকৃতির শক্তিগুলোর মধ্যেকার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা।

দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁরা নতুন ধরণের উদ্ভিদ, নতুন ধরণের বাসিন্দা, নতুন ধরণের ভৌগোলিক পরিবেশ দেখতে পান। তিন মাসের মধ্যে নানান বিপদ আপদকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা প্রায় এক হাজার ছ'শো গাছের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং ছ'শো নতুন প্রজাতির সন্ধান পান। এছাড়াও সেখানকার বাসিন্দা, জীব ও উদ্ভিদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ তালিকাবদ্ধ করেন।

১৮০১ সালে তিনি পেরু পরিদর্শন করেন। তিনি পেরুর অ্যানডেস পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়া চিমবোরাজেও ওঠেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভ্রমণের ফলস্বরূপ তিনি মেক্সিকোও পরিদর্শন করেন। এখানে এক জায়গায় সিঙ্কোনা গাছ পরীক্ষা করতে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। পরে ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে কুইনাইন এই সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকেই নির্মিত হয়। সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা গুয়ানো (জমির সার রূপে ব্যবহৃত সামুদ্রিক পাখির মল) সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন কারণ পেরুবাসীরা জমির সার রূপে এটা ব্যবহৃত করত। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। তবে তিনি শীতল পেরুভিয়ান স্রোতের পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করেন এবং পরে তাঁর নামানুসারে এটার নামকরণ করা হয় হামবোল্ট স্রোত।

মেক্সিকো পরিত্যাগের পর তিনি ফিলাডেলফিয়া ও ওয়াশিংটন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট জেফারসন ও আরো অনেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁদের সঙ্গে তিনি তাঁর কিছু কিছু পর্যবেক্ষণের ফল বিনিময় করেন এবং বদলে সরকারের গণতান্ত্রিক কাঠামোর এক সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন।

এই পাঁচ বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল প্রদক্ষিণ করে অবশেষে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন অমূল্য গবেষণালব্ধ ফল। পরের আরো তিরিশটা বছর ধরে তিনি তাঁর এতদিনকারের অযত্নে রক্ষিত তথ্যগুলোকে একত্রিত করে তিরিশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর বিষয় বস্তু ছিল ছ'টি: বিস্তৃত ভ্রমণ; জন্তুদের বর্ণনা; মেক্সিকোর ভূগোল এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি, তৎসহ ক্যালফোর্নিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা; জ্যোতির্বিজ্ঞান; উদ্ভিদ-ভূগোল এবং উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা। তাঁর লেখাগুলো

প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জোসেফ গে-লুসাকের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক সংযুতির পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর প্রভাব উত্তরসুরীদের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ডারউইন স্বীকার করে গেছেন হামবোল্টের "ন্যারেটিভ অফ ট্রাভেলস" তিনি বহুবার পড়েন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এই বইটাকে কৃতিত্ব দেয়া যায়। অগাসিজ, হামবোল্টের মহান সহযোগিতায় ১৮৩৩ সালে তাঁর "রিসার্চেস সুর লেস পয়জনস ফসিলেস" বই প্রকাশ করতে সমর্থ হন। এই সময়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, উরাল হ্রদ ও খনি দর্শনের জন্য রাশিয়ান সম্রাট নিকোলাসের আমন্ত্রণ হামবোল্ট স্বীকার করেন এবং ষাট বছর বয়সে অবশেষে তাঁর এই ভ্রমণ তিনি সম্পূর্ণ করেন।

তবে হামবোল্টের সেরা শিল্পকর্ম "কসমস", বিশ্বের একটা ব্যাপক বর্ণনা সম্বলিত এবং এছাড়াও সমস্ত প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের তাঁর যে দর্শন তাও এতে বর্ণিত আছে। তাঁর মতে সমস্ত বিশ্ব যেমন ছোট ছোট অসংখ্য উপাদান নিয়ে একটা বিশাল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তেমনই মানবজাতিকে তার চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য সবাই মিলে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। দাস বিকিকিনির বাজার যখন রমরমা, সে সময়ও তিনি লিখে গেছেন ঃ "...there are no inferior races. All are destined equally to attain freedom..........." যাইহোক কসমসের প্রথম দুটো খণ্ড ১৮৪৫ এবং ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এ দুটো খণ্ড জার্মাণ ও ফরাসী ভাষায় লেখেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। ঊননব্বই বছর বয়সে তিনি কসমসের পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত করেন। পরের বছরই অকাল মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করে। যেহেতু তিনি এক দীর্ঘ সময় পান, সেজন্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় তাঁর সেরা শিল্প সম্পূর্ণ করতে। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণকে একসঙ্গে এক সুসম মিশ্রণে রূপান্তরিত করেন। এছাড়া তিনি জীবদ্দশায় প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল, ভূবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব বিদ্যা, চৌম্বক বিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহবিদ্যা ও নৃবিদ্যা সম্বন্ধে নানান অবদান রেখে যান। তবে তিনি যখন ১৮৫৯ সালের ৬ই মে মারা যান, তখন তাঁর অনুশাসন—"Man must ever strive for all that is good and great !"—পরিপূর্ণ করে যান।

আন্দ্রে মেরী অ্যাম্পিয়ার

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৫—১৮৩৬)

১৮২০ সালে হ্যানস ক্রিস্টিয়ান ওরস্টেড বিজ্ঞানের এক বৈপ্লবিক শাখা—তড়িৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেন। সেই বছরই ১১ই সেপ্টেম্বর, ওরস্টেডের আবিষ্কার সংক্রান্ত চার পাতার খবরটা প্যারিসে "অ্যাকাডেমীয়ে ডেস সায়েন্সেসে" পড়ে শোনান হয়। ফলে পরের চারটি মাস ধরে অ্যাকাডেমীয়ের প্রায় সমস্ত সাপ্তাহিক বৈঠকগুলোতে ওরস্টেডের আবিষ্কারের বিকাশ সম্বন্ধেই শুধুমাত্র গবেষণা করা হোত। এই সময়ের মধ্যে তড়িতচৌম্বক বিজ্ঞানে সর্বোত্তম সক্রিয় বিকাশ সাধনের দান হিসেবে যদি কারুর অবদান উল্লেখ করা যায় তো তিনি হলেন একাকী, বিমর্ষ, গণিতজ্ঞ-বিজ্ঞানী আন্দ্রে মেরী অ্যাম্পিয়ার। ওরস্টেডের গবেষণা পড়ার পরের সাত দিনের মধ্যেই, অ্যাম্পিয়ার শুধুমাত্র ওরস্টেডের পরীক্ষাটাই যে পুনরায় সম্পন্ন করেন তা নয়; এই সময়ের মধ্যেই তড়িৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তাঁর নিজস্ব কিছু ধারণাও উৎপন্ন করেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতাও প্রমাণ করেন ও সবচেয়ে বড় কথা তড়িৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যে ১৭৭৫ সালের ২০শে জানুয়ারী, ফ্রান্সের লায়নসের শহরতলীতে আন্দ্রে মেরী অ্যাম্পিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। লায়নস শহর তখন ফরাসীদের একটা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং আন্দ্রের বাবা তখনকার একজন সফল শণ ব্যবসায়ী। তবুও তিনি তাঁর বাবার খুব ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে খুব অল্প বয়সেই ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য শেখান। কিন্তু তরুণ আন্দ্রের অঙ্ক শাস্ত্রের ওপর এক সহজাত প্রতিভা ছিল।

সেজন্য "ক্যালকুলাস" শেখার জন্য তিনি ভাল করে ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ত করতে লাগলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তাঁর তীক্ষ্ম ধীশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে তিনি ক্যালকুলাসকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করেন। কিন্তু আঠারো বছর বয়সে তাঁকে এক মর্মান্তিক বিয়োগান্ত দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় সেই সন্ত্রাসের রাজ্যে, তাঁর বাবাকে একজন রাজভক্ত বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং ফলে তাঁর বাবাকে বাড়ী থেকে টেনে বের করে নিয়ে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

এই ঘটনা তাঁকে এক নিদারুণ হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং সাময়িক ভাবে তিনি তাঁর ভাঁর ভারসাম্য হারান। এইভাবে প্রায় এক বছরেরও বেশী অতিবাহিত করার পর, রুসোর লেখা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর একটা বই দিয়ে তিনি জ্ঞানের জগতে আবার প্রত্যাবর্তন করেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে তিনি গল্প এবং কবিতার দিকেও ঝুঁকতে শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন ছদ্মনামে কয়েকটা কবিতাও লেখেন। কিন্তু বিপ্লবে তাঁর নিজস্ব অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁকে জীবন ধারণের জন্য রোজগার করতে বাধ্য হতে হয় এবং ফলে নিজস্ব পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রাইভেটে ছাত্রদের পড়াতে হয়।

তবে ১৭৯৯ সালে জুলী ক্যারনকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের গার্হস্থ্য, সম্পূর্ণ জীবনের শুরু হয়। এর এক বৎসর পরে তাঁর এক ছেলে হয়। তাঁর এই পুত্র, জাঁ জ্যাকুইস বাবার প্রতি সুনাম রেখে, একজন প্রথম সারির লেখক এবং ঐতিহাসিক হিসেবে ফরাসী অ্যাকাডেমীয়েতে সদস্যপদে মনোনীত হন। তাঁর এই নতুন দায়িত্বের ভার ঠিকমত বহনের জন্য, লায়নসের উত্তরে বর্গের জেসুট স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে, তাঁর প্রথম শিক্ষা সংক্রান্ত চাকরীতে তিনি যোগদান করেন। ইতিমধ্যেই তিনি বিজ্ঞানের এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৮০২ সালে তিনি তাঁর প্রথম গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনি পাস্কাল ও ফারমাটকে অনুসরণ করে "সম্ভাবনার" সূত্র ও খেলাধুলোর গাণিতিক সূত্র ব্যক্ত করেন। তাঁর এই মৌলিক গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে দুজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, ডেলামবের ও ল্যাল্যাণ্ডে, তাঁকে লায়নসের মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হতে সাহায্য করেন।

কিন্তু তাঁর জীবনে আবার নিস্তব্ধতা নেমে আসে। ১৮০৩ সালে তাঁর প্রিয় পত্নীর অকাল বিয়োগ ঘটে। তিনি আবার একাকী হয়ে যান। তাঁর জগৎ আবার শোকাকুল হয়ে ওঠে, যে অধ্যাপনার জগৎ তাঁকে একদা মধুর আনন্দ দান করত, সেই জগৎ থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কালের ইঙ্গিতে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ান. জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবশতঃ এক রকম জোর করেই অ্যাম্পিয়ারকে প্যারিসের ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ "ইকোলে পলিটেকনিকিউ"তে বহাল করেন। ১৮০৯ সালে তিনি এই কলেজেই বলবিদ্যা ও বৈশ্লেষিক গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁর বাকী বিজ্ঞানী জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন। জীবনের এই পর্যায়ে তিনি বিজ্ঞানের এক বিশাল ক্ষেত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর গবেষণাপ্রাপ্ত ফল তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর প্রকাশিত তত্ত্বগুলোর দিকে নজর

দিলেই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি বিজ্ঞানের কি বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হলঃ তড়িৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞান, গ্যাসের সূত্র আণবিক পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণী শারীরতত্ত্ব বিদ্যা, মনস্তত্ব বিদ্যা, পৃথিবীর থিওরী, বলবিদ্যার প্রয়োগ, অধিবিদ্যা ও ক্যালকুলাস। তাঁর এই সমস্ত গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি "ফ্রেন্চ অ্যাকাডেমী অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের জ্যামিতি শাখায় নির্বাচিত হন।

তবে তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার তড়িৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তাঁর এই সূত্র ওরস্টেডের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পর পরই ১৮২০ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সূত্র "অ্যাম্পিয়ারের সূত্র" নামে পরিচিত। এই সূত্রের মাধ্যমে, কোন সরল পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে তার মধ্যে যে চৌম্বক ধর্মের সৃষ্টি হয়, তার বৃত্তীয় গঠন এবং দিক নির্ণয় করা যায়। তিনি এরপর দুটো সরল পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চালনা করে প্রমাণ করেন যে, যদি দুই পরিবাহীর মধ্যে একই দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাহলে তারা উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে এবং একে অপরের বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হলে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। তিনি এ সম্বন্ধে একটা গাণিতিক সূত্রও আবিষ্কার করেন; যাতে করে তিনি পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ, দুই পরিবাহীর মধ্যেকার দূরত্ব এবং তাদের মধ্যেকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। সেই সূত্র আজও সঠিক বলে বহুল ব্যবহৃত হয়।

এরপর তিনি সরল পরিবাহী ছেড়ে বৃত্তীয় পরিবাহী অর্থাৎ "সলিনয়েড" নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ তিনি ব্যক্ত করেন যে, বৃত্তীয় পরিবাহীর দুই প্রান্তে দুই বিপরীত মেরুর উদ্ভব হয় এবং বৃত্তীয় পরিবাহীর পাক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার-চৌম্বক শক্তিও সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। চলতড়িতের প্রবাহের নানান ক্রিয়া লক্ষ্য করে অবশেষে ১৮২৩ সালে তিনি তড়িৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানের ওপর তাঁর বিখ্যাত মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী কোন স্থায়ী চুম্বককে চুম্বকত্ব উপস্থিতির জন্য কারণ হিসেবে তিনি আণবিক তড়িতের কথা বলেন। এটা ভেবে অবাক লাগে যে পরমাণুর তড়িৎ প্রকৃতি আবিষ্কারের প্রায় সত্তর বছর আগেই অ্যাম্পিয়ার এই ধারণার কথা বলেন।

এই মহান প্রতিভাবান সৃজনমূলক চিন্তাধারার অধিকারী, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীকে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য যথাযোগ্য ভাবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৩৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁরই নামানুকরণে চল-তড়িতের ব্যবহারিক

এককের নামকরণ করা হয় "অ্যাম্পিয়ার" এবং চল-তড়িতের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্রের নাম রাখা হয় "অ্যামমিটার", যা কিনা "অ্যাম্পিয়ার মিটারের" সংক্ষিপ্ত রূপ।

..........অ্যামেদিও অ্যাভোগ্যাড্রো..........

(খৃষ্টাব্দ ১৭৭৬—১৮৫৬)

১৮১১ সালের ফরাসী 'জার্নাল দি ফিজিকিউ"-এর সংস্করণটা প্রত্যেক গ্রাহক স্কলার ও বিজ্ঞানীর কাছে পেঁছে গেছে। তারা উল্টে দেখলেন ঃ দুটো প্রবন্ধ, একটা ছোট আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে সংকীর্ণ কলহ সম্পর্কিত। অন্যান্য প্রবন্ধগুলো নিয়মিত লেখকদের, তাদের লেখা দেখলে প্রায়ই মনে হয়, তারা গবেষণার চেয়ে বেশী সময় তাদের গবেষণা সম্বন্ধে লেখায় ব্যয় করে। জার্নালের প্রায় পেছনের পাতায় অণু ও পরমাণুর পার্থক্য সম্বন্ধে এক ইটালীয় অধ্যাপকের কিঞ্চিৎ আকর্ষণপূর্ণ কিছু মতামত, তারপরে "বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি" নির্মাতাদের কিছু বিজ্ঞাপন, ব্যাস শেষ। উল্লেখযোগ্য কোন প্রবন্ধ না থাকায়, গতানুগতিক সংখ্যা হিসেবে জার্নাল স্থান পেল বাজে কাগজের ঝুড়িতে, এবং পরে বিবর্ণ হলুদ হয়ে গেল। কিন্তু ১৮১১ সালের ঐ সংস্করণের পরিণতি বোধহয় অন্য কিছু ছিল। এই সংস্করণ পরে এত বিখ্যাত হয়ে দাঁড়ায় যে, এর প্রকাশের ঠিক একশো বছর পরে প্রত্যেক সভ্য দেশ থেকে প্রতিনিধি বিজ্ঞানীর দল ইটালীতে এই সংখ্যার একশো বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে যান। তাঁরা এসে পদার্থ প্রবন্ধকার ইটালীয় অধ্যাপক, অ্যামেদিও অ্যাভোগ্যাড্রোর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইটালীয় পদার্থবিদ্ অ্যামেদিও অ্যাভোগ্যাড্রো ১৭৭৬ সালের ৯ই জুন তুরিণে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তুরিণের একজন আইনজীবি হওয়ায় ছেলেকেও সেই মহান পেশার দিকে ঠেলে দেন। ফলে অ্যামেদিও আইন পড়তে শুরু করেন। ষোল বছর বয়সে তিনি চার্চ-আইনের ব্যাচেলার ডিগ্রী এবং কুড়ি বছর বয়সেই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করেন। আইনের এই জীবনে তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, অভিজাত ব্যক্তি ও পোপের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে আসেন। এটা এমনই একটা জীবন ছিল যাতে যে কেউ

সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও ব্যক্তিগত আইনশাস্ত্রে একঘেয়েমী, বিরক্তিবোধ করে তিনি পদার্থ, রসায়ন ও গণিত শাস্ত্র পড়তে শুরু করেন, বিজ্ঞানের কঠিন দুর্বোধ্য নীতিগুলোকে তিনি সহজেই আয়ত্ত করেন। ফলে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আরো বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানান ধরণের স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। এতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নজরে পড়ে যান। ১৮০৯ সালে উত্তর ইটালীর ভার্মেলীতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, এবং এইখানেই তিনি বিখ্যাত "অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র" আবিষ্কার করেন, যা ১৮১১ সালের এক সংস্করণে ব্যাখ্যা করেন।

অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র ঃ "চাপ ও তাপমাত্রা সমান থাকলে সমপরিমাণ যে কোন গ্যাসে অণুর সংখ্যা সমান", এছাড়াও তিনি ব্যক্ত করেন যে কোন গ্যাসের অণু, দুটো পরমাণু দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন অক্সিজেন অনু O_2 দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তিনি অণুর সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেন নি। ফলে তাঁর আবিষ্কারের স্বপক্ষে অকাট্য কোন প্রমাণ রেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে অণুর সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে এবং তাঁর সূত্র যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়েছে। আজকের দিনে এটা প্রমাণিত যে, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ($0^{\circ}C$ ও 76 সে. মি. পারদ স্তম্ভের চাপ) 1 ঘন সে. মি. যে কোন গ্যাসে অণুর সংখ্যা $2{\cdot}687 \times 10^{19}$ এবং এক গ্রাম আণবিক গ্যাসে অণুর সংখ্যা প্রায় $6{\cdot}023 \times 10^{23}$। পরের সংখ্যাটাকে বলা হয় "অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা"। এর পরে ১৮২০ সালে তিনি তুরিণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চতম পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বহাল হন। জীবনের বাকী কটা বছর তিনি এই পদেই থাকেন, অন্ততঃ ১৮৫৬ সালের ৯ই জুলাই পর্যন্ত। কারণ ওই দিন মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

১৮১১ সালের "জার্নাল দি ফিজিকিউ"-এর সেই অমূল্য কতিপয় কিছু সংস্করণ এখনও কিছু সংগ্রহ শালায় এবং কিছু সংগ্রাহকের কাছে আছে। এই সংস্করণগুলোই অ্যামিদেও অ্যাভোগ্যাড্রোর প্রশংসাপত্র। উপসংহারে শুধুমাত্র এটুকুই বলা যায় যে, অ্যামিদেও অ্যাভোগ্যাড্রো, পরমাণুর আধুনিক রাসায়নিক সূত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কার্ল ফ্রেডরিখ গস

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৭—১৮৫৫)

জার্মানীর ব্রানসউইকের একটা স্কুল। এই স্কুলেরই একটা ঘরে অঙ্কের একটা ক্লাস, অঙ্ক শিক্ষক ক্লাসের সমস্ত ছেলেকে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে দিয়েছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে এতে করে ক্লাসের ছেলেদের বেশ কিছু সময় ব্যস্ত রাখা যাবে। কিন্তু ভাবনা শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে দশ বছরের একটা ছেলে হাত তুলে তাঁকে জানিয়ে দিল যে তার হয়ে গেছে। কাছে এলে তিনি দেখলেন যে ছেলেটা সঠিক উত্তরই বের করেছে। তিনি ভাবলেন যে ছেলেটা হয়তো আগের কোন ছাত্রের থেকে উত্তরটা জেনে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে রেখেছে। কিন্তু ছেলেটা তাঁকে জানাল যে সে অঙ্কটা বীজগণিতের একটা সূত্রঃ "$S=\frac{n}{2}(n+1)$, যেখানে $n=$ যে কোন পূর্ণ সংখ্যা" ব্যবহার করেছে। উক্ত সূত্রে $n=100$ বসিয়াছে এবং মিনিটেরও কম সময়ে সঠিক উত্তর ৫,০৫০ বের করে ফেলেছে, এই দেখে শিক্ষক তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যান। সেদিনের সেই শিক্ষকই শুধু নন, সেই দশ বছরের ছেলে বড় হয়ে পরে প্রতিভায় সারা জগৎকে মুগ্ধ করেন এবং একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হিসেবে কার্ল ফ্রেডরিখ গস বিজ্ঞান জগতকে এক উজ্জ্বলতম নীহারিকাসম আলোকিত করেন।

কার্ল ১৭৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল, জার্মানীর ব্রানসউইকে, এক বিনয়ী রাজমিস্ত্রীর ছেলে হয়ে জন্মান। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিন বছর বয়স হবার আগেই তিনি নিজে নিজেই পড়তে শেখেন এবং মনে মনে এত ভাল পাটীগণিত করতে পারতেন যে ওই বয়সেই বেতন সংক্রান্ত বাবার হিসেবের একটা ভুল বার করেন। সাত বছরে পা দেবার আগেই তিনি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি "ইউক্লিডীয় জ্যামিতির" সমালোচনা করেন এবং তেরো বছর বয়সের "নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি"র সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। পনের বছরে অভিসারী শ্রেণীর ধর্ম বোঝেন এবং দ্বিপদ উপপাদ্য প্রমাণ করেন। গসের প্রতিভায় ব্রানসউইকের ডিউক মুগ্ধ হন এবং মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষার জন্য গসকে আর্থিক সাহায্য করেন, কিন্তু গসের বাবা এতে তীব্র আপত্তি

জানান। তাঁর মতে গস কলেজে সময় নষ্ট না করে বরঞ্চ শ্রমিক হয়ে অর্থোপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করুক। পরে অবশ্য গসের বাবা কোন মতে রাজী হন। ফলে গস নির্দ্বিধায় আবার পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি প্রথমে ভাষাবিদ্ হবার জন্য স্থির করেন এবং সেজন্য নানান ভাষা ও সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। কিন্তু গণিতের প্রতি দুর্বোধ্য এক আকর্ষণ তাঁকে অন্য এক পথে চালিত করে।

গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তিনি কম্পাস ও স্ট্রেটএজ দিয়ে এক সুষম সপ্তদশ ভুজ অংকন করেন। এই অংকনের কথা তিনি তাঁর এক অধ্যাপককে বলেন। কিন্তু সেই অধ্যাপক গসের কথা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু গস পরে প্রমাণসহ তা অধ্যাপকের সামনে হাজির করেন। সত্যের মুখোমুখি হয়ে তখন সেই অধ্যাপক দাবী করেন যে একই জিনিষ তিনি আগেই করেছেন। তা সত্বেও ১৭৯৬ সালের ৩০শে মার্চ গসকেই এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হয়। গণিত ইতিহাসে এই আবিষ্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কারণ প্রায় ২,২২০ বছরে সেই প্রথম ইউক্লিডীয় জ্যামিতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। এর পরে গস কম্পাস ও স্ট্রেটএজ দিয়ে অন্যান্য সুষম বহুভুজ নির্মাণের নীতি উদ্ভাবন করেন।

১৭৯৮ সালে কার্ল গটিঞ্জেন থেকে গ্র্যাজুয়েট হন এবং পরের বছরেই হেল্মস্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর ডিগ্রী লাভ করেন। অব্যবহারিক বিজ্ঞান ছাড়া আরো অন্যান্য বিষয়েও তিনি গবেষণা করেন। যেমনঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, পৃথিবীর ক্ষেত্রফল এবং আকার সংক্রান্ত বিজ্ঞান। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ভাষাও অনর্গল বলতে পারতেন, এমন কি ষাট বছর বয়সেও রাশিয়ান ভাষা করায়ত্ত করেন। ১৮০৭ সালে তাঁকে গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের পরিচালক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক করা হয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর "ডিসকুইসিসানস অ্যারিথমেটিকেই" প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি তাঁর সংখ্যার থিওরীর এক স্বচ্ছ, সরল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। এছাড়া তাঁর থিওরীর স্বপক্ষে যৌগিক সমীকরণ এবং অসীম শ্রেণীর অভিসারী ধর্মও তিনি এই বইতে আলোচনা করেন। এই সময়েই তিনি দুটো ছোট নতুন গ্রহ সিরিস ও প্যালাসের কক্ষপথ সঠিকভাবে নির্ণয় করেন এবং পৃথিবী থেকে আবার কবে দেখা যাবে তাও নির্ধারণ করেন। তিনি "থিওরী অফ এররস" সম্বন্ধেও গবেষণা করেন এবং সম্ভাবনার অভিলম্ব বক্রতলের আবিষ্কার করেন—যা "গসিয়ান বক্রতল" নামে পরিচিত এবং পরিসংখ্যানগত হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়।

১৮৩০ সালে নতুন তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্ব আঠারো শতকের মহাজাগতিক গতি-বিদ্যাকে সরিয়ে দেয়। গসই হচ্ছেন অন্যতম বিজ্ঞানী যিনি এই নতুন তত্ত্বের ওপর গবেষণা করেন। ১৮৩৩ সালে তিনি একটা তড়িত টেলিগ্রাফ তৈরী করেন, যেটা তাঁর বাড়ী ও বাড়ী থেকে সওয়া এক মাইল দূরে অবস্থিত মানমন্দিরের মধ্যে কাজ করত। চৌম্বকত্ব মাপার জন্য তিনি একটা ম্যাগনেটো মিটার তৈরি করেন এবং ওয়েবারের সঙ্গে একটি অ-চৌম্বকীয় মানমন্দিরের পরিকল্পনা করেন ও নির্মাণ করেন। এ ছাড়া তিনি একটা জার্মান চৌম্বকীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন যেটা পরে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল চৌম্বকীয় প্রক্রিয়াগুলোকে আরো বেশী সঠিক করে পর্যবেক্ষণ করা। গস এবং তাঁর ছাত্র রেইম্যান উভয়েই একটা তড়িৎ-চৌম্বকীয় সূত্র বের করেন যেটা অনেকটা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রেরই অনুরূপ। পরে অবশ্য ১৮৭৩ সালে ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চৌম্বকীয় সূত্র আবিষ্কার করেন। যদিও থিওরীর গাণিতিক ভিতটা গসই করে যান। ১৮৪০ সালে কার্ল আলোক বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেন। এই গবেষণায় তিনি একাধিক লেন্সের পদ্ধতির সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেন।

এছাড়া তিনি এক ধরণের যন্ত্র নির্মাণ করেন যা দিয়ে তিনি পৃথিবী তলের বিরাট অংশের ক্ষেত্রফল আকার ও বিন্দুর সঠিক অবস্থান এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের পরিবর্তনও নির্ধারণ করেন। এছাড়া স্থির তড়িতের ওপর তাঁর সূত্র আজও ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়।

আর্কিমিডিস, নিউটন ও গসকে সর্বকালের সেরা তিন গণিতজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এঁদের ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে একে অপরের থেকে পৃথক। আর্কিমিডিস খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একজন দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। অপরদিকে নিউটনের মেজাজ গসের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিউটন তাঁর আবিষ্কারের সমস্ত কিছুর পুরোপুরি কৃতিত্ব নিজেই দাবী করতেন। কিন্তু গস এদিক থেকে এতই নম্র ছিলেন যে তাঁর কিছু কিছু বিখ্যাত আবিষ্কার তাঁর মৃত্যুর পরে জানা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতবাদ ও উপবৃত্তীয় কার্যকরণের ওপর তাঁর সূত্র তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। কারণ তিনি এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন যে তিনি কিছু বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত বিষয় বস্তুর ওপর প্রায়ই অপরকে অগ্রাধিকার দাবী করতে দিতেন।

গস নতুন নতুন ধারণা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, তিনি সেগুলোকে তাঁর ডাইরীতে অথবা অসংলগ্ন কোন খোলা পাতায় লিখে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে রাখতেন। তিনি সব সময় নতুন নতুন মতবাদ আবিষ্কার করতেন কিন্তু সেগুলো প্রকাশনার জন্য সময় নষ্ট করতেন না। তিনি মনে করতেন যে বৈজ্ঞানিক জার্নালে তাঁর আবিষ্কারগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য সঠিক আকার দিতে গেলে বহু পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। সেজন্য তিনি যা কিছুই প্রকাশ করেন, তা বহু বার করে লেখেন। কারণ তিনি চাইতেন যে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো সঠিক, নিখুঁত হোক; এবং বাস্তবিকই সেগুলো সেরা, নিখুঁত ছিল। যেহেতু কার্ল তাঁর অনেক আবিষ্কারই প্রকাশ করেন নি, সেজন্যে দেখা যেত যে অন্যান্য অনেক গণিতজ্ঞই বহু পরিশ্রম করে সেই একই ফল আবিষ্কার করেছেন। কোন কোন সময় এও দেখা যেত যে, কোন কোন বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর কোন আবিষ্কারের পর দেখলেন যে কার্ল গস এর আগে ঐ একই সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই রকম একজন হলেন কার্ল জ্যাকোবি! জ্যাকোবি বহু বার গসের কাছে তাঁর নতুন সূত্র ব্যাখ্যার জন্য আসেন। প্রত্যেকবারই গস তাঁর ড্রয়ারটা খুলে জ্যাকোবিকে ঐ একই সূত্র সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র দেখান, যা এর আগেই গস আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

তবে নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্বন্ধে গসের আবিষ্কার প্রকাশ না করার মূলে অন্য এক কারণ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জ্যামিতি মানেই মহাকাশ জ্যামিতি ও ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বোঝাত এবং তা নির্দ্ধিধায় মেনে নেওয়া হোত সেজন্য যে কেউ ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে সরিয়ে তার নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করলেই, তৎকালীন জ্ঞানী লোকেরা তাকে নির্ঘাত পাগল বলে গণ্য করত। গস জনগণের বিদ্রূপকে প্রচণ্ড ভয় করতেন এবং সেজন্যই তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন না। এ সম্বন্ধে গস ফ্রেডরিখ বেসেলকে চিঠিতে লেখেন: "........he feared the clamor of the Boeotians'............ ।" তবে নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মতবাদ আছে। গসের মতবাদ অনুযায়ী ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° থেকে কম। রেইম্যানের থিওরী অনুযায়ী তা ১৮০° থেকে বেশী, এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুযায়ী তা ঠিক ১৮০°। গস তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে একটা পরীক্ষাও করেন। তিনি তিনটে লোককে তিনটে পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড় করান এবং প্রত্যেকে তার ও অন্য দুজন লোকের মধ্যেকার কোণ পরিমাপ করেন। এই তিনটে কোণের যোগফল দেখা যায় ১৮০° থেকে ২° কম। তবে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে কোন থিওরী সঠিক কারণ কোণ পরিমাপে ভুলের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। তবে গসও রেইম্যান উভয়ের থিওরী অনুযায়ীই, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যত ছোট হবে,

তত বার তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° কাছাকাছি হবে। তিনটে পাহাড়ের চূড়োর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের তুলনায় খুবই নগণ্য। সে কারণে মহাকাশের বিশাল ক্ষেত্রে নন-ইউক্লিডীয়ান জ্যামিতি ইউক্লিডিয় জ্যামিতির থেকে অনেক বেশী সঠিক। গস নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে, নাক্ষত্রিক জ্যামিতি নামেও অভিহিত করেন।

১৭৫৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, জার্মানীর গটিঙ্গেনে, ৭৭ বছর বয়সে কার্ল ফ্রেডরিখ গস পরলোক গমন করেন। তাঁর সমাধিস্তম্ভের উপর পাথরে তাঁর নিজেরই নির্মিত সপ্তদশভুজ খোদাই করা আছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সেরা গণিতজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর গণিতের ওপর অবদান পরে ভবিষ্যতে ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জটিল সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে এক বিরাট ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

.... স্যার হামফ্রি ডেভি ....

(খৃীষ্টাব্দ ১৭৭৮—১৮২৯)

১৮১২ সালের এক ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনা সমগ্র ইংল্যাণ্ডকে আতঙ্কিত করে তুলল। দুশো ফুট নীচে এক কয়লাখাদে ভয়ংকর অগ্নি দুর্ঘটনায় বিরানব্বই জন শ্রমিক মারা যায়। উদ্ধারকারীর দল ব্যর্থ হয় এবং আগুন নিভানোর জন্য খাদের মুখ সীল করে দেওয়া হয়। মৃত অথবা মৃতপ্রায় শ্রমিকের দল কয়লার নীচেই সমাধিস্থ হয়ে যায়। জনগণের ঘৃণামিশ্রিত রোষ থেকে বাঁচবার জন্য খনি মালিকেরা সেকালের ইংল্যাণ্ডের সেরা বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভির শরণাপন্ন হয়।

হামফ্রি ডেভি খনি মালিকদের এই আহ্বানে সাড়া দেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ খনি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পর দেখতে পান যে, খনি শ্রমিকদের মোমবাতি এবং ল্যাম্পের তাপে ভূগর্ভস্থ গ্যাস "ফায়ার-ড্যাম্প" (আধুনিক মিথেন) বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু ঐ গ্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউবে বিস্ফোরিত হয় না এবং এরই ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর বিখ্যাত "ডেভির নিরাপত্তা বাতি" উদ্ভাবন করেন। ফলে শত শত খনি শ্রমিকের জীবন রক্ষা পায়। কয়লা-খনি শিল্পে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে।

এই বাতি ইউরোপের সমস্ত খনিতেই ব্যবহৃত হতে থাকে। কৃতজ্ঞ খনি শ্রমিকদের, খনি মালিকদের এবং সরকারী অফিসারদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা বাণী দিনের পর দিন ডেভির কাছে স্তূপীকৃত হতে থাকে। ডেভির সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁকে বলা হয়ঃ "If your fame needed anything to make it immortal, this discovery alone would have carried it down to future ages".

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকারী নেতা ও শিল্প মালিকেরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য হামফ্রি ডেভির কাছেই বা যান কেন? তিনি এমন কি করেন যার জন্য তিনি তাদের আস্থাভাজন হন? কিভাবে তিনি তাঁর এই প্রতিভা শীর্ষে আরোহণ করেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তের দিকে একবার তাকাতে হবে।

১৭৭৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের পেনজান্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কাষ্ঠ-ভাস্কর এবং মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে যান। ডেভি একজন শল্যচিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত কারকের দোকানে প্রথমে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ঢোকেন। এই সময় থেকেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং যা কিছু উপাদান সংগ্রহ করতেন তাই দিয়েই বাড়ীতে পরীক্ষা করতেন। এই সময়েই ১৭৯৮ সালে তিনি একটা অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। তিনি থমাস বেড্ডাসের কাছে নিযুক্ত হন। থমাস বেড্ডাস বিভিন্ন গ্যাসের ভেষজ ধর্মের গবেষণার জন্য সেই সময়েই ব্রিস্টলে "মেডিক্যাল নিউমেটিক ইনস্টিটিউসন" স্থাপন করেন। ডেভি এই গবেষণাগারে প্রত্যেকটা গ্যাসই শুঁকে শুঁকে দেখতেন। এইরকম একবার নাইট্রাস অক্সাইড শ্বাস নিতে গিয়ে তিনি এক অবর্ণনীয় পুলক অনুভব করেন। তিনি এই গ্যাস দিয়ে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবদের ওপরও পরীক্ষা করেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা এই গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে আনন্দে হাসি, নাচ, চিৎকার করতে থাকেন। শোনা যায় যে তাঁর বন্ধু বিখ্যাত ইংরেজ কবি স্যামুয়েল কোলরিজ আফিমের আরক সেবন করে "কুবলা খান" কবিতাটা লেখেন। এটা হয়ত মনে করা যেতে পারে কোলরিজের এই ধরণের কার্যের পেছনে ডেভির রাসায়নিকের ভৌত ধর্মের গবেষণার প্রভাব কাজ করে। এছাড়া আশ্চর্যের বিষয় ডেভি কবিতাও লিখতেন এবং কোলরিজ এ সম্বন্ধে লেখেনঃ "If Davy had not been the first chemist, he would have been the first poet of his age." যাইহোক তিনি নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যবহারকে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে অনুভূতি নাশক হিসেবে প্রস্তাব করেন। কিন্তু এরও প্রায় চল্লিশ বছর পরে তাঁর এই

প্রস্তাব কার্যকরী হয়, যখন আমেরিকান ডেণ্টিস্ট ডঃ হোরেস ওয়েলস বস্তুতভাবে এই গ্যাসকে অনুভূতি নাশক হিসেবে ব্যবহার করেন।

এর পরে তিনি ভোল্টীয় কোষের নতুন "ইলেকট্রিক ফ্লুইডের" গবেষণায় নিজেকে নিয়োগ করেন এবং ১৮০৬ সালে রয়্যাল সোসাইটিকে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র পাঠান। এরই সুবাদে তিনি সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্যদের দ্বারা বেকার হলের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। এই বক্তৃতার বিস্তৃত প্রচার হয়। আকস্মিক ভাবে এই সময় ফ্রান্স (তখন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত) তাঁকে উপযুক্ত মনে করে তিন হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেন। এতে তিনি উৎসাহিত হয়ে তাঁর পরবর্তী আবিস্কারের দিকে নিজেকে নিয়োগ করেন।

পরবর্তীকালে তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্য তিনি পটাসিয়াম ও সোডিয়াম আবিষ্কার করেন। পরের কয়েক মাসের মধ্যেই আরো পাঁচটা ধাতু ঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বোরণ, বেরিয়াম এবং সোডিয়াম; আবিষ্কার করেন। একই বছরে রাসায়নিক আকর্ষণের তড়িত প্রকৃতির ওপর গবেষণা করেন এবং এই সম্বন্ধে "অন সাম কেমিক্যাল এজেন্সীস অফ ইলেকট্রিসিটি" নামে একটা বইও করেন। এর পরে তিনি ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে গবেষণার কথা ব্যক্ত করেন এবং সিলভারের যৌগের সাহায্যে ছবি তোলার কথাও প্রস্তাব করেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হিসেবে ফ্লোরিন ও ক্লোরিন মৌল আবিষ্কার করেন। সেই সময় হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডকে "মিউরিয়াটিক এ্যাসিড" বলা হোত। এবং ল্যাভসিয়ার ও অন্যান্যরা মনে করতেন হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ও অক্সিজেনের মিশ্রণ (কারণ ল্যাভসিয়ারের মতে সমস্ত অ্যাসিডের মধ্যেই অক্সিজেন থাকে) থেকে ক্লোরিন পৃথক করা সম্ভব। কিন্তু ডেভি প্রমাণ করেন যে ক্লোরিন একটা মৌল এবং এতে কোন অক্সিজেনই থাকে না। ফলে রসায়নের অভিধান থেকে 'অক্সি-মিউরিয়াটিক' এ্যাসিড অন্তর্হিত হয় এবং ডেভির "ক্লোরিন" জায়গা নেয়।

১৮১২ সালে তিনি "স্যার" উপাধিতে ভূষিত হন। এরপর বিয়ে করে, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপের গবেষণাগারে জয়যাত্রায় বের হন। সঙ্গে তাঁর সহকারী মাইকেল ফ্যারাডেও ছিলেন। জয়যাত্রায়, ফ্রান্সে তিনি গে-লুসাকের সদ্য আবিষ্কৃত আয়োডিনকে ক্লোরিনের প্রায় সমধর্মী মৌল বলে প্রমাণ করেন; জেনোয়ায় টর্পেডো মাছের তড়িত প্রকৃতি নির্ধারণ করেন; এবং ফ্লোরেন্সে হীরার সঙ্গে অক্সিজেনের দহন ক্রিয়াও পরীক্ষামূলক ভাবে দেখান। সুতরাং

দেখা যায় যেখানেই তিনি যান সেখানেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ প্রকাশ করেন এবং এই কারণেই তিনি ইংল্যাণ্ডের সেরা রসায়নবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

সুতরাং এখন বোঝা যাচ্ছে যে কেন সরকারী অফিসারগণ ও খনি-মালিকরা বিপদে পড়ে তাঁর শরণাপন্ন হন। তিনি যে সেই বিপদের কিভাবে মোকাবিলা করেন তাতো আগেই বলা হয়েছে! তাঁর আবিষ্কৃত "ডেভির নিরাপত্তা বাতি" মানবিক সেবায় নিঃসন্দেহে একটা বিশাল অবদান। অবশেষে ১৮২৯ সালে এই মনীষির মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর সমাধি স্থলে আজও খোদাই করা আছে একটা অনুলিপি: প্রকৃতির রহস্যের মহান আবিষ্কারক।

..........জোসেফ লুই গে-লুসাক..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৮—১৮৫০)

১৮০৪ সাল। ফ্রান্সের এক শহরে ফরাসী জনতার ভীড় যেন উপচে পড়েছে। জনতার ভীড় সামলাতে ফরাসী পুলিশবাহিনী হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। লোক যেন উৎসব দেখতে জমা হয়েছে। কি ব্যাপার! না, দুজন তরুণ ফরাসী বিজ্ঞানী বেলুনে চড়ে ওপরে উঠবেন। কিছুক্ষণ পরেই দুই তরুণ বিজ্ঞানী তাঁদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ধীরপায়ে বেলুনের সঙ্গে বাঁধা একটা কাঠের বাক্সে উঠে বসলেন। বেলুনটা একটা কাপড়ের তৈরি বিশাল এবং তা বায়ুর থেকে হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ। যাইহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুন হাজার হাজার জনতার সামনে থেকে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ খানিকটা ওপরে উঠবার পর এদের একজনের মনে এক অজানা ভয় সঞ্চারিত হল। কি জানি বাবা, বেলুনটায় যদি বিস্ফোরণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বা এটা যদি মাঝ সমুদ্রে অবতরণ করে! কিন্তু না কিছুই হল না। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গেই মাটিতে অবতরণ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আরোহীদ্বয়ের একজন জোসেফ গে-লুসাক, বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর ভবিষ্যত জীবন শুরু করেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন জাঁ বায়ট।

জোসেফ গে-লুসাক ফ্রান্সের সেণ্ট লিওনার্দোয় ১৭৭৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি এক ভীষণ বিশ্লেষণগত

মনের অধিকারী ছিলেন, সেটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো পরিণত হয়। বিজ্ঞানে ঝোঁক থাকাতে ১৭৯৭ সালে প্রথম প্যারিসের 'ইকোলে পলিটেকনিকিউতে" এবং পরে আরো বেশী উন্নত "ইকোলে ডেব পন্টস এট চৌসেসে" পড়াশোনা করেন। তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রবণতায় মুগ্ধ হয়ে ল্যাভসিয়ারের সহকর্মী, বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ বার্থোলেট, জোসেফকে তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন! ১৮০২ সালে তিনি "ইকোলে পলিটেকনিকে" পরীক্ষার ব্যবহারিক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতির অসাধারণত্বের জন্য পরে সেখানেই তিনি রসায়নে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

গ্যাসের ওপর তাঁর এক স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল! এছাড়া যদিও তিনি মূলত একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রথম দিককার গবেষণার প্রকৃতি ছিল রাসায়নিকের চেয়ে বেশী ভৌত-ধর্মীয় ভিত্তিক। যাইহোক ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমির সাহায্যে জাঁ বায়টকে সঙ্গে নিয়ে জোসেফ ১৮০৪ সালের ২৪শে আগস্ট বেলুনে করে প্রায় চার হাজার মিটার (প্রায় আড়াই মাইল) উর্ধ্বে ওঠেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য খুঁজে পান না। সন্তুষ্ট না হয়ে সেই বছরের ১৬ই সেইপ্টেম্বর আবার ওঠেন। এবারে প্রায় ৭,০১৬ মিটার (সওয়া বার মাইলের কিছু বেশী) পর্যন্ত ওঠেন। পৃথিবীর চৌম্বকত্বের কোন প্রভাবের কোন হেরফের ওই উচ্চতায় দেখতে পান না এবং প্রথমবারের মতই এবারের বায়ুমণ্ডলের কোন বিশেষ তারতম্য খুঁজে পান না।

১৮০৪ সালে তিনি বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ হামবোল্টের সঙ্গে জলের আয়তনিক বিশ্লেষণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে জলের মধ্যে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন থাকে। এই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ১৮০৮ সালে তিনি তাঁর "গ্যাস আয়তন সূত্র" আবিষ্কার করেন। এই সূত্র বলে ঃ দুই বা ততোধিক গ্যাসীয় পদার্থ বিক্রিয়া করে যদি গ্যাসীয় পদার্থই উৎপন্ন করে, তাহলে একই (অর্থাৎ চাপ, তাপ সমান) অবস্থায় বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন ও বিক্রিয়াজাত গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন সর্বদা সরল অনুপাতে থাকে।"

যেমন, $H_2 + Cl_2 = 2HCl$
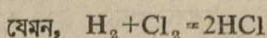
(হাইড্রোজেন) (ক্লোরিন) (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড)

এদের অনুপাত, 1 ঃ 1 ঃ 2

বিজ্ঞানের জগতে গে-লুসাকের আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান—গ্যাসের

আয়তন ও তাপের পারস্পরিক সম্পর্ক। তিনি বলেন যে, চাপ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কোন গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ঐ গ্যাসের O°C তাপমাত্রার আয়তনের $\frac{1}{273}$ অংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। অর্থাৎ সূত্র অনুযায়ী,

$V_t = V_o \left(1+\frac{t}{273}\right)$ যেখানে V_t = t°C তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন

V_o = O°C ,, ,, ,,

t = তাপমাত্রা ।

এখান থেকে দেখা যায় যে কোন গ্যাসের তাপমাত্রা যদি সেণ্টিগ্রেড স্কেলে —273° হ্রাস করা যায় তাহলে তার আয়তন দাঁড়ায় শূন্য। এরই ওপর ভিত্তি করে লর্ড কেলভিন তাঁর বিখ্যাত "চরম তাপমাত্রার স্কেল" নির্ণয় করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্যাসকে তাপমাত্রা হ্রাস করলে তা প্রথমে তরলে এবং পরে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। এই একই সূত্র কিন্তু একজন ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস একই সময়ে উদ্ভাবনা করেন, এবং এটা চার্লসের সূত্র নামেই পরিচিত। এই সূত্রের অপর বক্তব্য ঃ "চাপ অপরিবর্তিত থাকলে, কোন গ্যাসের আয়তন উহার চরম স্কেলে তাপমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক।" তবে তিনি গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার সম্বন্ধেও সূত্র নির্ণয় করেন এবং তা "গে-লুসাকের সূত্র" নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী ঃ "কোন গ্যাসের আয়তন স্থির থাকলে তার চাপ, তার চরম স্কেলে তাপমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক।"

১৮০৮ সাল থেকে কিন্তু তাঁর গবেষণা ভৌত ধর্ম ছেড়ে রাসায়নিক ধর্মের দিকে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এই সময় তিনি থেনার্ডের সঙ্গে গবেষণা করে পটাশ (পটাশিয়াম কার্বনেট, K_2CO_3) থেকে লালতপ্ত লোহার (Fe) সাহায্যে বিজারণ দ্বারা পটাসিয়াম (K) মৌল পৃথক করেন। এরপরে পটাসিয়ামের বিস্তৃত ধর্ম গবেষণা করে, পটাসিয়ামের সাহায্যে বোরিক অ্যাসিড থেকে বোরণকে পৃথক করেন। ১৮০৯ সালে তিনি ক্লোরিনের ওপর কিছু গবেষণা করেন এবং ১৮১১ সালে আয়োডিন আবিষ্কার করেন। এছাড়া থেনার্ডের সঙ্গে কাজ করার সময় পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) ও কপার অক্সাইডের (Cu_2O) জারণ ক্ষমতার প্রয়োগ করে তিনি জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নত করেন এবং এই পদ্ধতিতেই অনেক বিশেষ জৈব যৌগের উপাদান নির্ণয় করেন।

তাঁর শেষ বিশিষ্ট রাসায়নিক গবেষণা—প্রুসিক অ্যাসিড সংক্রান্ত। প্রুসিক অ্যাসিড একটি মারাত্মক বিষ ; এর রাসায়নিক নাম হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড।

এই যৌগই গ্যাস হিসেবে ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান কোয়েণ্টিন জেলের গ্যাস চেম্বারে আগে ব্যবহৃত হোত। এই অ্যাসিডের এক লবণ, পটাসিয়াম সায়ানাইড (KCN), আজকের পৃথিবীতে মানুষের দ্রুততম ঘাতক হিসেবে সুপরিচিত। ১৮১১ সালে তিনি এই হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের ভৌত ধর্ম বর্ণনা করেন এবং ১৮১৫ সালে এর ফরমুলাও নির্ণয় করেন। এই ফরমুলা নির্ণয়কালে তিনি ব্যক্ত করেন যে সায়ানোজেন যৌগে দুটো সায়ানাইড র‍্যাডিক্যাল থাকে। সায়ানাইড র‍্যাডিক্যালে একটা কার্বন পরমাণু ও একটা হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং তার ফরমুলা (CN)। প্রুসিক অ্যাসিডের ফরমুলা (HCN)। ফলে এটা প্রমাণিত হল যে, অ্যাসিডে হাইড্রোজেন অপরিহার্য, অক্সিজেন নয়। ফলে ল্যাভসিয়ারের অক্সিজেন অপরিহার্য অ্যাসিডের মতবাদ বাতিল হয়ে যায় যদিও কিছু কিছু অ্যাসিড আছে যার মধ্যে অক্সিজেন আছে, কিন্তু হাইড্রোজেনই হচ্ছে অ্যাসিড নির্ধারক মৌল।

১৮১৮ সালে সল্টপিটার (KNO_3) থেকে নির্মিত গানপাউডারের গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী অফিসে এক সদস্যপদে নিযুক্ত হন। সেই বছরই সালফিউরিক অ্যাসিডের নির্মাণ পদ্ধতির উন্নতিবিধান করেন। ১৮২৯ সালে অক্সালিক অ্যাসিডের নির্মাণ পদ্ধতিরও উন্নতিবিধান করেন, এবং তা ব্যবহৃত ক্লোরিণের ওপর উন্নত নিয়ন্ত্রণ করে। ১৮৩০ সালে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড দ্রবণ তৈরী করে সিলভারের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করায় এক উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই সময়েই জৈব পদার্থ বিশ্লেষণের আরো উন্নতি করেন এবং জাস্টাস ওন লিবিগের সাহায্যে ফালমিনিক অ্যাসিড (HONC) এক দারুণ বিষাক্ত পদার্থ এবং এর পারদ লবণ উচ্চ বিস্ফোরক ক্ষমতা থাকায় গুলি এবং কার্তুজে ব্যবহৃত হয়। তাপ অথবা শকেই এটা বিস্ফোরিত হয়।

তাঁর দীর্ঘ প্রতিভাময় জীবনে জোসেফ লুইস গে-লুসাক সরকারী এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হন। তিনি সরবোনের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে এবং জার্ডিন ডেস প্ল্যাণ্টেসে রসায়ন-অধ্যাপক পদে বহাল হন। তিনি শিল্প ও নির্মাণের জন্য ফরাসী মন্ত্রক কমিটির এক সদস্য পদে বহাল হন এবং ফ্রান্সের টাঁকশালের ধাতু পরীক্ষার প্রধানের পদেও নিযুক্ত হন। অবশেষে ১৮৫০ সালের ৯ই মে তিনি বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর এই মৃত্যুতে জগতের সমস্ত বিজ্ঞানী ও ফরাসীবাসী শোক পালন করে।

...........ব্যারন জ্যাকব বার্জেলিয়াস.............

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৯—১৮৪৮)

১৮৩৫ সালের কোন এক সময় সুইজারল্যাণ্ডের এক গীর্জায় এক বিবাহ-সভা। বিবাহের জন্য বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান এক দম্পতি। পাত্র ছাপ্পান্ন বছরের এক বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট, মোটামুটি সুদর্শন এক বিজ্ঞানী। পাত্রী চব্বিশ বছরের এক সুন্দরী তরুণী। পাত্র তো নার্ভাস। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে; চোখ মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। ভাবছেন কখন এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। কারণ এই বয়সে প্রথম বিয়ে করার জন্যই বোধ হয় এই অবস্থা। ভাবছেন কখন আবার "মহিলা বিহীন রাজ্য", তাঁর গবেষণাগারে গিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। ছোট্ট জীবনের এই ব্যাপারে নার্ভাস হলেও বিশাল বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি প্রচুর অবদান রেখে যান।

সুইডেনের এই বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস শুধুমাত্রই সুইডেনের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই নয়, সম্ভবত তদানীন্তন জগতের এক সেরা রসায়নবিদ্‌ও ছিলেন। তাঁর অধীনে সুইডেনের রাজা ও যুবরাজ শিক্ষালাভ করেন; রাশিয়ার জার তাঁর কাছে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান; রাজা চতুর্দশ চার্লস তাঁকে "ব্যারণ" উপাধি প্রদান করেন। তিনি এইসব বিশিষ্ট সম্মান, বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য প্রাপ্ত হন। তাঁর অবদানের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট অবদান—রাসায়নিক জগতে, রাসায়নিক মৌল ও যৌগের এক সার্বজনীন চিহ্ন সঙ্কেতের প্রবর্তন, যা আজও সন্দেহাতীত ভাবে প্রচলিত। বার্জেলিয়াসের পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রত্যেক মৌল তার ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষরের বড় হরফ দ্বারা সূচিত হয়। যেক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর এক সেখানে প্রথম অক্ষরের বড় হরফের পরে দ্বিতীয় অক্ষরের ছোট হরফ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কার্বনের চিহ্ন C কিন্তু ক্যাডমিয়ামের চিহ্ন Cd, ক্যালসিয়ামের Ca ইত্যাদি। ঠিক একইরকম ভাবে যৌগ ও সঙ্কেতের দ্বারা সূচিত হতো, উপাদানগুলোর চিহ্ন পাশাপাশি বসতো। যেমন, জল HOH (আধুনিক H_2O), কার্বন-ডাই-অক্সাইড OCO (আধুনিক CO_2)।

আজকে এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত হলেও, সেকালে তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি ডালটনের মতো বিজ্ঞানীও তাঁর এই ব্যবস্থাকে

'ভয়ঙ্কর' বলে বর্ণনা করেন। আস্তে আস্তে তাঁর এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতে থাকেন এবং আজকে তা সর্বজন স্বীকৃত।

তাঁর এই আবিষ্কারের অন্যতম এবং সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রসায়ন শাস্ত্রকে একটা সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সহজ সরল রূপ প্রদান। তার আগে কোন্ চিহ্ন দিয়েছিল গ্রীকরা, কোনটা বা দেয় ইজিপ্টবাসীরা। আবার কোনটা বা দেয় প্রাচীন অ্যালকেমিবিদরা। কারুর সঙ্গে কারোর কোন মিল ছিল না। এমন কি এক পারদকে চিহ্নিত করার জন্যই প্রায় পঁয়ত্রিশটা ভিন্ন নাম ও কুড়িটা পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হোত।

বার্জেলিয়াসের প্রাকৃতিক জগতের প্রতি আজীবন আগ্রহ এই সমস্যাকে সমাধান করে। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তিনি বৈশ্লেষিক রসায়নের দিকে তাঁর মনঃসংযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। এজন্য এক অধ্যাপকের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে গবেষণাগারে অতিরিক্ত সময় থাকার অনুমতি আদায় করে নেন এবং এতদূর এ ব্যাপারে অগ্রসর হন যে এক লুক্কায়িত পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর দৈনন্দিন অন্য সব কাজও বাদ দিয়ে দেন।

গ্র্যাজুয়েসান ডিগ্রি পাবার পর জীবন ধারণের জন্য উপার্জনের নিমিত্ত তিনি চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর রোগীরা গরীব হওয়ায়, তাঁকে ফুল-টাইম গবেষণার জন্য অর্থনৈতিক স্থিতি আনতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অর্থ জমাতে দীর্ঘ কুড়ি বছর অপেক্ষা করতে হয়। এরই মধ্যে একবার খনিজ লবণ মিশ্রিত ঝরণার জলের ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁর অতিকষ্টে সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হয় এবং পরের বার আবার একটা ভিনিগারের কারখানা করতে গিয়ে ক্ষতি হয় এবং দেনায় জড়িয়ে পড়েন। এই দেনা শোধ করতে তাঁকে দীর্ঘ যন্ত্রণাময় দশটা বছর কাটাতে হয়। তাঁর ক্ষতি পুনরুদ্ধারের আশায়, তিনি একবার বিজ্ঞানের নতুন রোমাঞ্চকর জগতের ওপর প্রকাশ্য বক্তৃতার এক সিরিজের আয়োজন করেন। কিন্তু দেখা যায় যে দর্শক শূন্য প্রেক্ষাগৃহে বিধ্বস্ত, আশাহত বার্জেলিয়াস এবং সেই সঙ্গে জোঁকের মত একদল বিল আদায়কারী। তবে এই দুর্যোগেও তিনি কিন্তু গবেষণা ছেড়ে দেননি। এই সময়ও তিনি ভোল্টার চাপ তড়িতের আবিষ্কার পড়ে, জৈব দেহের ওপর তড়িতের বিক্রিয়া সম্পর্কে একক গবেষণায় রত হন এবং তড়িৎ শক্তি দ্বারা নতুন মৌলের পৃথক করার সম্ভাবনাও ইঙ্গিত করেন।

তবে স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-অধ্যাপকের পদে নিয়োগেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। এখানে তিনি গবেষণাগার, অর্থানুকূল্য এবং বিভিন্ন বিদেশী বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান পান।

বার্জেলিয়াসের নাম বিজ্ঞানী মহলে ছড়াতে লাগল। এই সময় তিনি থোরিয়াম, সিরিয়াম এবং সেলেনিয়াম মৌলের আবিষ্কর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনিই প্রথম অনিয়তাকার সিলিকন তৈরি করেন ও প্রথম জারকোনিয়াম মৌল পৃথক করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়ে না। গবেষণাগার বিস্ফোরণে তাঁকে বেশ কয়েক মাস হাসপাতালে কাটাতে হয় এবং অল্পের জন্য অন্ধ হতে হতে বেঁচে যান। এই সময় তিনি এক নৃশংস মাথার যন্ত্রণার কবলে পড়েন এবং বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে তাঁর যন্ত্রণার জন্য চাঁদের কলার কোনরকম গভীর সম্পর্ক আছে। হয়ত মনে হবে যে এটা তাঁর মনের স্নায়বিক বিকার কিন্তু পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় ঠিক সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তিনি এক প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতেন।

বার্জেলিয়াসের শেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় রসায়ন জগতের একজন প্রবর্তক হিসেবে তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচিতি আত্মপ্রকাশ করে। ১৮২৬ সালে অনুন্নত এক গবেষণাগারে, অশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে তিনি অনেক মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন এবং প্রায় দু' হাজারেরও বেশী রাসায়নিক পদার্থের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর নির্ণেয় পারমাণবিক গুরুত্ব যে কতো বেশী সঠিক ছিল তা নীচের তালিকাটা দেখলেই বোঝা যাবে।

মৌল	পা গুরুত্ব ডালটন—১৮০৮	পা গুরুত্ব বার্জেলিয়াস—১৮২৬	পা গুরুত্ব আজকের দিনে
কপার (তামা)	৫৬	৬৩·০০	৬৩·৫৪
লেড (সীসা)	৯৫	২০৭·১২	২০৭·২১০
নাইট্রোজেন	৫	১৪·০৫	১৪·০০৮
সালফার (গন্ধক)	১৩	৩২·১৮	৩২·০৬৬

এর পরে কিন্তু বার্জেলিয়াসের জীবনে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা আসে। তিনি "সুইডিস একাডেমী অফ সায়েন্সের" সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। এছাড়া অধ্যাপনা এবং লেখা থেকে পারিশ্রমিক ও রয়্যালটি হিসেবেও অতিরিক্ত অর্থ আসতে থাকে। তবে অসুস্থ শরীর এবং একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য তিনি এ সময়ে বিয়ে করতে মনস্থির করেন এবং এরই জন্য তাঁকে এই গল্পের প্রথমে ওই নার্ভাস অবস্থায় দেখা গিয়েছে।

জীবনের শেষ বারোটা বছর তিনি সুখে এবং কর্মময় অবস্থায় কাটান।

তিনি নানান অফিসিয়াল পদে সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন। তবে বার্জেলিয়াস পরিপূর্ণ আনন্দ তখনই লাভ করেন যখন তাঁর নতুন বাড়ীটা সদ্য বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণাগার রূপে তিনি রূপান্তরিত করেন। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সুইডেনের বেশ কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জনস বার্জেলিয়াসের এই মহানুভবতার কাছে বেশ ঋণী, যেমন আজকের বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজ তাঁর অবদানের কাছে ঋণী।

............জর্জ সাইমন ওহম..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৮৭—১৮৫৪)

কলোগ্নের জেসুট কলেজের অঙ্ক ও বিজ্ঞানের এক বৈশিষ্ট্যহীন, আটত্রিশ বছর বয়স্ক অধ্যাপক জীবনে অবশেষে অবমাননার সেই চরম দিনটি এল। মিথ্যে অপবাদের কলঙ্ক ঘাড়ে করে অন্য কোন উপায় না দেখে অধ্যাপক পদে তাঁকে বাধ্য হয়ে ইস্তাফা দিতে হল। হায়! কি ভাবলেন আর কি হয়ে গেল! দশ বছর ধরে কল্পনার যে বীজ তিনি বুনেছিলেন, তা অঙ্কুরিত হবার আগেই বুঝি নষ্ট হয়ে গেল! কি ব্যাপার! না, তিনি চেয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অধ্যাপক পদ। এই পদে নিযুক্ত হবার জন্য প্রত্যেককেই নিয়মানুযায়ী, তার সেরা কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রদর্শন করতে হতো। সেজন্য তিনিও তড়িৎ-বিজ্ঞানের ওপর অনেক বছর গবেষণা-লব্ধ ফল আড়াইশো পাতার "ম্যাথমেটিক্যাল মেজারমেন্টস অফ ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টস" নামে একটা প্রবন্ধ প্রদর্শন করেন। কিন্তু দেখা গেল যে প্রসংশা পাওয়া তো অনেক দূরের কথা, উল্টে তাঁর প্রায় সমস্ত জার্মান সহকর্মীরা তাঁর এই গবেষণাকে সম্পূর্ণ ভাবে এক অবজ্ঞার চোখে দেখল। তবে সবচেয়ে খারাপ হল তখনই, যখন দর্শনের হেগেলীয় কলেজের সঙ্গে যুক্ত এক প্রভাবশালী সমালোচক অভিযোগ করেন যে অধ্যাপকের গবেষণার ভিত হচ্ছে তাঁরই প্রবন্ধ। শুধু এই নয় সেই সমালোচক এই ব্যাপারে জার্মান শিক্ষামন্ত্রীকেও প্রভাবিত করলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড়াল যে, "এরকম মনোবৃত্তিসম্পন্ন পদার্থবিদ বিজ্ঞান পড়াবার যোগ্য নন। ফলে

উপায়ান্তর না দেখে তাঁকে ঐ পদে ইস্তাফা দিতে হল। এরকম ভাগ্যের বিড়ম্বনা বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহ্মের। তবে পরে অবশ্য ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না হন। তিনি তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেন।

এই বিজ্ঞানী জর্জ ওহ্ম ১৭৮৭ সালের ১৬ই মার্চ জার্মানীর ছোট এক ব্যাভারিয়ান শহর এরল্যানজেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জোহান উলফগ্যাও ওহ্ম বংশানুক্রমে তালা সারান, নির্মাণ ইত্যাদি পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর বাবা সত্যিকারের একজন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন; কারণ তাঁর পেশায় জার্মানী ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফলে ১৭৯৯ সালে জর্জের মায়ের অকাল-বিয়োগের পর, জোহান, জর্জ ও তাঁর ভাই মার্টিনের শিক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। জোহান তাঁর ছেলেদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি এক আগ্রহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেন। পরে তাঁরা দুজনেই এরল্যানজেনের স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সমাপ্ত করে গণিতের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

কিন্তু জর্জের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা তিন তিনবার ধারা-বাহিকতা ভঙ্গ করে। তিনি এরপর সুইজারল্যান্ডের ছোট্ট শহর গটস্তাদেতে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর উপরওয়ালারা শীঘ্রই তাঁর প্রতিভার পরিচিতি লাভ করেন। এখানেও তিনি বিজ্ঞান ও গণিতের ওপর তাঁর পড়াশোনা ও অধ্যাপনা দুইই চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং এরই ফলস্বরূপ ১৮১১ সালে এরল্যানজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৮১৭ সালে তাঁর প্রথম গবেষণালব্ধ প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায় এবং এরই ফলে প্রুসিয়ার কিং ফ্রেডারিখের অনুগ্রহ লাভ করেন ও কলোগনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

এই সময় ১৮২২ সালে জোসেফ ফুরিয়ারেরও "অ্যানালাইটিক থিওরী অফ হিট" প্রকাশিত হয়। এতে ফুরিয়ার ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপের পরিবহনের কথা ব্যক্ত করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ পরিবাহীর ক্ষেত্রফল ও পরিবাহীর দু-প্রান্তের তাপমাত্রার পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক। এই থিওরী ওহ্মকে অনুপ্রাণিত করে। এই থিওরীর ওপর ভিত্তি করে ওহ্ম তড়িৎ প্রবাহের ওপর গবেষণা করতে আরম্ভ করনে। এই কাজে ব্যবহৃত ধাতব তার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য তাঁর তালার কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কাজে লাগে। দীর্ঘকাল

যত্নশীল নিরলস গবেষণার পর তিনি ধাতব পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন! তিনি দেখেন যে, পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে: (১) পরিবাহীর উপাদানের ওপর নির্ভর করে; (২) পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতিক; (৩) পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতিক। এছাড়া আরও দেখেন যে, বেশীর ভাগ ধাতব পরিবাহীতেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ কমে যায় এবং একই সঙ্গে দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ বৃদ্ধির ফলে ঐ পরিমাণ বাড়াতে থাকে। তাঁর এই সমস্ত গবেষণা-প্রসূত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অবশেষে বিখ্যাত সর্বজনীন "ওহমের সূত্র" আবিষ্কার করেন। ওহমের সূত্র বলে: "কোন পরিবাহীর তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ, তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক।' গাণিতিক ভাষায়, $V = IR$; যেখানে V = পরিবাহীর উভয় প্রান্তের বিভব প্রভেদ, I = পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ, R = সমানুপাতের ধ্রুবক এবং রোধ নামে পরিচিত। ওহমের সূত্রের অনুরূপ আকারের এক ফরমুলা, $I = \frac{V}{Z}$ পরিবর্তী তড়িৎ সারকিটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেখানে Z = তাড়িতিক ইমপিডেন্স এবং তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত বিষয়।

কলোগনে থেকে বাধ্যতামূলক ইস্তফা দেওয়ার পরে তাঁর জীবনের পরবর্তী ছ'টা বছর খুবই হতাশায় কাটে। অবশেষে ১৮৩৩ সালে এই হতাশার অবসান হয়। ব্যাভারিয়ার রাজা প্রথম লুডউইগ ওহমকে নুরেমবার্গের পলিটেকনিক কলেজে অধ্যাপক পদ পেতে সাহায্য করেন। নুরেমবার্গে তিনি ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত করেন, যদিও ১৮৩৫ সালে তাঁর স্বদেশ শহর এ্যারস্যেনজেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গণিতের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি শেষবারের জন্য ১৮৪৯ সালে ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এখানেই ১৮৫৪ সালের ৭ই জুলাই তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত অধ্যাপনায় রত থাকেন।

নুরেমবার্গে অধ্যাপনার প্রচণ্ড চাপ সত্বেও, তিনি তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনা দুইই করে যান। এই সময় শব্দশক্তি ও সুরযুক্ত স্বর সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এই সমস্ত গবেষণালব্ধ ফল পরবর্তী কালে ভন হেলমোৎসের গবেষণার ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের ওপরও

গবেষণা করেন, কিন্তু নানান কাজের চাপে এ বিষয়ে বেশীদূর এগোতে পারেন নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও মুনিখে থাকাকালীন অবস্থায় আলোকের সমবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও তাদের সম্বন্ধে তথ্যগুলো যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশ করেন।

কিন্তু আলোকের ওপর একই ধরণের গবেষণা ওহমের আগেই নরওয়ের এক বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গবার্গ করেন। যদিও ওহম এটা জানতেন না, তবুও তাঁকে তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য খুব একটা কৃতিত্ব দেওয়া হয় না।

তবে তিনি তাঁর বিখ্যাত তড়িৎ প্রবাহ সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য স্বদেশের থেকে অনেক বেশী মর্যাদা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রমুখ দেশ থেকে পান। ১৮৩১ ১৮৩৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী পাওলেট যখন সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ওহম সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করেন। তখন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ১৮৪১ চল-তড়িতের সূত্রের মৌলিকতার জন্য ওহমকে "কপলে পদক" পুরস্কার দেন। ১৮৪২ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ওহমকে সেরা বিশিষ্ট বিদেশী সদস্য হিসেবে মনোনীত করে আবার সম্মানিত করেন।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর, ১৮৮১ সালে প্যারিসে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় যে, তাড়িতিক রোধের এককের নাম ওহমের নামানুসারে ওহম হবে। তফাৎ শুধু এই যে নামের প্রথম অক্ষরটা থাকে বড় হরফের 'O'। কিন্তু রোধের এককের বেলায় হয় ছোট অক্ষরের 'o'। এইভাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক, তাঁকে বিজ্ঞান জগতে 'অমরত্ব' প্রদান করা হয়।

মাইকেল ফ্যারাডে

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯১—১৮৬৭)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক বিচিত্র বিচিত্র, অদ্ভূত অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনা হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। এমন ঘটনা যা আগে কেউ ভাবতেই পারে না। যেমন, বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের জীবন-ইতিহাস। কেউ কি জানত যে, এক ছেলে বই-বাঁধান অথবা বার্তাবহন যার কাজ, সেই ভবিষ্যতে একদিন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হিসেবে জগতের কাছে সুবিদিত হবে। সেদিন কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, একটা ছেলে যার বিজ্ঞানে বা অংকে কোনরকম শিক্ষাই নেই, এমন কি খুবই সংক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবনে যার কোন রকম প্রতিভা বা দক্ষতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, সেই একদিন পদার্থ বিজ্ঞানের এক সেরা মৌলিক আবিষ্কার সম্পন্ন করবে এবং জগতের কাছে পদার্থ বিজ্ঞানের এক অতি আধুনিক শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

মাইকেল ফ্যারাডে এক গরীব কর্মকারের ঘরে ১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের কাছে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের নিতান্ত নগণ্য আয়ের জন্য, ছোটবেলায় তাঁকে ভীষণ কষ্টে অতিবাহিত করতে হয়। কষ্ট বলে কষ্ট! সারা সপ্তাহের বরাদ্দ খাদ্য সামান্য এক ডেলা পাঁউরুটি! ফলে তাঁকে প্রায়ই অনাহারে কাটাতে হোত। ভগবানের অসীম করুণা যে সেই সময় মাইকেল তীব্র অনাহারে বা অসুস্থতায় অকালে মারা যাননি। বেঁচে থাকার এই দুঃসাধ্য সংগ্রাম, দারিদ্রতা এবং সর্বোপরি এক নিষ্ঠুর শিক্ষকের জন্য তিনি খুবই অল্প, বলতে গেলে কিছুই নয়, শিক্ষালাভ করেন। এরপরে তেরো বছর বয়সে স্থানীয় এক বই বিক্রেতা, জর্জ রিবৌর দোকানে বার্তাবহক চাকরের কাজে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজকর্মে খুশী হয়ে জর্জ রিবৌ তাঁকে বই বাঁধানোর কাজে নিযুক্ত করেন এবং এরই ফলে মাইকেল শুধু বইয়ের বাহিরের দিকই নয়, বইয়ের ভেতরের দিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁর কাছে বাঁধাতে আসা বিভিন্ন ধরণের বইপত্র পড়তে লাগলেন। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর দুটো বই; একটা রসায়ন শাস্ত্রের ওপর মার্সেটের "কনভারসেসনস ইন কেমিষ্ট্রি", আর

দ্বিতীয়টা "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার" তড়িৎ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলো। তাঁর জীবনে এরপর সেই বৃহত্তম সুযোগটা আসে। দোকানের এক ক্রেতা জর্জ রিবৌকে রয়্যাল সোসাইটির স্যার হার্মাফ্রি ডেভির বক্তৃতার এক সিরিজের এক সেট টিকিট উপহার দেন। জর্জ রিবৌ ফ্যারাডেকে এই টিকিটগুলো দিয়ে দেন এবং ফ্যারাডে ডেভির বক্তৃতা শোনার এক সুযোগ লাভ করেন।

ডেভির বক্তৃতা শুনে তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে মনস্থির করলেন। এজন্য "সাফল্যের জন্য বেপরোয়া প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে যাও কিন্তু ফলের আশা কোর না"—এই কথা স্মরণ করে, ডেভির বক্তৃতার এক পরিচ্ছন্ন সঠিক নকল লিপি ডেভির কাছে পাঠালেন এবং তাঁর গবেষণাগারে যে কোন ধরণের কাজের জন্য অনুরোধ করলেন। এতে ফ্যারাডে আশাতীত ভাবে সাড়া পেলেন। ফ্যারাডের সঠিক নোটগুলো পড়ে ডেভি এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি ফ্যারাডেকে গবেষণাগারে বোতল পরিষ্কার করা এবং পরিচারকের কাজে নিয়োগ করেন। পরে অবশ্য ফ্যারাডে প্রসঙ্গে ডেভি নিজেই বলেন যে ফ্যারাডেই তাঁর সর্বোত্তম বিখ্যাত আবিষ্কার।

এর পরে শীঘ্রই শিক্ষক ডেভি ও ছাত্র ফ্যারাডে পাশাপাশি প্রকৃতির রহস্য সমাধানে নিজেদেরকে নিয়োগ করেন। ১৮১৩ সালে সৌভাগ্যবশতঃ ফ্যারাডে, ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরগুলোয় ডেভির বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণের কালে, ডেভির সঙ্গী হন। এই ভ্রমণ, লণ্ডন শহরের বাহিরে ইতোপূর্বে ভ্রমণ করে নি এমন তরুণ ফ্যারাডের পক্ষে সত্যিই এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। এই সময়েই উত্তর ইটালীর শহরগুলো পরিদর্শন কালে তাঁরা ভোল্টীয় কোষের আবিষ্কর্তা আলেসান্দ্রো ভোল্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতই সম্ভবত তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ সারণের ক্ষেত্রে ফ্যারাডের গোড়ার দিকের গবেষণার দিকে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

ইংল্যাণ্ডে এর পর ফিরে এসে ফ্যারাডে একই সঙ্গে ডেভিকেও সাহায্য করে যেতে থাকেন এবং তাঁর নিজস্ব গবেষণাও করতে থাকেন। এই সময় তিনি রসায়ন বিজ্ঞান, তড়িৎ-রসায়ন বিজ্ঞান, স্থির তড়িৎ ও ধাতু বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেন। এদের যে কোন একটা বিষয়ের ওপর গবেষণাই তাঁকে প্রথম সারির বিজ্ঞানী হিসেবে সুনাম পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই সমস্ত গবেষণার ফল স্বরূপ, "স্টেইনলেস স্টীল, বেঞ্জিন, নানান গ্যাসকে তরলীকরণ, তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র এবং স্থির তড়ি[illegible]তের ক্ষেত্রে তড়িৎ আবেশ তিনি আবিষ্কার করেন। ফলে রাজসভায় দক্ষ বিজ্ঞান[illegible]ী হিসেবে তাঁর প্রচণ্ড চাহিদা বেড়ে যায় এবং বছরে প্রায়

প'াচ হাজার ডলার উপার্জন করতে থাকেন, যেথানে রয়্যাল সোসাইটি ত'াকে বড়জোর প'াচ'শ ডলার দিতে পারত। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের সেবায় আত্ম-নিয়োগকারী একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এই ধরণের লাভজনক উপার্জন ত্যাগ করেন এবং স্বাধীন ভাবে ত'ার প্রিয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিমগ্ন করেন।

ফ্যারাডের সততা ও তাঁর ছলাকলাহীন সরল চালচলন, একদিকে তাঁর জীবনকে যেমন মহিমান্বিত করে অপরদিকে তাঁকে প্রচণ্ডতম অসুবিধেয়ও ফেলে। তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি করে; এমন কি তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা স্যার হামফ্রে ডেভিও এক ঘটনায় ফ্যারাডের শত্রু হয়ে যান। একবার যখন সরকারী এক কমিটি ব্রিটিশ কয়লা খনির বিভিন্ন গোলমালের অনুসন্ধানে রত হন। তখন ফ্যারাডে ডেভির "খনি শ্রমিকের নিরাপত্তা বাতির" যাচাই করেন এবং ঐ বাতি যে সর্বদা নিরাপদ নয় তা রিপোর্ট দেন। ফলে ডেভি তাঁর ওপর প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন এবং রয়্যাল সোসাইটির ফেলো পদে ফ্যারাডের নির্বাচনে বিরোধিতা করেন। কিন্তু তখনকার রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডেভির চরম বিরোধিতা সত্বেও ১৮২৪ সালে ফ্যারাডে রয়্যাল সোসাইটিতে নির্বাচিত হন। এত সব সত্বেও ফ্যারাডে কিন্তু তাঁর পূর্বতন শিক্ষক ও প্রভু ডেভির ওপর বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হন না। এবং কয়েক বছর পরে যখন স্যার হামফ্রি ডেভি মারা যান তখন ফ্যারাডে প্রকাশ্যে ডেভিকে তাঁর মহান বন্ধু ও উপকারী হিসেবে ঘোষণা করেন।

এতো গেল ত'ার চরিত্রের উৎকর্ষতার দিক। এর পরে আসা যাক তাঁর বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায়, "তড়িৎ শক্তি থেকে চৌম্বকীয় শক্তি পাওয়া যায়"— ওরস্টেড ও অ্যাম্পিয়ারের এই আবিষ্কারের পরই ফ্যারাডে এই প্রক্রিয়ার উল্টো দিকটা সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করলেন। ফলে তড়িৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞানের এক ব্যাপক ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণার ফলে তিনি প্রথমে তড়িৎ শক্তির সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি লাভ করতে সমর্থ হন এবং মোটরের মূলনীতি আবিষ্কার করেন। ফ্যারাডে ত'ার আবিষ্কার থেকে কোনরকম ব্যক্তিগত লাভ পাবার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা করতেন না। ফলে যেইমাত্র দেখতেন কোন আবিষ্কার ব্যবসায়ীক সম্ভাবনা পর্যন্ত উন্নীত লাভ করেছে, সেইমাত্র সেই আবিষ্কার ছেড়ে অন্য আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকতেন। এই সময় উইলিয়াম ওলাসটন ও ডেভি, ত'ার বিরুদ্ধে (ত'াদের ধারণা) চুরি করার অভিযোগ করেন। যদিও ফ্যারাডে ত'ার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করেন, তবুও ত'ার তড়িৎ সম্পর্কীয় গবেষণার ক্ষেত্রে ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। এই সময় তিনি রাসায়নিক

গবেষণায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন। অবশেষে দীর্ঘ সাত বছর পরে আবার ১৮৩১ সালে তিনি তড়িৎ শক্তির গবেষণায় ফিরে আসেন। এই সময় তিনি কাঁচা লোহার দণ্ড ও তারের কয়েল ব্যবহার করে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করতে সমর্থ হন। এর বেশ কিছুদিন পরে আবার সযত্ন পরীক্ষার পর অবশেষে তাঁর প্রথম ডায়নামো আবিষ্কার করেন এবং এই যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি প্রথম তড়িৎ প্রবাহের এক অবিরাম প্রবাহ নির্মাণ করেন।
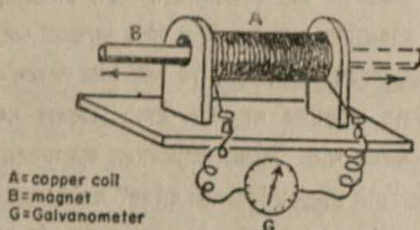
ব্যবসায়িক লাভের জন্য তাঁর "ডায়নামো" বা "ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটর" উন্নত করার পরিবর্তে, ফ্যারাডে "কেন তড়িৎ-চৌম্বকীয় আবেশ ঘটে" এই ঘটনার দিকে তাঁর মনঃসংযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। ফলস্বরূপ তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার—"তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের থিওরী" প্রকাশিত হয়। যেহেতু তিনি এই থিওরী গাণিতিক রূপে দিতে পারেন না। সেজন্য তিনি ভৌত নমুনা ও অব্যবহারিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, সমস্ত বিশ্ব বিভিন্ন ধরণের বলরেখা দ্বারা পরিপূর্ণ ; যেমন তড়িৎ, চৌম্বকীয়, তাপীয়, মহাকর্ষীয় ও বিকিরণজাত। এই সমস্ত বলরেখাগুলো নির্দিষ্ট শক্তির দিক ও পরিমাণ নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন কার্ডবোর্ডের ওপর চুম্বকের সঙ্গে যদি কিছু লোহার টুকরো রাখা যায়, তাহলে ঐ টুকরোগুলো চৌম্বকীয় বলরেখা বরাবর সজ্জিত থাকে। ফ্যারাডের এই থিওরী এতই সঠিক ছিল যে, ম্যাক্সওয়েল এই থিওরীর সম্পূর্ণটাই ব্যবহার করে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "তড়িৎ-চৌম্বকীয় সমীকরণ" নির্ণয় করেন। ফ্যারাডের এই অব্যবহারিক থিওরী পরে বিশ্ববিখ্যাত আইনস্টাইনের বৈপ্লবিক "আপেক্ষিক-বাদের" অগ্রদূত হিসেবে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া এই মতবাদ বিংশ-শতাব্দীর অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের এক অমূল্য ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করে।

ফ্যারাডের সৃজনমূলক প্রতিভার শেষ কয়েকটি বছর ফলপ্রসূ হিসেবে ১৮৪৪ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত উল্লেখ করা যায়। এই সময়ে তিনি এক ধরণের বিশেষ অপটিক্যাল গ্লাস ব্যবহার করে এক শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোকের সমবর্তন তলকে ঘোরাতে সমর্থ হন। ফলে দুটো বিভিন্ন

শক্তির রূপের মধ্যে এক অন্তবর্তী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য শেষের এই কয়েকটি বছরের মধ্যে স্যার আইজ্যাক নিউটনের জীবনের শেষভাগে যেমন স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয় তেমনি ফ্যারাডের জীবনেও এক অসুস্থতা দেখা যায়। যার ফলে চার বছর তিনি বিজ্ঞান গবেষণা থেকে বিরত থাকেন। পরে অবশ্য তাঁর প্রিয় পত্নীর সেবা ও যত্নে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন!

তবে ফ্যারাডের জীবন ইতিহাস সম্পূর্ণ করতে গেলে, গণশিক্ষায় একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা বলতেই হবে; যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর নিজেরই প্রচণ্ড অভাব ছিল। ১৮২৬ সালে তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউটে তাঁর বিখ্যাত শুক্রবারের সন্ধ্যা-কালীন লেকচার শুরু করেন এবং শীঘ্রই তা তরুণদের জন্য প্রত্যেক রবিবারের অধ্যাপনাতেও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একজন বিখ্যাত প্রেরণাদায়ক লেকচারার ও ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন এবং স্যার হামফ্রি ডেভির, যিনি তাঁর সংস্পর্শে সেকালে প্রচণ্ড প্রেরণা ও আগ্রহ সঞ্চারিত করেন, প্রকৃত উত্তরসূরীও তাঁকে বলা হয়। যদিও ফ্যারাডেকে অনেক সময় কোন কারণে অসন্তুষ্ট হতে দেখা যায়, যেমন তাঁকে একবার তাঁর প্রিয় গবেষণা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু তাহলেও তদানীন্তন কালের মতো এ ব্যাপারে কারোর ওপর বিন্দুমাত্র কোনরকম প্রতিশোধ নিতেন না।

তাঁর প্রতিভার প্রতি মর্যাদা রেখে তাঁকে "নাইট" উপাধি এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রচণ্ড বিনয় বশতঃ তিনি তা পরিহার করেন। পরে অবশ্য এই নম্র বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান জগতে অমরত্ব প্রদান করা হয়, তার নামানুসারে তড়িৎ ধারকত্বের এককের নাম "ফ্যারাড" হিসেবে প্রচলিত করা হয়। উপসংহারে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর তড়িৎ শিল্পের অস্তিত্বে অধিকাংশই ফ্যারাডের অগ্রগামী আবিষ্কারের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ঋণী।

চার্লস লাইয়েল

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯৭—১৮৭৫)

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লন্ডনের এক পান্থশালায় আধডজন তরুণ প্রফুল্ল চিত্তে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় করছে, খুশীতে গান করছে। কারণ সেই দিনই কিছুক্ষণ আগে তারা খবর পেয়েছে যে, তাদেরকে আইনবৃত্তি প্র্যাকটিস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাদের অনেকেই এই পূর্ণ আইনজীবি ক্ষমতা পাবার আগে প্রায় ছ' বছর ধরে আইনের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পড়ার জন্য ব্যয় করেছে। কিন্তু একটু দূরেই এক কোণে এদেরই একজন খুশীতে উল্লসিত না হয়ে মনমরা হয়ে বসে আছে। তাঁর সামনে বীয়ারের একটা বোতল। অভিভাবকের নির্দেশেই তিনি আইন পড়তে আসেন। কিন্তু তাঁর জগত আইনের থেকে অনেক দূরে, প্রকৃতির সেই উন্মুক্ত জগত—যা তাঁকে, চার্লস লাইয়েলকে বারবার ছোটবেলা থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকত।

ছোটবেলা থেকেই পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণকালেই, গাছ, ফুল, লতা-পাতা, পাখি, কীট-পতঙ্গের প্রতি চার্লসের এক অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। ১৭৯৭ সালে তাঁর জন্মের বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর পরিবার ইংল্যান্ডের, শান্ত সাউদাম্পটনে এসে স্থিত হন। সাউদাম্পটনের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক জগত চার্লসের স্বভাবজাত আগ্রহকে বৃদ্ধি করে। স্কট অভিজাত চার্লসের বাবার উপার্জন ভাল থাকায় তাঁরা বেশ অবস্থাপন্ন জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁর বাবা একজন শখের উদ্ভিদবিদ্ থাকায়, চার্লস ছোটবেলায়ই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর বাবার সংগ্রহ নানারকম প্রাণী, লতা পাতার দিকে তাঁর এক অসাধারণ আগ্রহের পরিচিতি পাওয়া যায়। অসুখ-বিসুখের জন্য তাঁকে প্রায়ই স্কুল কামাই করতে হোত। কিন্তু যখন ভাল ভাবে প্রাইভেট স্কুলে পড়তে শুরু করলেন তখন আবার অন্যান্য ছেলেদের নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণে, যেমন পোশাকের ভেতর ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া, পচা ডিম ছুঁড়ে মারা ইত্যাদিতে অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং ফলে তাঁর বাবা-মা তাঁকে সাউদাম্পটনে নিয়ে আসেন। ১৮১৬ সালে উনিশ বছর বয়সে তিনি অক্সফোর্ডে অংক ও সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর একজন সহপাঠী তাঁকে ভূবিদ্যার অধ্যাপক

উইলিয়াম বাকল্যাণ্ডের কথা বলেন এবং বাকল্যাণ্ডের এক ক্লাসে চার্লসকে নিয়ে যান। অক্সফোর্ডের অন্যতম প্রতিভা বাকল্যাণ্ডের ভূতত্ত্বের ওপর বক্তৃতায় চার্লস মুগ্ধ হয়ে যান এবং বাকল্যাণ্ড চার্লসের জীবনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেন। চার্লস যদিও তাঁর প্রথাগত পড়া পড়তে থাকেন, কিন্তু বাকল্যাণ্ডের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কাছে তাঁর আইন বই খুবই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ছুটির অবকাশে বাকল্যাণ্ডের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্কটল্যাণ্ডে আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত শিলার গঠনের অনুসন্ধানে যান। এখানকার এডিনবার্গের লাভা শৃঙ্গগুলোর ওপর ঘুরে বেড়ান এবং ফিনগালের গুহার ভয়ঙ্কর ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্তম্ভও পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণ তাঁর ভবিষ্যৎ অবকাশের কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে। যতই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের অন্বেষণে বিভিন্ন মহাদেশ ভ্রমণ করতে থাকেন ততই সমস্ত পৃথিবী তাঁর গবেষণাগারে পরিণত হয়।

চার্লসের বাবা যদিও স্বীকার করলেন ভূবিদ্যাতে ভবিষ্যৎ উন্নতি আছে, তথাপি তিনি তাঁর ছেলের জন্য আইন শাস্ত্রই পছন্দ করলেন। এই সময়ে ১৮১৮ সালে বাবা-মাকে রাজী করিয়ে তিন মাসের পর্বতারোহণের জন্য বাবা-মার সঙ্গে অ্যালপাইন পর্বতমালায় ওঠেন।

কর্তব্যপরায়ণ বশতঃ ফিরে এসে আবার তাঁর পুরোনো আইন পড়ায় মন দেন। কিন্তু জীবাশ্ম ও শিলার চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পারেন না। অন্যান্য উচ্চাভিলাষী ব্যারিস্টারদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশার সময়ও তাঁর মন পড়ে থাকে ভূবিদ্যার সবুজ ক্ষেত্রে। এই সময় তিনি লণ্ডনের ভূতাত্ত্বিক সোসাইটিতে যোগদান করেন যাতে করে ভূতত্ত্বের আধুনিকতম আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন।

অবশেষে তাঁর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং প্রচন্ড প্ররোচনায় তাঁর অভি-ভাবকের মন জয় করেন এবং ১৮২৭ সালে আইনশাস্ত্র ছেড়ে একজন সর্ব-ক্ষণের ভূ-তত্ত্ববিদ হয়ে যান। পরের গ্রীষ্মেই ফ্রান্সে যান এবং জীবাশ্ম খুঁড়ে বের করেন। বিদেশে ঘোরার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যেরও দ্রুত উন্নতি হয়। এখানে তিনি ভোরের আগে ঘুম থেকে উঠতেন এবং সন্ধ্যের অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সারাদিন ধরে কাজ করতেন।

তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, তাঁর সেরা শিল্পকর্ম "প্রিন্সিপিলস অফ জিওলজির" প্রথম খণ্ড ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের গৌণ নামটা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঃ "An attempt to explain the former changes of the earth's suaface by References to causes now in operation.

"লাইয়েলের আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণ পৃথিবীতে আকস্মিক বিপর্যয়। তাঁরা বলতেন যে, পার্থিব বিপর্যয়ে সভ্যতা ধুয়ে মুছে যায় এবং পৃথিবীকে নতুন আকার দেয়। তই মহাপ্লাবনের মধ্যবর্তী যুগে যুগোপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিকাশ ঘটে এবং তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও তারপর সেখানে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব হয়। কিন্তু লাইয়েল বলেন যে, ক্ষয়, বালির ঝড়, হিমবাহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। অতীতে কি ঘটেছিল তা জানতে হলে বর্তমানকে লক্ষ্য করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই পৃথিবীতে সংঘটিত পরিবর্তন-পদ্ধতি জানা যাবে। বর্তমানে পাওয়া জীবাশ্ম থেকে অতীতের ঘটনা জানা যায়। "প্রিন্সিপলস অফ জিওলজিতে" পাওয়া যায় যে আপেক্ষিক ভাবে ক্ষয়করণ সংঘটিত হয়। কারণ লাইয়েল দেখেন যে, ইয়র্কশায়ারের সমুদ্র-উপকূল বছরে প্রায় সাত ফুট থেকে পনের ফুট পর্যন্ত তলিয়ে যায় আর অপরদিকে চিলির সমুদ্রতল, যেখানে ঝিনুকেরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে প্রতিদিনে চার ফুট করে ওপরে উঠতে থাকে। এছাড়া এই বইতে শিলার স্তর ও উত্থানের কথা ব্যক্ত করা আছে এবং এবং এখানে পড়ে থাকা জীবন্ত এবং সুপ্ত শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল থেকে অতীতের ইতিহাসও পাওয়া যায়। অপর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হিসেবে লাইয়েল ভূতাত্ত্বিক যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ঃ (ই) এয়োসিন ; (২) মায়োসিন ; এবং (৩) প্লায়োসিন। তিনি এই তিন যুগেরই বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেন এবং তার স্বপক্ষে যথার্থ প্রমাণও হাজির করেন। তাঁর এই বই সমসাময়িক বিজ্ঞানী, এমন কি চার্লস ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীকেও প্রভাবিত করে এবং সেকালে বেষ্ট-সেলার হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাঁর প্রকাশক কর্তৃক নতুন প্রকাশনার দাবিতে ১৮৩৩ সালে এই বইয়ের আরো দুটো খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বইতে পৃথিবীর পরিবর্তন থেকে আরম্ভ করে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের অনেক জ্ঞানই সঞ্চিত আছে। তাঁর এই কাজের ফলে লণ্ডনের কিংস কলেজে তিনি ভূবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এর অল্প কয়েকমাস বাদেই এক সহকর্মীর মেয়ে মেরী হর্ণারকে বিয়ে করেন। পরের চল্লিশটা বছর চার্লসকে প্রায়ই এক ব্যাপক ভ্রমণে রত থাকতে হয়। এতে তাঁর পত্নী মেরী মন্তব্য করেন যে, তাঁদের মধুচন্দ্রিমার ভ্রমণের একটা অংশ ভূতাত্ত্বিক ভ্রমণ। ফিরে এসে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। কিংস কলেজে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এই নতুন বিজ্ঞানে আগ্রহী অজ্ঞ লোকেরও ভীড় হতো। এমন কি নিয়মিত ভাবে সোসাইটি গার্লদের ভীড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের আসা নিষেধ করে

দিল। জীবনের প্রায় অর্ধসীমায় বক্তৃতার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে মিসিসিপির ব-দ্বীপ, নায়েগ্রা জলপ্রপাত এবং ভারজিনিয়ার অন্ধকারময় জলাভূমিতে নূতন সম্পদের সন্ধান পান। আমেরিকা ভ্রমণের ওপরে তিনি ১৮৪৫ সালে 'ট্রাভেলস ইন নর্থ আমেরিকা" ও ১৮৪৯ সালে "এ সেকেন্ড ভিসিট টু দি ইউনাইটেড স্টেটস" নামে দুটো বই প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইউনাইটেড স্টেটস ও কানাডার ভূতাত্বিক বিস্ময়ের নিখুঁত বর্ণনা ব্যক্ত করেন, যদিও তিনি একজন ভূতত্ত্ববিদ্ ছিলেন তবে সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে, তিনি তাঁর বইতে ইউরোপের ক্ষুধার্ত শিশুদের কথা, রোগ অপরিচ্ছন্নতার বর্ণনা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা সবই লিখে যান। এর জন্য সমাজ সংস্কারের কথা, সন্তোষজনক শ্রমিক ব্যবস্থা, উদারনীতি সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, সুন্দর পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক ব্যবস্থার কথা বলেন। তাঁর বই দক্ষ ও অপেশাদারী উভয়ের কাছেই সমানভাবে উক্ত সমাদর লাভ করত, তার অন্যতম কারণ, তাঁর সাহিত্যশৈলী। তিনি এক কাব্যিক ছন্দে ভূতত্ত্ববিদ্যাকে পাঠকদের সামনে হাজির করেন।

১৮৫৯ সালে ডারউইনের "অরিজিন অফ স্পেসিস" যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনিই প্রথম সঠিকভাবে এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। এবং নতুন থিওরীকে সমর্থন করে তাঁর "প্রিন্সিপিলসের" নতুন সংস্করণে পনেরটা অধ্যায় যুক্ত করেন। ১৮৬৩ সালে তাঁর "দি জিউলজিকাল এভিডেন্সেস অফ দি এ্যাটিকুইটি অফ ম্যান" প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের যুক্তিগুলোর ব্যাখা হাজির করেন এবং আবার ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমর্থন করেন। এই নতুন বই প্রকাশ কালে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাধ্য হয়ে অন্য একটা অট্টালিকাসম বাড়ীতে স্থানান্তরিত হন। কারণ ইউরোপ ভ্রমণ কালে তাঁরা এত প্রচুর পরিমাণে শিলা, জীবাশ্ম ও অন্যান্য উপকরণ যোগাড় করেন যে সেগুলো রাখবার জন্য একটা বড় ঘরের প্রয়োজন হয়।

সমাজ সংস্কারে চার্লসের অবদানের জন্য প্রিন্স এ্যালবার্ট তাঁকে বিভিন্ন কমিটিতে নিয়োগ করেন, তিনি লন্ডনের বৃদ্ধ এবং গৃহহীনদের হিতাকাঙ্খী এক দলেও জড়িয়ে পড়েন এবং ব্রিটেনের পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য উন্নতিকর পন্থাও অবলম্বন করেন, তাঁর এই লোকহিতকামী ও বিজ্ঞানের অবদানের জন্য, তাঁকে ১৮৪৮ সালে "নাইট" উপাধি এবং ১৮৬৪ সালে "ব্যারণ" উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে, তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে "ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে" সমাহিত করে তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মানে

প্রদর্শন করে। তাঁর সমাধিফলকে তাঁকে প্রশংসা করে খোদাই করা আছে ঃ
"The most philosophical and influential geologist that ever lived, and one of the best of men".

............জোসেফ হেনরী..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯৭—১৮৭৮)

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। ১৮৩৭ সালের বসন্ত-কালে ইংলাণ্ডের এক গবেষণাগারে প্রতিথযশা বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ও চার্লস হুইটস্টোন খুবই স্বল্পমাত্রার তড়িৎ প্রবাহে সক্ষম একটা তড়িৎ-বর্তনী বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত করে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ তৈরী করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারাই ব্যর্থ হচ্ছেন, প্রত্যেকবার ব্যর্থ হওয়ায় যখন তাঁরা তাঁদের ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করছেন, ঠিক সেই সময়ে কিছু দূরেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক অন্যমনস্কভাবে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্যের তার আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে অনেকটা একটা কর্ক-স্ক্রুয়ের আকারে তৈরি করলেন। এবং তারপরে সেই দুই বিজ্ঞানীর বারণ করবার আগেই, সেই প্যাচানো তারটা সেই তড়িৎবর্তনীর এক প্রান্তের সংগে যুক্ত করে বর্তনীটার ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলেন। তড়িৎ চলাকালীন অবস্থায় বর্তনীটা বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিষ্কার তড়িৎস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। মাইকেল ফ্যারাডে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন ঃ "Hurrah for the Yankee experiment ! what in the world did you do ?" এই কথা যদি মাইকেল ফ্যারাডে না হয়ে অন্য কেউ বলতেন, তাহলে এর উত্তরে সেই অধ্যাপক হয়তো তীব্র প্রতিবাদ সূচক স্বরে বলতেন ঃ "If you would only read what I publish and understand what you read, you'd know what you just saw !" কিন্তু যাইহোক তিনি এসব কিছুই করলেন না, তিনি ধৈর্যভরে ফ্যারাডেকে "স্ব-আবেশ" ক্রিয়া পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের আবিষ্কর্তা হিসেবে বিজ্ঞান জগতে ইতিমধ্যেই ফ্যারাডে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু এবার "স্ব-আবেশ" আবিষ্কর্তা হিসেবে সেই অধ্যাপক অর্থাৎ জোসেফ হেনরী নিজেকে ফ্যারাডের সামনে উপস্থাপিত করলেন।

কিন্তু জোসেফ হেনরীর শৈশবকালে এমন কিছুই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি যাতে কেউ বলতে পারে যে ভবিষ্যতে তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হবেন। ১৮৯৭ সালে নিউইয়র্কের অ্যালব্যানির কাছে একটা ছোট গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই বাল্যকাল তাঁর অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটে। তেরো বছর বয়স পর্যন্তও তিনি শুধুমাত্র পড়তেই জানতেন। এই সময় তিনি ফার্মের কাজ এবং ঘড়ি সারানো শেখার কাজ করতেন। কিন্তু এই সময়েই তাঁর জীবনে দুটো ঘটনা ঘটে যা তাঁর ভবিষ্যতকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। প্রথমটা, একদিন তাঁর পোষা শশকের সঙ্গে খেলা করতে করতে এক চার্চের লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়েন। লাইব্রেরীর অসংখ্য রোমাণ্টিক উপন্যাসের কিছু কিছু পড়ে অভিনেতা হবেন বলে স্থির করেন এবং এজন্য দু বছর কঠোর পরিশ্রমও করেন। ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলোর ওপর বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি নাটকীয় ভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে পরীক্ষাগুলোর সম্পূর্ণ প্রমাণের দৃঢ়-প্রত্যয়তা সঞ্চারিত করতেন। দ্বিতীয়টা ঃ তাঁরই বোর্ডিংয়ের এক ছেলে তাঁর ঘরে ভুল করে একটা বই ফেলে যান। তিনি সে বইটা পড়েন। তাতে বিজ্ঞানের নানান কথা লেখা ছিল ; যেমন, কেন পাথর ওপরদিকে ছুঁড়লে তা আবার মাটিতে ফিরে আসে? কেন ধোঁয়া আপনা আপনি ওপরদিকে উঠে যায়? ইত্যাদি। এই সমস্ত পড়ে অভিনেতা হওয়া বাদ দিয়ে তিনি প্রাকৃতিক দর্শনের দিকে মনস্থির করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই ষোল বছর বয়সে অ্যালবানি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। সে সময় তাঁর সহপাঠী সব ছাত্রই ছিল তাঁর থেকে কমবয়সী কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক বেশী ধনী। মাত্র সাত মাস নাইট এবং স্পেশাল টিউটরিয়াল ক্লাস করে তিনি অ্যাকাডেমীর প্রয়োজনীয় গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে মফঃস্বলের স্কুল মাষ্টারী চাকরিতে ঢোকেন। এখানেও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও করতে থাকেন। এই অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে দিনের প্রায় ষোল ঘণ্টাই তিনি ব্যয় করে ফেলতেন। পরে তিনি রসায়ন অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। সে সময় তিনি অধ্যাপকের প্রকাশ্য বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিষয়ে তাঁকে সাহায্যও করতেন।

অবশেষে অ্যালব্যানি একাডেমীর শিক্ষা সমাপ্ত করে, হেনরী এরি খালের ইঞ্জিনীয়ার ও সার্ভেয়ারের এক চাকরি নেন। তাঁর এখানকারের কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে ভাল মাইনেতে তাঁর পছন্দ মতো যে কোন জায়গার কাজ করবার প্রস্তাব দেন। মনে হোল তাঁর দুঃখের দিনে বুঝি বা

অবসান হোল। কিন্তু কয়েক মাস কাজ করবার পরই তিনি অনুভব করেন যে, দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনীয়ারের থেকে সুযোগ্য শিক্ষকের বেশী দরকার। ফলে সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার অ্যালব্যানি একাডেমীর অঙ্ক ও প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন। এখানে প্রচণ্ড কাজের চাপ থাকা সত্ত্বে ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তাঁর কিছু বিখ্যাত পরীক্ষামূলক গবেষণা তিনি সম্পন্ন করেন। তাঁর তত্ত্ব যে সঠিক, এ সম্বন্ধে অকাট্য পরীক্ষামূলক প্রমাণ যথেষ্ট ভাবে যতক্ষণ না জোগাড় করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করবেন না, তাঁর এই মনোভাবের জন্য ১৮৩২ সালের আগে তাঁর কোন গবেষণারই লিখিত প্রকাশনা বের হয় নি।

তবে তাঁর প্রথম আবিষ্কার নতুন কিছু নয়, পুরোনোরই উন্নত সংস্করণ। ১৮২৩ সালে উইলিয়াম স্টারজিঅন একটা তড়িৎ-চুম্বক উদ্ভাবন করেন, যেটা খুবই কম শক্তি সম্পন্ন ছিল তাতে মাত্র কয়েক আউন্স চৌম্বক পদার্থ তোলা যেত। ১৮২৮ সালে এই যন্ত্রের উন্নতি বিধান করা হয়। তাতে একটা লোহার দণ্ডকে বার্ণিশের প্রলেপ লাগিয়ে অন্তরক করা হয় এবং তার ওপরে নগ্ন তামার তার আলগা ভাবে জড়ান হয়। কিন্তু তবুও তখনও সেটা তার বিশ গুণ ভারী জিনিষ তুলতে পারত না। ১৮২৭ সালে তিনি এই যন্ত্রের উন্নতি বিধান করেন, তিনি লোহার দণ্ডের পরিবর্তে তামার তারগুলোকে অন্তরিত করেন। কথিত আছে যে তিনি নাকি এসময় তাঁর বৌয়ের পুরোনো সিল্কের কাপড় থেকে ফালি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার তার গুলোর ওপর হাত দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে সেগুলোকে অন্তরিত করেন। ১৮৩৯ সালের মধ্যেই তিনি এই উন্নত তড়িৎ-চুম্বক দ্বারা প্রায় সাতশো পাউণ্ডের ওজন তুলতে সক্ষম হন, ১৮৩৭ সালের আগে পর্য্যন্ত আধুনিক ব্যবহৃত অন্তরিত তারের কথা অজানা ছিল, সেদিক থেকে তাঁর আবিষ্কার এতঃ মৌলিক ছিল যে, আজকের তড়িৎ-চুম্বক প্রকৃতপক্ষে তাঁর যন্ত্রেরই অনুরূপ বলা যায়।

যাইহোক হেনরী এই তড়িৎ-চুম্বক দিয়েই সর্বাধিক চৌম্বক শক্তি পাবার জন্য তড়িৎ-চালক বল ও তাড়িতিক রোধের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং তড়িৎ-চালক বল ও রোধের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বা তাঁর দেশ আমেরিকার কাছে অপরিচিত "ওহমের সূত্র" পুনরাবিষ্কার করেন, তাঁর এই মৌলিক গবেষণার ফলে তিনি দুধরণের তড়িৎ-চুম্বক উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন। একটাতে সর্বাধিক উত্তোলন ক্ষমতার জন্য অতি উচ্চ ধরণের বিদ্যুৎ শক্তি

উৎপন্ন করা যেত এবং অন্যটাতে নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন করা হোত যাতে করে দীর্ঘ তারের মাধ্যমে তড়িতপ্রবাহকে বেশ কিছু দূরত্বে নিয়ে যায়। এইভাবেই ১৮৩১ সালে তিনি প্রথম ব্যবহারিক তড়িৎ-চৌম্বকীয় টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি কোনদিন তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট নিতে চাননি কারণ তিনি মনে করতেন যে মানব-জাতির উপকারের জন্য তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হোক। এজন্য তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর এই আবিষ্কার নিয়ে হুইটস্টোন এবং মোর্সের সঙ্গে আলোচনা করেন। হুইটষ্টোন প্রথম ইংরেজ টেলিগ্রাফ আবিষ্কর্তা হিসেবে চিহ্নিত এবং ১৮৩৭ সালে পেটেন্ট নেন; আর মোর্স আমেরিকান টেলিগ্রাফ আবিস্কর্তা হিসেবে চিহ্নিত এবং ১৮৪০ সালে পেটেন্ট নেন। কিন্তু হেনরী ১৮৩১ সালে টেলিগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করেন। দুই বিজ্ঞানীই তাঁদের আবিষ্কারের জন্য অর্থ ও কৃতিত্ব উভয়ই লাভ করেন। কিন্তু হেনরীকে, তার দীর্ঘ দূরত্বে তড়িৎ-প্রবাহ স্থানান্তরের গবেষণার জন্য, কোন বিজ্ঞানীই হেনরীর প্রাপ্য কৃতিত্ব দেওয়ার কোন আমলই দেননি। অবশ্য এতে হেনরীর মতো ব্যক্তি বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন নি। তাঁর প্রথম টেলিগ্রাফের অংশ হিসেবে তাড়িতিক রিলে পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এরই ফলস্বরূপ, আজকের আন্তর্মহাদেশীয় রেডিও ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, যাতে শক্তিশালী চুম্বকের স্থানীয় তড়িৎবর্তনী নিয়ন্ত্রক স্বল্পমাত্রার তড়িৎ-প্রবাহের বর্ধিতকরণ নীতি ব্যবহার করা হয়।

তবে হেনরীর সর্বোত্তম বিখ্যাত আবিষ্কার, মাইকেল ফ্যারাডের তড়িৎ-"চৌম্বক" আবিষ্কারের সমকক্ষ। তিনি আবিষ্কার করেন যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের তারতম্য ঘটিয়ে তড়িৎ ক্ষেত্র উৎপন্ন করা যায় অথবা আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ সম্পন্ন পরিবাহীকে চৌম্বক ক্ষেত্রের (চৌম্বক বল সম্পন্ন দুই মেরুর মধ্যেকার স্থান) মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করালেও তড়িৎ-ক্ষেত্র উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু এই তত্ব তিনি প্রথমে প্রকাশ করেন না। পরে ১৮৩২ সালে ফ্যারাডে যখন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "তড়িৎ-চৌম্বিক আবেশ" প্রকাশ করেন, তখন হেনরী বাধ্য হয়ে তাঁর "স্ব-আবেশ' ক্রিয়া প্রকাশ করেন; যা এই দুই বিজ্ঞানীর সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের আগে পর্যন্ত ফ্যারাডের কাছে আজানা ছিল।

১৮৩২ সালে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও উপকরণ দুইই পান। ফলে পরবর্তী চোদ্দটা বছর তাঁর খুবই সুখের হয়। এখানেই ইলেকট্রিক

ট্রান্সফরমার সংক্রান্ত "স্টেপ আপ নীতি" ও "স্টেপ-ডাউন নীতি" আবিষ্কার করেন। তাঁর এই দুই নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে, তিনি তড়িচ্চালক বল ও তড়িৎ-প্রবাহ নির্ধারণের জন্য তাড়িতিক শক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করেন; কোন রকম মিটারের (ভোল্টমিটার ও অ্যামমিটার) সাহায্য ছাড়াই।

১৮৪২ সালে হেনরী "হার্টজীয়ান তরঙ্গ"ও আবিষ্কার করেন; যা বায়ুতে প্রায় তিরিশ ফুট এবং কাঠে প্রায় দু ফুটের বেশী যেতে পারত। এরও প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী পরে হার্টজ একই ঘটনা আবিষ্কার করেন এবং ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক ভাবে এর সূত্র নির্ধারণ করেন। সেজন্য হেনরী যা আবিষ্কার করেন তা তাঁর সময়ের থেকে এত বেশী আধুনিক ছিল যে, তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা এর যথার্থ মূল্যায়ণ করতে অসমর্থ হন। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ব সম্যক উপলব্ধি করতেই তাঁদের প্রায় অর্ধ শতক কেটে যায়।

অবশেষে কর্তব্যের ডাকে তাঁকে তার গবেষণায় ইস্তাফা দিতে হয়। ১৮৪৬ সালের তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত "স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের", বিজ্ঞনের প্রথম আমেরিকান জাতীয় পরিচালক হিসেবে, প্রথম সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। তিনি একজন মহান পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তরুণ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তাদের যথাসাধ্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনিই প্রথম আমেরিকান বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক-গবেষণার ফ্রি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন এবং সেগুলোকে বিশ্বের দরবারে কাছে প্রকাশ করবারও ব্যবস্থা করেন। এছাড়া "ইউনাইটেড স্টেটস ওয়েদার ব্যুরোর" সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও তাঁর নাম উল্লেখ করা যায়। কারণ "স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের" কর্মীরা মিসিসিপি নদীর পূর্বদিকের আবহাওয়াবার্তা টেলিগ্রামের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডি. সি, তে পাঠাত এবং সেখানেই এই সমস্ত সংগৃহীত হোত এবং এরই ফলে এই সরকারী সংস্থা সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ সালে তিনিই প্রথম এক সাদা পর্দায় সূর্যের প্রতিবিম্ব ধরে এক সূক্ষ্ম থার্মোপাইলের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে সূর্য্য পৃষ্ঠের ক্ষতিগুলোর তাপ-মাত্রা অন্যান্য ক্ষেত্রের থেকে কম।

এছাড়াও হেনরী "ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স" এবং অ্যামেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের" সংগঠকও ছিলেন। গণ-যুদ্ধের সময় তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির কর্ণধারও থাকেন, বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী যদি তাঁর ছোট্ট পরামর্শমত লৌহচাদর নির্মিত গানবোটের কথা

অনুসরণ করত তাহলে "সিভিল ওয়্যার" হয়ত আরো অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। পরে অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকা "মেরীম্যাক" নির্মাণ কালে এই প্রত্যাখ্যাত নকশা গ্রহণ করে।

খুবই স্বল্প প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন শুরু করে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত অবদান রেখে, অবশেষে হেনরী ১৮৭৮ সালে মারা যান। তিনি অর্থকে উদাসীনতার চোখে দেখতেন। সামান্য বার্ষিক মাত্র তিন হাজার ডলারের মাইনেতেই তিনি স্মিথসোমিয়ান ইন্সটিউটে পরম সন্তোষ বোধ করতেন। তাঁর জীবনকে তিনি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সেবায় উৎসর্গীকৃত করেন। তাঁর পরম পুরস্কার ছিল মানবজাতির জ্ঞানের অগ্রগতি। তাঁর এই সমস্ত মহানুভবতার কথা মনে রেখে, বিজ্ঞান জগত তাঁর কৃতিত্বের যৎসামান্য পরিচিতি স্বরূপ তাঁর নামের অনুসরণে তাড়াতাড়ি আবিষ্টতার এককের নাম দেন "হেনরী"।

............ফ্রেডরিখ উলার............

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮০০—১৮৮২)

উনিশ শতকের প্রায় আড়াই দশক পর্যন্ত রাসায়নিক যৌগকে অজৈব যৌগ বা জৈব যৌগে শ্রেণীবিভাগ করা হোত। অজৈব যৌগ, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি, জড় পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তৈরি হোত। আর জৈব যৌগকে মনে করা হোত জীবদেহে "জীবনী-শক্তির" সাহায্যে প্রোটোপ্লাজমীয় পরিবর্তনের ফলে তৈরি হয়। যেমন, অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাট ইত্যাদি। কোন বিজ্ঞানীই জানতেন না কিভাবে এই সমস্ত জৈব পদার্থ গঠিত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে জীবদেহে বিক্রিয়ার জন্য দায়ী "জীবনী-শক্তি" সৃষ্টি করা যা নকল করা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮২৪ সালে ফ্রেডরিখ উলার নামে এক তরুণ জার্মান রসায়নবিদ্ এই ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে রসায়নাগারেও জৈব-যৌগও সৃষ্টি করা সম্ভব। তাঁর এই আবিষ্কারের পেছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। একদিন তিনি যখন রসায়নাগারে সায়ানোজেন ও অ্যামোনিয়া জল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় তিনি সূচের মতো

সাদা সাদা দানাযুক্ত এক পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। এই ধরণের আগে কোথায় দেখেছেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে যায় যে, বেশ কয়েক বছর আগে ছাত্রাবস্থায় মূত্র নিয়ে পরীক্ষা করার কালে, মূত্রের এক উপাদান ইউরিয়াতেও একই রকম দেখতে ছিল। কিন্তু সেটা তো জৈব যৌগ। তাহলে তিনি গবেষণাগারে জৈব যৌগ তৈরি করেছেন! তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু সন্দেহ বশতঃ তিনি তখনই তা প্রকাশ করলেন না। অবশেষে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে এরও প্রায় চার বছর পরে তিনি তাঁর এই আবিষ্কার প্রকাশ করেন। ফলে রসায়ন জগতে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা হল।

ফ্রেডরিখ উলার ১৮০০ সালের ৩১শে জুলাই, জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুট-এ্যাম-মেইনের কাছে এসচারসচেইমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার বিজ্ঞানে ভাল জ্ঞান থাকায়, তিনি সহজেই বাবার দ্বারা বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন। ১৮২০ সালে মেডিসিন পড়তে ম্যারবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, ১৮২১ সালে হেইডেলবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন এবং লিওপোল্ড মেলিনের রসায়নাগারে কাজ করতে শুরু করেন। ১৮২৩ সালে হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্জারী ও মেডিসিন নিয়ে পাশ করেন। কিন্তু মেলিন তাঁর রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিভার জন্য তাঁকে শুধুমাত্র রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা করতে পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি স্টকহোমে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বার্জে-লিয়াসের গবেষণাগারেও কাজ করেন এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেক জ্ঞান বিনিময়ও হয়।

১৮২৫ সালে তিনি বার্লিনের টেকনিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৩১ সাল পর্যন্ত কাটান। এরপর ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাসেলের টেকনিক্যাল স্কুলেও পড়ান। এই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার প্রকাশ করেন। কিন্তু সহকর্মীদের এই আবিষ্কার উপলব্ধি করাতে তাঁকে অনেক বেগ পেতে হয়। এমন কি সিনথেটিক রাসায়নিক সার দ্বারা মাটির উর্বরীকরণ বৃদ্ধির আবিষ্কারের জন্য যে জাস্টাস ভন লিবিগকে এগ্রিকালচারাল রসায়নের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। সেই লিবিগ, যিনি উলারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সঙ্গে কাজও করেন, তিনিও প্রথমে বিশ্বাস করতে চান নি। কিন্তু পরে উলার যখন পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের দেখিয়ে দিলেন যে, রসায়নাগারে জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব, তখন তাঁরা বিস্ময়ে তা দেখলেন এবং বিশ্বাসও করলেন। ফলে রসায়ন জগতের এক নতুন দরজা

খুলে গেল। যার ফলস্বরূপ আজকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন ইনসুলিন, ভিটামিন আরো অনেক পদার্থ রসায়নাগারেই নির্মিত হয়।

এছাড়া ১৮২৭ সালে তিনি পটাসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সংমিশ্রণে অ্যালুমিনিয়ামকে পৃথক করেন। একই পদ্ধতিতে বিরল মৌল ধাতু বেরিলিয়ামও আবিষ্কার করেন। ১৮৩২ সালে উলার এবং তাঁর বন্ধু লিবিগ বেনজয়িল মূলকের রাসায়নিক ধর্মও গবেষণা করেন, যায় থেকে বেনজয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এছাড়া তিনি কুইনোনও আবিষ্কার করেন, যা চামড়ার শিল্পে ব্যবহৃত হয়, এবং ফটোগ্রাফী-শিল্পে ব্যবহৃত হাইড্রোকুইনোন আবিষ্কার করেন। তবে তাঁর অপর অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার—ক্যালসিয়াম কার্বাইড এবং তা থেকে জলের বিক্রিয়ায় ১৮৬২ সালে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের নির্মাণ। অ্যাসিটিলিন জৈব যৌগের হাইড্রোকার্বন গ্রুপের প্রথম যৌগ, যা থেকে তার অনেক পলিমার যৌগ গঠন করা যায়। এছাড়া তিনি কার্বন ও সিলিকনের মধ্যেকার রাসায়নিক সম্পর্ক ও নির্মাণ পদ্ধতি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে টাইটেশিয়ামও রাসায়নিক দিক থেকে কার্বন ও সিলিকনের প্রায় সম ধর্মাবলম্বী।

উলারের এই উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সাফল্যের কারণ হিসেবে তাঁর অধ্যাবসায় এবং বৈশ্লেষিক ক্ষমতার কথা বলা যায়। এছাড়া তিনি নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যনিষ্ঠও ছিলেন। রসায়নক্ষেত্রে তাঁর এই বিশেষ অবদানের জন্য তিনি গটিঞ্জেনের মেডিকেল ফ্যাকালটির রসায়নিক বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। এই পদেই অনেক বছর সেবা করার পর অবশেষে ১৮৮২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর উলার পরলোকগমন করেন, তাঁর অবদানের কথা মনে রেখে গটিঞ্জেনের প্রাঙ্গণে তাঁর এক মূর্তি মৃত্যুর পরে স্থাপন করা হয়।

লুইস অগাসিজ

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮০৭—১৮৭৩)

উনিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিকের কথা। গ্রীষ্মকাল, একজন বিজ্ঞানীকে দেখা গেল যে গরম পোশাকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হয়ে, দড়ির সঙ্গে লাগান এক কাঠের বাক্সে বসে অ্যালপাইন হিমবাহের এক ফাটলের মধ্যে দিয়ে গহ্বরের দিকে নামছেন। নামছেন তো নামছেনই—কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ফুট, তাঁর চোখের সামনে বরফের দিনের আলোয় পান্না সবুজ রং ক্রমে ক্রমে মলিন নীল রঙে এবং অবশেষে ঘন কালো রঙে পরিণত হলো। এইভাবে প্রায় একশো কুড়ি ফুট নীচে নামার পর হঠাৎই তিনি বরফশীতল জলের স্পর্শ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি নেড়ে ওপরদিকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁকে যেন তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তুলে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি আকস্মিক ভাবেই সেই হিমশীতল জলে ডুবে গেলেন। তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, দড়ি বুঝি ছিঁড়ে গেল! তাহলে তো সব শেষ। এই অতল হিমগহ্বরে তাঁকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তিনি পাগলের মতো দড়িটা ধরে নাড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে তাঁকে নিয়ে দড়িটা ওপরদিকে উঠতে লাগল। যাক বাঁচা গেল! অবশেষে প্রাকৃতিক রহস্য সন্ধানী সেই বিজ্ঞানী, লুইস অগাসিজ ভালমতোই, নির্বিঘ্নে ওপরে উঠে এলেন। এইরকম অগাসিজ মাঝেমধ্যেই তাঁর জীবনকে বিপন্ন করতেন; কি না, প্রাকৃতিক রহস্য অনুসন্ধানের জন্য! এইভাবে প্রায় আটটা গ্রীষ্মকাল ধরে হিমবাহ এবং বিশাল বিশাল গণ্ডশৈল পর্যবেক্ষণের পর তিনি ঘোষণা করেন যে, কোন এক সময় বরফের এক বিস্তৃত হিমবাহ উত্তর মেরু থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁর এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ হিমবাহের প্রকৃতির ওপর তাঁর ভূতাত্ত্বিক বই "এটাডেস সার লেস গ্লেসিয়ারস" প্রকাশিত হয়। কিন্তু ততদিনে তিনি একজন বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ ও দক্ষ মৎস্য জীবাশ্মবিদ হিসেবে সুপরিচিত।

এই প্রকৃতিবিদ লুইস অগাসিজের জন্ম সুইজরল্যাণ্ডে। ছোট বেলা থেকেই তিনি বিজ্ঞানী হবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হন। সেজন্য তিনি লউসেনের বিশ্ববিদ্যালয়, জুরিখের মেডিকেল স্কুল এবং হেইডেলবার্গ ও মুনিখের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পড়াশোনা করেন। তাঁর যাজক বাবা প্রকৃতি-

বিজ্ঞানের বদলে তাঁকে মেডিসিন পড়ার জন্য জোর করেন যাতে লুইস স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারে। ফলে বাধ্য ছেলের মতো লুইস মেডিসিন স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু রাত্রিতে তিনি জীবন্ত এবং লুপ্ত মাছেদের সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন।

কিন্তু এইসময়ে ভাগ্য তাঁর প্রতি সহায় হয়, তাঁরই একজন অধ্যাপকের সুপারিশে সি, পি, ওন মার্টিয়াসের কাছে নিযুক্ত হন, এবং মার্টিয়াসের নিয়ে আসা এক জাহাজ আমাজনের বিরল মাছের গবেষণার কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। এরই ফলস্বরূপ প্রজাতির ওপর মার্টিয়াসের এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই কাজে সাহায্যের জন্য লুইস যথোচিত স্বীকৃতি পান। শুধু তাই নয়, এর ফলে লুইস দু-দুটো সাফল্য লাভ করেন। প্রথমতঃ তাঁর বাবা প্রকৃতিবিদ্ হওয়ার জন্য রাজী হন এবং দ্বিতীয়ত তিনি বিখ্যাত ফরাসী প্রকৃতিবিদ কাভিয়ারের নজরে পড়েন। কাভিয়ার তাঁকে তাঁর প্যারিসের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান এবং অর্ধশতকেরও বেশী সময় ধরে সঞ্চিত করে রাখা নমুনা, জীবাশ্ম এবং তথ্য লুইসের হাতে সমর্পণ করেন। তিনি লুইসকে বলেন যে লুইস যেন এই সমস্ত কিছুর সাহায্যে মাছের ইতিহাসের ওপর একটা বই প্রকাশ করেন। ফলে এই কার্যে লুইস নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি দিনে প্রায় পনের ঘণ্টা কাজ করতেন। এই পরিশ্রম সম্বন্ধে কাভিয়ার তাঁর স্বাস্থ্যহানির সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার উত্তরে লুইস বলেন যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য তিনি সানন্দে মৃত্যু বরণও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর কার্য সমাপ্ত হবার আগেই কাভিয়ার মারা যান। এক সময়ে মনে হয় যে লুইস বুঝি বা তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারবেন না কারণ সেই সময় লুইসের কাছে কাজ চালানোর মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল না। কিন্তু এই সময় আরেকজন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ আলেকজাণ্ডার ডন হামবোল্ট লুইসের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হামবোল্ট লুইসকে এক হাজার ফ্রাঁ অর্থ দেন এবং নিউবাটেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অধ্যাপক পদও জোগাড় করে দেন। এর পরেই তাঁর পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত বই "রিচার্চেস সার লেস পয়জনস ফসিলেস" ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি প্রায় এক হাজারেরও বেশী মাছের জীবাশ্মের বর্ণনা দেন। ফলে প্রকৃতিবিদ্ হিসেবে অগাসিজের নাম দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। মাছের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অসাধারণ,, একবার একদল তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে একবার এক মাছের আকৃতি বর্ণনা করতে বলেন। তিনি তখনও জানতেন না যে, সেই

মাছের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এবং তাঁর পেছনে এক পর্দার আড়ালে রয়েছে যাহোক তিনি এই মাছের আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করেন এবং তার সম্ভাব্য আকৃতির একটা নকসাও দেন। পরে পর্দা সরিয়ে দেখা গেল যে, তাঁর আকা নকশা এবং প্রকৃত জীবাশ্ম দুটোই অনুরূপ, এক আকারের।

ইউরোপে তাঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং অর্থ না পাওয়ায় তিনি বোস্টনের লোয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভজনক এক বক্তৃতার সিরিজের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং আমেরিকার চলে যান। বোস্টনে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটির এক সদস্যপদে নিযুক্ত হয। এখানে এক "স্যাটারডে ক্লাবে", সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানও আলোচনা করা হতো, তিনি এখানকার বিশিষ্ট সদস্য যেমন লংফেলো, এমারসন প্রমুখদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অধ্যাপক পদের এক আকর্ষণীয় প্রস্তাব পান ; কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি হারভার্ডে তুলনা-মূলক প্রাণীবিদ্যার এক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এখানেই প্রাণী বিদ্যার অন্তর্গত নমুনা এবং জীবাশ্ম সংগ্রহ করেন, ফলে এই সংগ্রহশালা বিশ্বের অন্যতম বিশাল সংগ্রহশালা হিসেবে চিহ্নিত হয়, পঞ্চাশ বছরের আগেই তিনি তাঁর "কনট্রিবিউ-শানস টু দি ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ইউনাইটেড স্টেটসের" আধখানা সমাপ্ত করে ফেলেন এবং ফলে জগতের কাছে তাঁর পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকাও জীববিদ্যার গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে সুবিদিত হয়। এরপরে তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদেরও যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন। এই সময়েই ১৮৬১ সালে তাঁর দাসত্ব-বিরোধী ও সমভিত্তিক মনোভাব প্রদর্শনের জন্য আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে ডারউইনের "বিবর্তনবাদ" সম্পর্কে তিনি কিন্তু বিরোধিতা করেন, তাঁর মতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তির কারণ স্বর্গীয়, "ডারউইনের মতানুযায়ী সেই সমস্ত প্রজাতির উৎপত্তির কার্বন-বিবর্তন"—তা ঠিক নয়। সবাই লুইসের এই বিরোধিতায় অবাক হয়ে যান, কেউ কেউ এ সম্বন্ধে বলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা ছয় যুগ ধরে যাজক ছিলেন এবং তারই ফলে অগাসিজের মনে যে গভীর ধর্মবিশ্বাস গেঁথে যায় ; তারই ফলে তিনি এই ধরণের মন্তব্য করেন।

লুইসের পরিশ্রম ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নতুন প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য তিনি দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি প্রায় দিনে পনের ঘন্টা করে কাজ করতেন। এরই ফলে ম্যাসাচুসেটসের নিউ বেড ফোর্ডের কাছে, বাজার্ডের মোহনায় এক দ্বীপের ওপর জগতের সর্বপ্রথম

সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান গবেষণাগার "এ্যান্ডারসন স্কুল অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি" স্থাপিত হয়। এরপর তাঁর "সামার স্কুলের" সাফল্যের সঙ্গে দ্বারোদ্ঘাটনের পরই ১৮৭৩ সালে তাঁর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সমাধিক্ষেত্রের ওপর সুইস হিমবাহের থেকে নিয়ে আসা এক বিশাল গণ্ডশৈল রাখা আছে। জগৎ তাঁর কাছে শুধুমাত্র জীবাশ্ম। নমুনা বা হিমবাহের জন্য নয়, উপরন্তু জীববিদ্যা ভিত্তিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্যও সমান ভাবে ঋণী।

..........চার্লস ডারউইন..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮০৯—১৮৮২)

১৮৩১ সাল, 'বীগল' নামে ইংল্যাণ্ডের এক জাহাজ শান্ত, নীল সমুদ্রে তার মাস্তুল বিজয়গর্বে তুলে, ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেলে দুলে চলছে। ওপরে শরতকালের সাদা সাদা মেঘের টুকরো ; রৌদ্রস্নাত হয়ে পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে—যেন খুশী খুশী ভাব। কিন্তু ডেকের এক কোণে বাইশ বছরের এক তরুণের মনে হতাশের এক কালো মেঘ। প্রথম সমুদ্র যাত্রার জন্য একটা অস্বস্তি তাঁর সারা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। ভাবছেন ফিরে যাবেন কি না ? এখানেও কি অসাফল্য তাঁর পেছু নিয়েছে ? এতদিনের তাঁর জীবন তো শুধুমাত্র অসাফল্যতারই প্রতীক ! প্রথম ডাক্তারি শিক্ষায় অসাফল্য ; পরে ধর্মযাজক হবার ব্যর্থতা ! এখন তো তাঁর নিজেরই পছন্দমাফিক বিজ্ঞানের শাখারই জন্য এই যাত্রা। এখান থেকে বাড়ী ফিরে গেলে কোন মুখ নিয়ে সে তাঁর সাফল্য কৃতী বাবার সামনে দাঁড়াবে ! এই অসাফল্যের বোঝা কি চিরটা কালই বয়ে বেড়াতে হবে ? যা থাকে কপালে ! যাত্রা সম্পূর্ণ না করে কোন মতেই তিনি ফিরে যাবেন না। এবং তাঁর এই অটল সিদ্ধান্তই তাঁর জীবনকে পরে এক ভিন্ন মুখে পরিচালিত করে—তাঁকে বৈপ্লবিক "বিবর্তনবাদের" স্রষ্টা হিসেবে চার্লস ডারউইন নামে বিজ্ঞান-জগতে অমরত্ব প্রদান করে। তবে তাঁর এই অসাফল্য ও সেই তুলনায় তাঁর পর্বত-প্রমাণ সাফল্যের কথা জানতে হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বিশাল প্রতিভাময় জীবনের দিকে এক পলক তাকাতে হবে।

তাঁর পিতামহ ছিলেন এরাসমাস ডারউইন—এক জ্ঞানী চিকিৎসক, এক

আবিষ্কর্তা এবং তিনিই প্রথম বিবর্তনবাদের ধারণা প্রস্তাব করেন, যদিও তিনি ভুল পথে "জীবন্ত প্রাণীর রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এই বিবর্তন ঘটে", তা প্রস্তাব করেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন আবার জগদ্বিখ্যাত "মৃৎ-শিল্পের" প্রতিষ্ঠাতা জোসিহা ওয়েজউড। এই রকম এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও প্রথাগত পড়াশোনার দিকে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর এক অসাধারণ আগ্রহ দেখা যেত। সেটা হল কেবল অদ্ভুত জিনিষ সংগ্রহ করা। শামুক, ঝিনুক থেকে আরম্ভ করে পাথরের কুচি পর্যন্ত নানা জিনিষে তাঁর পড়ার টেবিল, বাক্স বোঝাই হয়ে থাকত। তাঁর বাবাও একজন ডাক্তার হওয়াতে, পারিবারিক পেশা ডাক্তারীর জন্য তিনি চার্লসকে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে ভর্তি করে দেন। সে সময় ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় রোগীদের সজ্ঞানেই অস্ত্র চিকিসার ফলে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হোত। ডারউইনের কোমল হৃদয় এই যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারত না। ফলে ডাক্তারি না করে তিনি তদানীন্তন তরুণ প্রাণীবিদ্‌দের এক ক্লাবের সঙ্গে সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণে ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে তাঁর আর ডাক্তারি শেখা হল না। শেষ আশা হিসেবে তাঁকে ধর্ম-শিক্ষার জন্য ধর্মীয় কলেজে ভর্তি করা হয়। এখানে তিনি একদল তরুণ স্পোর্টস-ম্যানের পাল্লায় পড়েন। ফলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি খেলাধুলো ও অন্যান্য কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। এইভাবে প্রায় বছর কেটে যায়। অবশেষে ১৮৩১ সালে যখন 'বীগল' নামে এক জাহাজ পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়, তখন তিনি বিনা বেতনে প্রাণীতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জাহাজের সঙ্গে যাবার অনুমতি লাভ করেন। 'বীগল' পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ভ্রমণ করে। প্রথমে এটা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের পূব-উপকূলে যায়। পরে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের ম্যাগলান দ্বীপপুঞ্জ, আরও গ্যালাপ্যাগস দ্বীপেও ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত জায়গা থেকে ডারউইন নানান নমুনা সংগ্রহ করেন এবং প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে এক আশ্চর্য নতুন জ্ঞান লাভ করেন। এরই ফলস্বরূপ ১৮৬৬ সালে ফিরে এসে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে "এ ন্যাচারালিষ্ট'স ভয়েজ অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড" প্রকাশ করেন। যদিও এটা একটা সেরা শিল্পকর্ম ছিল, তবুও এর মধ্যে বিবর্তনের কোন উল্লেখ ছিল না।

১৮ ৮ সালে তিনি ভূতাত্ত্বিক সোসাইটির সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। এবং ১৮৩৯ সালে মামাতো বোন এম্মা ওয়েজউডকে বিয়ে করেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে চিত্রবৎ কেণ্টে ডাউন হাউসে বাড়ী করেন। এর মধ্যে গ্রীনহাউস এবং একটা বাগানও ছিল, এবং তাতে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ থাকত। ডাউন হাউসেই তিনি অত্যন্ত যত্নশীল পর্য্যবেক্ষণ এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে কুড়ি বছর পরে তাঁর বিখ্যাত "অরিজিন অফ স্পেসিস" প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি এক নিয়মিত রুটিন বাঁধা জীবন অতিবাহিত করতেন—লেখাপড়া, ভ্রমণ, আমোদের জন্য আলাদা আলাদা সময়।

জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তাঁর শরীর একেবারের ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় খুব অল্প লোকই তাঁর ডাউন হাউসের বাড়ীতে দেখা করতে আসত। তবে শরীর ভেঙ্গে পড়া সত্বেও, তাঁর মন আশ্চর্য রকমের সতেজ ছিল। অসুস্থতা সত্বেও তিনি তাঁর কোমল স্বভাব ও মাধুর্য্য সবাইকেই বিতরণ করতেন। একবার তাঁর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন দেখা করতে আসেন। এই সাক্ষাতকার সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিনয়ের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা রেখে বলেন: "Mr. Gladstone is a great man and yet he talked to me as if he were an ordinary person like me." গ্ল্যাডস্টোনও এর জবাবে মন্তব্য করেন: "My feelings toward Mr. Darwin are exactly the same as his towards me."

১৮৫৯ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "অরিজিন অফ স্পেসিস" প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি "প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের" মতবাদ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনি বলেন যে মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানারকম বাছাবাছি চলে, প্রাণীজগতেও সর্বত্রই স্বাভাবিক ভাবে বাছাবাছি চলে। যারা রুগ্ন ও দুর্বল, মরবার সময় তারাই আগে মরে। যারা বাহিরে নানা অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তারাই টিঁকে যায়। এভাবে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করতে করতে, বাইরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জীবের আকৃতি নানারকম ভাবে গড়ে ওঠে, এবং এইরূপে আরো নানা কারণে আপনা থেকেই এক একটা জন্তুর চেহারা নানা রকমে বদলিয়ে যায়।

এর বারো বছর পর ১৮৭১ সালে তাঁর "ডিসেণ্ট অফ ম্যান" প্রকাশিত হয়। এতে নৃবিদ্যা সম্পর্কে একই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। মনোবিদ্যার ওপর বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করে তিনি এরপরে "দি এক্সপ্রেসন অফ দি ইমোসন ইন ম্যান অ্যাণ্ড এনিম্যালস" প্রকাশনা করেন। এছাড়া জেনেটিকসের প্রবর্তক হিসেবে তাঁর "ভেরিয়েসন অফ এনিম্যালস অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টস আণ্ডার ডোমেস্টিকেসন" বইও প্রকাশিত হয়। এতে অবশ্য তিনি "প্রজাতির তারতম্য কিভাবে

বটে"—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারেন না।

অবশেষে ১৮৮২ সালে তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে ইংরেজ জাতি সেই অল্পবুদ্ধি ছাত্রকে পরম সমাদরে বিজ্ঞানবীর নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

·········রবার্ট উইলহেল্ম বুনসেন·········

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮১১—১৮৯৯)

সপ্তদশ শতকের শেষ অর্ধে রিচার্ড ফ্র্যাঙ্ক প্রথম বলেন: "Necessity is the mother of invention." এই পুরোনো প্রবাদ বাক্যের যথার্থ মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে গেলে, বিখ্যাত, প্রতিভাবান জার্মান রাসায়নবিদ্ রবার্ট উইলহেল্ম বুনসেনের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসরণ করতে হবে, তবে সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে, সুবিদিত বুনসেন-বার্ণার, যা তাঁর নাম বহন করে, কিন্তু বুনসনের নয় মাইকেল ফ্যারাডের সৃষ্টি।

রবার্ট ১৮১১ সালের ৩১শে মার্চ, জার্মানীর গটিঞ্জেনে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি এক শখ ছিল। এজন্য সর্বদাই নানান ধরণের যন্ত্রপাতির দিকে তাঁর সর্বদাই এক অপরিসীম আগ্রহ দেখা যেত, আলোক ও তাপ বিজ্ঞানের ওপর তাঁর এক গভীর ঝোঁক দেখা যায় এবং এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।

১৮৩৭ সালের মধ্যে গবেষণা করে প্রথম প্রমাণ করেন যে, জৈব যৌগ-গুলোর বিক্রিয়ার জন্য জৈব মূলকই দায়ী। তবে এই পরীক্ষায় তিনি আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় প্রায় মারা যেতে যেতে বেঁচে যান। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় দমে না গিয়ে তিনি বিষাক্ত আর্সেনিকের প্রতিষেধকের আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন, এবং বিভিন্ন গবেষণার পর আর্সেনিকের প্রাণঘাতী ক্রিয়ার প্রশমনের নিমিত্ত হাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইড (আয়রণের এক অক্সাইড) আবিষ্কার করেন, তবে প্রত্যেকবারই যে রসায়নাগারের আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর কোন ক্ষতি হোত না তা নয়, একবার এরকম এক বিস্ফো-

রণে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং তাঁর একটা চোখ চিরকালের জন্য হারান। ফলে তিনি জৈব রসায়নের গবেষণা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন। এরপর তিনি আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন।

আলোকের ওপর গবেষণা করতে করতে তিনি আরো বেশী শক্তিশালী তড়িৎ-কোষের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, ফলে ১৮৪১ সালে একটা বিশেষ ধরণের তড়িৎ-কোষ আবিষ্কার করেন। আজও তা "বুনসেন কোষ" নামে পরিচিত। তদানীন্তন কালে অন্যান্য কোষের থেকে বেশী দিন চলত এবং বেশী পরিমাণ তড়িচ্চালক বলও উৎপন্ন করত। একই বছরে জার্মানীর "ব্লাস্ট ফার্নেস" সম্বন্ধেও গবেষণা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, উৎপন্ন তাপের প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। এই সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং দেখেন যে, সেখানকার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলোর দক্ষতা মাত্র কুড়ি শতাংশ, পরে জার্মানীতে ফিরে এসে তিনি এক ধরণের তাপ অন্তরক পদার্থের উদ্ভাবন করে "ব্লাস্ট ফার্নেসের" তাপ ক্ষয়ের পরিমাণ কমান।

১৮৪৪ সালে আলোক বিজ্ঞানের ওপর কাজ করতে করতে "ফটোমিটার" আবিষ্কার করেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন আলোক উৎসের উজ্জ্বলতা নির্ধারণ করা যায়। এরপর ১৮৫৫ সালে ম্যাথিথেসেনের সঙ্গে একযোগে সর্বোত্তম হালকা ধাতু লিথিয়ামকে পৃথক করতে সমর্থ হন। লিথিয়াম অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিথিয়াম-লবণ তৈরী করে এবং টকটকে লাল রঙের শিখার সঙ্গে আগুনে জ্বলে। তার এই ধর্মের জন্য তার বিভিন্ন যৌগ আতসবাজীতে ব্যবহৃত হয়।
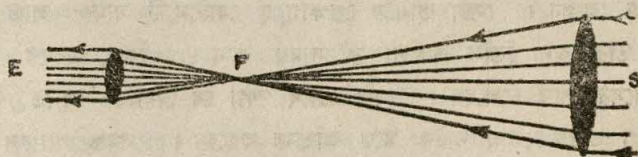
তবে তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ। ১৮৫৯ সালে তিনি কারশফের সঙ্গে মিলে এই যন্ত্র নির্মাণ করেন, এই যন্ত্রে প্রতিসরণের দ্বারা আলোককে তার বিভিন্ন বর্ণের উপাদানে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক মৌল উত্তপ্ত অবস্থায় তার বৈশিষ্ট্যগত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক নির্গত করে, এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক নির্ধারণ করে কোন মৌলকে নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বলা হয় "বর্ণালী-বিশ্লেষণ"

এই পদ্ধতির মাধ্যমেই নবনির্মিত বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের সাহেব্য বুনসেন ১৮৬০ সালে দুটো নতুন মৌল—সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮৬৮ সালে বুনসেস "ফিল্টার পাম্প" উদ্ভাবন করেন, এই পাম্প গবেষণাগারে দ্রবণ বিশুদ্ধি করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। "রাসায়নিক সংযোজনের ফলে তাপ উৎপন্ন তাপ—"—এই তত্ত্ব তিনি জানতেন। সেজন্য এই উৎপন্ন তাপ পরিমাপের জন্য বুনসেন ১৮৭০ সালে "বরফ ক্যালরিমিটার এবং ১৮৭৭ সালে "বাষ্প ক্যালরিমিটার" নির্মাণ করেন, যদিও এ দুটো একই উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হোত কিন্তু তফাত শুধু এইটুকু যে প্রথমটায় বরফ ব্যবহার করা হোত এবং দ্বিতীয়টায় গ্যাস।

অবশেষে ১৬ই আগষ্ট, ১৮৯৯ সালে জগত বুনসেন নামে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে চিরকালের জন্য হারায়।

............ক্লড বারনার্ড............

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৩—১৮৭৮)

১৮৩৪ সাল, একুশ বছরের এক আঙ্গুর-চাষীর ছেলে, বগলে একটা নাটক নিয়ে তাঁর মাতৃভূমি বিউজোলেইসের শহরতলী ছেড়ে প্যারিসের পথে পা বাড়ালেন। নাটকটা তাঁরই লেখা ; এক পূর্ণদৈর্ঘ্যের ঐতিহাসিক নাটক, নাম "আর্থার ডি ব্রেট্যাগনে," এর আগেও তিনি একটা ছোট রোমাণ্টিক কমেডি লেখেন। সেটা স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে মোটামুটি সাফল্য লাভ করে এবং তার জন্য তিনি একশো ফ্রাঁ দামও পান। কিন্তু এবারে তিনি প্যারিসের পথে চলেছেন। তাঁর চোখে স্বপ্ন যে বিখ্যাত বিখ্যাত অভিনেতারা তাঁরই লেখা নাটক মঞ্চে অভিনয় করবেন। সমস্ত প্যারিস তাঁর জয়জয়কার করছে। তারা বলছে যে, না এবার একজন সত্যিকারের বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে! তিনি এই সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে অবশেষে প্যারিসে তাঁর নাটকটা নিয়ে সরবোনের এক সাহিত্য অধ্যাপক ও এক সংবাদপত্রের নাট্য-সমালোচকের সঙ্গে দেখা করেন, সমালোচক তাঁর নাটকটা পড়ে মন্তব্য করেন যে নাটকটার কোন সাহিত্যিক উৎকর্ষতাই নেই। এছাড়া সমালোচক তাঁকে আরও উপদেশ দেন যে তিনি ফার্মেসিতে কিছু কাজ করেছেন, এজন্য তিনি যেন ডাক্তারী পড়েন এবং

অবসর সময়ে যেন এই সমস্ত লেখেন। ফলে নাট্যকার হওয়া তাঁর আর হল না। তাঁরা রঙ্গীন কল্পনার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে শাপে বর হল! তিনি এরপর চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ করেন এবং একজন বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এই ব্যর্থ নাট্যকার এবং পরে একজন সফলকাম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ক্লড বারনার্ড ১৮১৩ সালে বিউজোলেইসের শহরতলীর এক আঙ্গুর চাষীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গরীব থাকায় ক্লডের শিক্ষালাভ বেশী দূর পর্যন্ত এগোতে পারে না। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি লাইয়নসের এক ওষুধের দোকানে কাজে ঢোকেন, এই দোকানে কাজ করবার সময় তিনি মাঝেমধ্যেই কাছের এক পশুচিকিৎসার স্কুলে রুগ্ন পশুদের চিকিৎসার জন্য অষুধ নিয়ে যেতেন, স্কুলে তিনি পশুদের ওপর নানান রকমের অঙ্গব্যবচ্ছেদ ও শল্য-চিকিৎসা দেখতেন। পরে তিনি নাটকের দিকে ঝোঁকেন ও ব্যর্থ হয়ে প্যারিসের "কলেজ ডি ফ্রান্সে" ডাক্তারী শিক্ষায় নাম লেখান। এইখানে তিনি রোগবিদ্যার এক বিখ্যাত অধ্যাপক ফ্র্যানকোইস ম্যাজেনডাইয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং এরই ফলে তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়, ম্যাজেনডাই প্রথাগত পদ্ধতিতে না পড়িয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের সমস্ত কিছু বোঝাতেন, ফলে বারনার্ডের মধ্যে এক গভীর জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং এই স্থানই তাঁকে ভবিষ্যৎ সফলতা প্রদান করে।

ম্যাজেনডাইয়ের অধীনে গবেষণা করে তিনি ১৮৪৩ সালে মুখের স্নায়ুর ছোট ছোট শাখাগুলোর বিন্যাস ও স্বাদ-গ্রন্থি এবং এবং লালা-নিঃসরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "অন দি কর্ডা টিমপ্যানি" প্রকাশ করেন। এরপর "অন দি গ্যাসট্রিক জুস এ্যাণ্ড ইটস ফাংশান ইন ডাইজেসন"-এর তাঁর এম, ডি, থিসিস সম্পূর্ণ করেন। একই বছরে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের প্রধান প্রধান অংশগুলোও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের খাদ্য হজমের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন এবং গবেষণা দ্বারা দেখান যে অগ্ন্যাশয় হতে নিঃসৃত রস চর্বিজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে মিশে তাকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। তিনি আশা করেন যে তাঁর এই বর্ণনায় তিনি বৈজ্ঞানিক পরিচিতি লাভ করবেন। কিন্তু ফ্যাকাল্টি কমিটির একজনের পরীক্ষায় বারনার্ডের এই তত্ত্ব তিনি ভুল প্রমাণ করেন। ফ্যাকাল্টি কমিটির পরীক্ষায় দেখা যায় যে গবাদি পশুদের অগ্ন্যাশয় নালী যদি বন্ধ করা যায় তাহলেও

তারা চর্বি-জাতীয় খাদ্য হজম করে ফেলে। পরে বারনার্ড প্রমাণ করেন যে গবাদি পশুদের একটা অতিরিক্ত অগ্ন্যাশয় নালী আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত দুটোই বন্ধ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া চলবে। সুতরাং বারনার্ডের মতবাদের ওপর আর কোন সন্দেহই রইল না।

এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার—"যকৃতের গ্লাইকোজেনিক প্রক্রিয়া," সম্পন্ন করেন। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, কোন জন্তু কার্বোহাইড্রেট ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করলেও তার যকৃত থেকে অবিরাম গ্লুকোস উৎপন্ন হয় এবং তা রক্তে যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, বেশ কয়েকদিন অনাহারে আছে এমন জন্তুরও যকৃত থেকে গ্লুকোজ নিঃসরণ হয়। তাঁর মতে যকৃতের মধ্যে প্রবেশকারী গ্লুকোস, গ্লাইকোজোন পরিবর্তিত হয়। নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার দ্বারা যকৃতের মধ্যে জমা গ্লাইকোজেন গ্লুকোসে পরিবর্তিত করা যেতে পারে এবং তা দিয়ে শরীরের কোষকলার অবিরাম প্রয়োজনও সরবরাহ করা যেতে পারে। এরপর তিনি এই গ্লুকোসের নিয়ন্ত্রক স্নায়ুর খোঁজ করেন। এই সময়ই পরীক্ষাকালে আকস্মিক তিনি এক পশুর মস্তিষ্কের পেছনদিকে একটা ভীষণ আঘাত করে ফেলেন। এবং সবিস্ময়ে দেখেন যে তার মধ্যে তদানীন্তন কালের সাংঘাতিক রোগ "ডায়াবেটিস মেল্লিটাসের" সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এই রোগে রক্ত এবং মূত্রে শর্করার পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে যায়। আঘাতের ফলে পশুর অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের আঘাত পায় এবং অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাড্রিনালিন নিঃসৃত হতে থাকে। ফলে জানা গেল যে এই নিঃসরণের ফলেই গ্লাইকোজেন গ্লুকোসে রূপান্তরিত হয় এইভাবে বারনার্ড গ্লাইকোজেন রূপান্তরের সমস্যার একটা হদিশ দিয়ে যান।

বারনার্ড যকৃতের ওপর নানান গবেষণা করেন। তিনি যকৃতের নাম দেন "veritable little chemical laboratory" যকৃতের ওপর গবেষণা থেকে তিনি মন্তব্য করেন যে, শরীরের ভেতরে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলছে তা শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নিয়ন্ত্রণের ফল নয়; এ ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে যে নিঃসরণ হয় তাও এই সমস্ত ক্রিয়া-বিক্রিয়ার জন্য দায়ী। ১৮৫৫ সালে ম্যাজেনডাই মারা গেলে তিনি "কলেজ ডি ফ্রান্সের" পরীক্ষামূলক মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁর ছাত্রদের কাছে তাঁর প্রথম বাক্যটা ছিল: "Experimental medicine, which I am supposed to teach yoh, does not exist." প্রায় পনেরো বছর পর তিনিই আবার বলেন:

"The dawn of experimental medicine is now visible on the Scientific horizon."

বারনার্ড প্রায়ই বলতেন যে শরীর-তত্ত্ববিদ্ হতে গেলে সারাক্ষণই গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কাটাতে হবে। একথা নিজের জীবনেও তিনি মেনে চলতেন, কিন্তু তখনকার দিনের গবেষণাগারগুলো ছিল ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে, গুমোট। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘসময় কাটান এবং অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি পড়াশোনা বন্ধ রাখেন এবং ডাক্তারের উপদেশে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য আবার তাঁর মাতৃভূমি বিউজোলেইসে ফিরে আসেন।

এখানে তিনি "ইনট্রোডাকসন টু দি স্টাডি অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন" লেখেন ও ১৮৬৫ সালে তা প্রকাশিত হয়। এই বই সম্পর্কে পাস্তুর মন্তব্য করেন "Never has anything clearer, more complete or more profound been written about the true principles of the difficult art of Scientific experimentation."

তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য তিনি ১৮৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমিয়ে ডেস সায়েন্সেসে মনোনীত হন। এমন কি নেপোলিয়নও তাঁকে সেনেটর পদে নির্বাচন করেন। অবশেষে ১৮৭৮ সালে বারনার্ড মারা গেলে ফ্রান্সে জাতীয় শোক পালন করা হয়। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এই সম্মান লাভ করেন। শুধু ফ্রান্স কেন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতই এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে।

ইগনাজ ফিলিপ সেম্মেলওয়েস

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৮—১৮৬৫)

১৮৪৫ সাল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল থেকে তিনটে বাড়ী পরের এক ছোট্ট গলি। একজন ভিয়েনা পুলিসকে গলির মুখ থেকে একদল উৎসুক জনতার ভীড় সরাতে ব্যস্ত দেখা গেল। কি ব্যাপার? না দেখা গেল একজন তরুণ ডাক্তার এক স্ত্রীলোকের শরীর থেকে একটা ফুটফুটে বাচ্চা প্রসব করালেন। তরুণ ডাক্তার সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস

করলেন যে সে এত দেরীতে কেন হাসপাতালের দিকে রওনা দিয়েছে।
তার জবাবে সেই স্ত্রীলোকটি বলল সে ভিয়েনা হাসপাতালের চেয়ে রাস্তায় বাচ্চা জন্ম দেওয়াকে বেশী নিরাপদ বলে মনে করে, এবং এটাই নির্মম সত্য! কারণ হাসপাতালে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার দিনের পর দিন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। হাসপাতাল থেকে দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে রাস্তা-ঘাটে, হাতুড়ে ধাইদের দিয়ে বাচ্চা প্রসব হলে বাচ্চার মায়েরা বেঁচে যাচ্ছে। কিন্তু হাসপাতালে অভিজ্ঞ, দক্ষ ডাক্তারের সাহচর্যে, উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাচ্চা প্রসব হলেও কিন্তু বাচ্চার মায়েরা আর বাঁচছে না। সবারই এক ঘটনা, প্রসবের পরেই, সব শেষ, একে তখন ইউরোপে বলা হোত "সন্তান প্রসবঘটিত জ্বর।" যদিও এটা তখনকার ডাক্তারদের বিব্রত করে তুলেছিল, তবুও এ সম্বন্ধে তাদের প্রায় হাত পা বাঁধা ছিল। এর কারণ হিসেবে কারোর মত—ভয় অথবা বাতাস চলাচলের অসুবিধে অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তন, আর নামকরা ডাক্তারদের মত—বাতাসকে সংক্রামণ করে যে বিষাক্ত বাষ্প (মিয়াসমাস) তার ফলেই এই রোগ হয়। পরে এই ভয়ঙ্কর, অভিশপ্ত রোগের পরিত্রাতা হিসেবে যিনি জগতের কাছে তাঁর এক অবদান রেখে যান তিনিই হচ্ছেন ইগনাজ ফিলিপ্প সেম্মোলওয়েস—তিনিই সেই রাস্তায় প্রসব করান তরুণ চিকিৎসক।

ফিলিপ্প সেম্মেল ওয়েস জাতিতে একজন হাঙ্গেরীয়। ১৮১৮ সালে বুদায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পেস্ট ও ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যানাটমিকাল লেকচার শুনে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, আইন পড়া ছেড়ে ডাক্তারী পড়াতে শুরু করেন। ডাক্তারীতে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল ধাত্রীবিদ্যা।

১৮৪৪ সালে ভিয়েনা থেকে ডিগ্রি পাবার পর সেখানকারই প্রসূতি সদনে যোগ দেন। ভিয়েনা হাসপাতালে তখন দুটো প্রসূতি সদন ছিল; প্রথমটার স্টাফ ধাত্রীবিদ্যার ছাত্ররা, ফিলিপ্প প্রথমটায় যোগ দেন। যদিও দুটোতেই প্রসবের পর বাচ্চার মায়েরা মারা যেত। কিন্তু তুলনামূলক মৃত্যুর হার দ্বিতীয়টাতে অনেক কম।

ফিলিপ্প এই মৃত্যুর কারণের জন্য তখনকার প্রচলিত মতবাদ স্বীকার করতেন না, তারই ফলে তাঁর ওপরওয়ালা ড. জোহান ক্লেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ফিলিপ্পকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু কিছু বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে তিনি আবার ঐ পদে ফিরে আসেন, এরই মধ্যে একজন ছিলেন ডঃ ফিলিপ

কোল্লেৎসকা। কোল্লেৎসকা একদিন অটোপ্সি করার কালে তাঁর একটা আঙুল কেটে ফেলেন। ফলে বিষাক্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ সমস্তই "সন্তান-প্রসব ঘটিত" মৃত্যুর লক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়। এই ঘটনার ফলে ফিলিপ্প "সন্তান-প্রসব-ঘটিত" মৃত্যুর স্পষ্ট কারণ উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে ডাক্তারেরা অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করার পর তাদের হাতে নানান জীবাণু লেগে থাকে। এই অবস্থায় যখন তারা আসন্ন সন্তান সম্ভবা স্ত্রীলোকদের দেখা-শোনা করেন তখন তারা এই সমস্ত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ফলে প্রসবের পরই বেশীরভাগই মায়েরাই মারা যায়। সেইজন্যই তিনি বললেন যে, প্রসূতি ওয়ার্ডে ঢোকার আগে প্রত্যেক ডাক্তারকেই ঠিকমত সংক্রামক-রোগ বীজনাশক পদার্থ দ্বারা হাত পরিস্কার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪৭ সালের ১৫ই মে ভিয়েনা হাসপাতালের প্রসূতি সদনের দরজায় একটা নোটিশ লাগান। এই নোটিশ অনুযায়ী প্রত্যেক ডাক্তারকে ঢোকার আগে ক্লোরিন জল দিয়ে ভাল করে হাত ধুতে হোত। এর ফলে ১৮৪৬ সালে যেখানে মৃত্যুর হার ছিল ১১·৪ ০/০, ১৮৪৭ সালে তা কমে দাঁড়াল ১·২৭ ০/০।

তাঁর এই সাফল্যে ঈর্ষা ও বিক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তাঁর ওপরওয়ালা তাঁকে আবার বরখাস্ত করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি পেস্টের প্রসূতি হাসপাতালে চাকরি পেয়ে যান। এখানে এসেও তিনি ভিয়েনার মত একই অবস্থা দেখেন। এই হাসপাতালে ছয় বছর থেকে তিনি মৃত্যুর হার কমিয়ে ·৮৫ ০/০ নামিয়ে আনেন।

এরপর তিনি এই বিষয়ের ওপর একটা বই লেখেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর বই "দি কস, কনসেপ্টেস, এ্যান্ড প্রফিন্যাক্সিস অফ চাইল্ডবেড ফিভার" প্রকাশিত হয়। এই বই তাঁর সময়ে প্রায় পড়ানোই হোত না, তাহলেও আজকের দিনে ডাক্তারী ঐতিহাসের একটা ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর এই রোগের সম্পর্কে মতবাদ তাঁকে লিস্টার, পাস্তুর জেনার প্রমুখদের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর ডানহাতের এক ক্ষত বিষিয়ে ওঠায় তিনি ১৮৫৬ সালের ১৭ই আগস্ট মারা যান, যে রোগের বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন তাঁর বিরোচিত সংগ্রাম করেন অবশেষ সেই রোগেরই শিকার হয়ে তিনি মারা যান।

জেমস প্রেসকট জুল

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৮—১৮৮৯)

শক্তির নিত্যতা সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের একটা অন্যতম মৌলিক নীতি। এই সূত্র অনুযায়ী, শক্তির সৃষ্টি নেই ; শক্তি বিনাশও নেই। শক্তির শুধুমাত্র রূপান্তর আছে, অর্থাৎ শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। এই সূত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে যাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাস অমর হয়ে আছে, তিনি হলেন জেমস প্রেসকট জুল।

জেমস প্রেসকট জুল, ১৮১৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চস্টারের কাছে স্যালফোর্ডে একজন সম্পন্ন মদ্য ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় ছেলে হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। শক্তসমর্থ না থাকায় তিনি বাড়ীতেই বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের অধীনে পড়াশোনা করেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর গৃহশিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন, "পদার্থের পরমাণু তত্ত্বের জনক" জন ডালটন। যদিও তিনি বাবার ব্যবসায়ে ইতিমধ্যেই কাজ করতে শুরু করেন তবুও ডালটনের সংস্পর্শে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে অবসর সময়ে নিজের বাড়িতেই কিছু পরীক্ষা শুরু করেন। কৈশোরেই তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় সম্পর্কে স্বকীয় পরীক্ষা করতে থাকেন। ফলস্বরূপ ১৮৪০ সালে জুল লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে, বিদ্যুত প্রবাহের ফলে উৎপন্ন রূপ, পরিবাহীর রোধ, মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের ফলে উৎপন্ন তাপ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার প্রথম প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, তড়িত প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার প্রথম প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, তড়িৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপ, পরিবাহী রোধ; পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের বর্গের এবং সময়ের সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক। গাণিতিক ভাষায়, $H \propto I^2 R t$, [যেখানে H = উৎপন্ন তাপ ; I = প্রবাহিত তড়িত, R = রোধ ; এবং t = সময়]।

তবে জুলের সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার হল, যান্ত্রিক শক্তি ও তাপ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক, ১৮৪৭ সালে ম্যানচেষ্টারের সেন্ট অ্যান চার্চের হলঘরে, যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি এবং তড়িত শক্তির মমতা সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক মতবাদ তিনি বর্ণনা করেন। তাঁর হিসেবে ৭৭২

ফুট-পাউণ্ড কার্য্যের বদলে এক ব্রিটিশ থারমাল একক পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় (কিন্তু আজকে ৭৭২ ফুট-পাউণ্ডের বদলে ৭৭৮ ফুট-পাউণ্ড ব্যবহৃত হয়)। গাণিতিক ভাষায় তাঁর এই সূত্রকে W=jQ হিসেবে প্রকাশিত করা যায়। [যেখানে W=উৎপন্ন কার্য্য ঃ Q=উৎপন্ন তাপ এবং J= "জুলের যান্ত্রিক তুল্যাংক]। তাঁর এই সূত্র তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নামেও অভিহিত করা হয়।

এরপর তিনি গ্যাসের শীতলতা নিয়েও গবেষণা করেন, তিনি বলেন যে, বায়ু সংকোচনের ফলে যদি তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে বায়ুর প্রসারণের ফলে শৈত্য উৎপন্ন হবে, এই সম্বন্ধে থমসনের সংগে একযোগে গবেষণা করে জুল-থমসন" ক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং এর দ্বারাই বাহ্যিক কার্য্য ছাড়া কোন গ্যাস প্রসারিত হলে গ্যাসের তাপমাত্রা যে হ্রাস পায় তাও বর্ণনা করেন। এই আবিষ্কারের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানে গ্যাস তরলীকরণের পদ্ধতি সূচিত হয়।

তবে বিজ্ঞানী হিসেবে সফল হলেও জুলকে কিন্তু শেষ জীবনে আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়। অবশ্য ১৮৭৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন, তিনি জীবনে অনেক সম্মানের অধিকারী হন। ১৮৫২ সালে স্বর্ণপদক, ১৮৬৬ সালে রয়্যাল সোসাইটির 'কপলে' পদক লাভ করেন, এছাড়া ১৮৭২ ও ১৮৭৭ সালে তিনি ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভ্যান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের সভাপতি পদেও নির্বাচিত হন। অবশেষে ১৮৮৯ সালের ১১ই অক্টোবর তিনি তাঁর অবদানের জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁর নামানুসারে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারিক এককের নামকরণ করা হয় "জুল"।

রুডলফ ভারচৌ

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮২১—১৯০২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে জার্মানীর নির্মম শাসক বিসমার্কের অধীনে জার্মান জাতি এক শক্তিশালী মিলিটারী জাতিতে পরিবর্তিত হলো। কিন্তু বিসমার্কের এই নীতিহীন "অস্ত্র ও রক্তের" নীতির বিরুদ্ধে এক তরুণ অথচ তেজস্বী ডাক্তার সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তিনি প্রকাশ্যে এই নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন। বিসমার্ক এই অসামরিক ডাক্তারের সমালোচনায় প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কণ্ঠকে চিরতরে বন্ধ করে দেবার জন্য বিসমার্ক তাঁকে এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। ডাক্তারের একমাত্র অস্ত্র তাঁর শল্য চিকিৎসার ছোট্ট ছুরিটা এবং তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু তিনি এ দুটোকেই মানবজাতির উপকারের নিমিত্ত ব্যবহারের জন্য বিসমার্কের এই আহ্বানে নতি স্বীকার করে নিলেন। তবে যদিও এই রাজনৈতিক যুদ্ধে তিনি পরাজয় স্বীকার নেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক সংগ্রাম তিনি সাফল্যের সঙ্গেই জয়লাভ করেন।

রাজনৈতিক যুদ্ধে ব্যর্থ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রামে সফল এই ডাক্তার রুডলফ ভারচৌ, ১৮২১ সালে জার্মানীর দারিদ্র্য-পীড়িত রাজ্য পোম্যর‍্যানিয়ার এক ছোট্ট শহর ষ্টিভেলবেইনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শহরের কোষাধক্ষ্য ও এক ছোটোখাটো খামারের মালিক হওয়ায় তাঁদের পরিবার মোটামুটি ভদ্রভাবে জীবনযাপন করত। ছোটবেলাতেই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং নতুন নতুন ভাষা জানার প্রতি তাঁর এক আগ্রহ দেখা যায়। মাধ্যমিক স্কুলে তিনি যদিও তাঁর পড়াশোনায় সুনাম অর্জন করেন তবে এইসঙ্গে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে একজন বিদ্রোহী হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে "রাজা" নাম দেয় কিন্তু তাঁর এই "রাজা" নাম তাঁর ভবিষ্যতে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তিনি ডাক্তারী পড়ার দিকে আগ্রহান্বিত হন।

পরিবারের সীমিত আয়ের জন্য তিনি বার্লিনের ফ্রেডরিখ উইল হেল্মের ইনস্টিটিউটে স্কলারশিপ নিয়ে ডাক্তারী পড়তে থাকেন। এই ইনস্টিটিউটে যোগ্য ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ান হোত কিন্তু শর্ত থাকত

এই যে তাঁকে সেনাদলে ডাক্তারী হিসেবে কাজ করতে হবে। এইখানে তিনি জোহান্‌নেস মুয়েল্লারের অধীনে ডাক্তারী পড়তে থাকেন। জোহান্‌নেস প্রাচীন পদ্ধতি ছেড়ে পরীক্ষামূলক ডাক্তারী শাস্ত্রে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ফলে রুডলফ্‌ একটা নতুন চিন্তাধারা নিয়ে ডাক্তারী পাশ করলেন। এরপর শর্ত মতো বার্লিনের চ্যারিটে হাসপাতালে সেনা-ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন। এইখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গরীব অথর্ব লোকদেরও চিকিৎসা করতেন এবং তাঁর নিজস্ব গবেষণাও করতে থাকেন। ফলে তিনি ধমনীপ্রবাহ রে-গের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। এই রোগে রক্ত জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণ করা যায় এবং গরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক করা যায়। রুডলফই প্রথম আজকের "এমবোলিজম" অর্থাৎ জমাট বাঁধা রক্তাদি দ্বারা ধমনীর পথরোধ রোগের প্রথম আবিষ্কর্তা। রুড্‌মফ কিন্তু রোগ পর্যবেক্ষণের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভূমিকার কথা উপলব্ধি করেন। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক মুমূর্ষু রোগীর রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়েই তিনি লিউকোমিয়া নামে একটা নতুন রোগ আবিষ্কার করেন। এই রোগে রক্তের মধ্যে আকস্মিক ভাবে শ্বেত কণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চ্যারিটে হাসপাতালের প্যাথোলজিক্যাল অধ্যাপক হন। এই সময় গবেষণার উদ্দীপনা ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের আন্তর্জাতিক বিনিময়ের জন্য তিনি "আরচিও ফার প্যাথোলজিয়ে" নামে একটা জার্মান মেডিকেল জার্নালের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পঞ্চাশ বছরেরও বেশী এই জার্নালের সম্পাদক পদে থাকেন।

১৮৪৭ সালে জার্মান রাজ্যের আপার সাইলেসিয়ান পোলিশবাসীদের মধ্যে এক ভয়ংকর মহামারী দেখা যায়। এর তদন্তের জন্য কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে তিনি সেখানে যান। সেখানে গিয়ে অবহেলা ও অনাহারে অসাধ্য শিশুর মৃত্যু তাঁকে মর্মাহত করে। তিনি এ সম্বন্ধে সরকারের নীতির ওপর সরাসরি দোষারোপ করেন এবং আরো উন্নত মানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ সংস্কার ব্যবস্থার কথা বলেন। ১৮৪৯ সালে তিনি উর্জবার্গের মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং বার্লিন ত্যাগ করেন। উর্জবার্গে তিনি সাত বছর অতিবাহিত করেন। এবং এই সাতটা বছর তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যেই তিনি কোষীয় রোগ বিদ্যার বৈপ্লবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে এক কোষ থেকেই অপর কোষের সৃষ্টি হয়; কোষের গঠন এবং ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতার ফলেই রোগের সৃষ্টি হয়,

বিভিন্ন রোগে পৃথক পৃথক কোষীয় পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তন বায়োপ্সিতে গৃহীত কোষকলার সূক্ষ্ম অংশ "ডাই সেলুলারপ্যাথোলজিয়ে" ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। ফলে কোষ পর্যবেক্ষণের নতুন পদ্ধতির ডাক্তারী শাস্ত্রে বিকাশ ঘটল। এই পদ্ধতির সাহায্যে ক্যান্সার রোগেরও অনেক আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় এবং লক্ষ লক্ষ লোকের অমূল্য জীবন রক্ষা হয়।

তাঁর প্রতিভার মর্যাদা হিসেবে ১৮৫৬ সালে তিনি আবার বার্লিনে আমন্ত্রিত হন এবং নতুন প্যাথোলজিকাল ইনস্টিটিউটের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। এই পদেই তিনি জীবনের বাকী ছেচল্লিশটা বছর কাটান। এই সময় তিনি বিভিন্ন ধরণের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে ট্রাইচিনোসিস রোগের জীবাণু ট্রাইচিনেলা স্পাইর্যালিস আবিস্কার করেন। তিনি দেখান যে এই জীবাণু কিভাবে শুওরের মাংসে জন্মায় এবং মানুষ ও অন্যান্য জন্তুদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে ১৮৬৩ সালে তিনি একটা প্রবন্ধ লেখেন ও মাংস পরীক্ষা করার এক পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে জার্মানী থেকে ট্রাইচিনোসিস রোগ বিলুপ্ত হয়।

এছাড়া জলস্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাঁর অবদান আছে। ১৮৭০ সালে বার্লিনে হঠাৎ শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। এ সম্বন্ধে তিনি উপলব্ধি করেন যে ময়লা-জল নিকাশের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। তখন তিনি পর্যাপ্ত ড্রেন-ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় জল সরবরাহের প্রস্তাব দেন। ফলে ১৯০০ সালের মধ্যেই সমগ্র জার্মানী এই ব্যবস্থায় বহুল উপকৃত হয়। শুধু তাই নয়, সমগ্র ইউরোপে এখন এই ব্যবস্থাই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ডাক্তারী শাস্ত্র ছাড়া নৃতত্ব ও প্রত্নবিদ্যায়ও তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। একটা সাধারণ মত প্রচলিত আছে যে টিউটন গোষ্ঠীভুক্ত জার্মানরা সবাই সাধারণত লম্বা সুন্দর দেহবর্ণ যুক্ত, সোনালী চুল ও নীল চোখযুক্ত। কিন্তু রুডলফ প্রায় সাত লক্ষ ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে মাত্র বত্রিশ শতাংশের মধ্যে এই বৈশিষ্ট দেখা যায়। এমনকি একই বৈশিষ্ট ইহুদি ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রায় এগারো শতাংশেরও বেশী পাওয়া যায়। তাঁর মতে কোন জাতিই একে অপরে থেকে সর্বসেরা নয়। প্রত্যেক জাতি-রই কিছু না কিছু দান বিজ্ঞানে আছে। এছাড়া ১৮৭১ সালের আলোড়নকারী ট্রয় নগরীর আবিষ্কর্তা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হেইনরিখের সঙ্গে ১৮৭৯ সালে

রুডলফ এক প্রত্নতত্ত্ব অভিযানে বেরোন। রুডলফের অনুরোধেই বন্ধু হেইনারিখ তাঁর সংগ্রহ ট্রোজান সম্পত্তি বার্লিনের সংগ্রহশালায় উপহার দেন।

অবশেষে ১৮৯০ সালে ৮১ বছর বয়সে বার্লিনের ট্রামগাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে একদিন তাঁর পা ভেঙ্গে যায়, বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে, অবশেষে একই বছরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। জীবিত অবস্থায় তিনি অনেক উপাধিই পরিহার করেন। তাঁর মতে কোন মানুষেরই তার পরিবারের বা বংশ মর্যাদার দাবী করা ঠিক নয়। তার মতে কোন মানুষের সত্যিকারের যশ হচ্ছে তার মানব সমাজের প্রতি অবদান।

গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮২২—১৮৮৪)

১৮৬৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর শীতের সন্ধ্যা। ধর্মযাজক মাথায় কালো টুপি ও গায়ে কালো কোট চাপিয়ে মঠ থেকে বরফে ঢাকা রাস্তায় পা দিলেন। পকেটে কতকগুলো ভাঁজ করা কাগজ। চলেছেন তিনি ব্রুন সোসাইটিতে তাঁর গবেষণার কথা বক্তৃতা দিতে। কিন্তু সোসাইটিতে গিয়ে আশাহত হলেন। গুটি কয়েক মাত্র সদস্য বসে আছেন। বেশ শান্ত গলায় ধীর-স্থির ভঙ্গিতে তার দীর্ঘ আট বছরের গবেষণার ফসল পকেটের কাগজগুলো পড়তে শুরু করলেন। তাঁর গবেষণা উদ্ভিদের সংকর পরনিষেকতা নিয়ে। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ফল পড়ছেন আর শ্রোতাদের চোখে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই উত্তেজনা, যা তিনি গবেষণাকালে উপলব্ধি করেন, খুজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু না, ব্যর্থ হলেন। কোনরকম উত্তেজনা তো তাঁদের নেইই। কিন্তু একটা একঘেয়েমীর ভাব। একজন তো ফিসফিস করে পাশের একজনকে বলেই ফেললেনঃ "সামান্য মটর গাছের বৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করেই আট-আটটা বছর কাটিয়ে দিলেন—সময়ের কি নিদারুণ অপচয়।" পড়া শেষ করে তিনি বসে পড়লেন। শ্রোতাদের কারোর মধ্যেই কোনও রকম উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। তবে যদিও সেদিন কেউই তা উপলব্ধি করতে পারেন নি, কিন্তু আজকে বিজ্ঞান জগতে তাঁর গবেষণায়

কথা সবাই মেনে নেন। আজ সবাই জানে যে জীবের বৈশিষ্ট্য জীব সৃষ্টি। এই সৃষ্ট জীবের সঙ্গে তার পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষ সাদৃশ্য থাকে। পিতামাতার চরিত্রগত, আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এক জনন থেকে পরবর্তী জননে সঞ্চালনকেই উত্তরলব্ধি বা বংশগতি বলে। এই বংশ-গতির বিজ্ঞান সম্মত ভিতই আজ থেকে একশো বছরেরও বেশী আগে ১৮৬৫ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী সেই অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল প্রতিষ্ঠা করেন।

জোহান মেণ্ডেল ১৮২২ সালের ২২শে জুলাই অস্ট্রিয়ান রাজ্য সাইলেসিয়াতে হেইনজেনডর্ফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অ্যাণ্টন এক গরীব খামার-কৃষক হওয়া সত্বেও, নানান অসুবিধে করে জোহানকে লিপনিকের স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাঁর পরিবার কোনমতে তাঁর স্কুলের মাইনে দিতে পারতেন; সেজন্য জোহানকে প্রায়ই না খেয়ে স্কুলে যেতে হোত, অন্যান্য প্রয়োজন মেটান তো দূরের কথা! এত অসুবিধে হওয়া সত্বেও তিনি কিন্তু স্কুলে ভালই ফল করেন। আস্তে আস্তে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে অলমুৎজের ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করেন। তাঁর আর্থনৈতিক দূরবস্থা এবং জ্ঞানের জন্য চাহিদার কথা শুনে, তাঁর এক অধ্যাপক অল্টব্রুনের অগাষ্টিনিয়াম মঠে শিক্ষার্থী হবার জন্য তাঁকে আবেদন করতে বলেন। অল্টব্রুন তখন দর্শন, অংক, বিজ্ঞান ও সঙ্গীত শিক্ষার পীঠস্থান ছিল। সেখানে ১৮৪৩ সালের ৯ই অক্টোবর জোহান প্রবেশ করেন এবং প্রথানুযায়ী তাঁর নামের আগে গ্রেগর যুক্ত হয়।

১৮৪৭ সালে তিনি যাজক পদে উন্নীত হন এবং খুব সংক্ষিপ্ত কালের জন্য এক যাজক-পল্লীত যাজক হয়ে মঠ ছেড়ে যান। কিন্তু সেখানে পল্লীবাসীদের দুরাবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত হন। এই অবস্থা তার ভাল লাগে না। তিনি আগের মতো মঠের সহকর্মীদের সঙ্গে পড়াশোনার আলোচনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর এই ইচ্ছের কথা শুনে এক যাজকবন্ধু তাঁর হয়ে ওপরওয়ালাদের বললেন যে জোহানকে অধ্যাপনার একটা সুযোগ দেওয়া হোক। সেজন্য তিনি মঠেই আবার ফিরে যান এবং ব্রুনের স্থানীয় এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অংক এবং গ্রীক সাহিত্যের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালে প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁকে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা দিতে বলেন, পরীক্ষায় পরীক্ষকরা যদিও তাঁর প্রাকৃতিক ইতিহাস ও প্রাথমিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অসাধারণ প্রতিভার কথা জানলেন কিন্তু একই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের

ও প্রথাগত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবের কথাও অবগত হলেন। পরীক্ষকদের মতে তিনি তাঁর নিজের ধারণা ও প্রথাগত নামকরণের বদলে নিজের দেওয়া নামই ব্যবহার করেন। ফলে পরীক্ষায় তিনি ব্যর্থ হন। এর পরের বছরই ১৮৫৯ সালে তাঁরই পরীক্ষকদের একজন, এক অধ্যাপকের প্ররোচনায়, জোহানকে দু বছরের জন্য ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক, পদার্থ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরে ব্রুনে ফিরে এসে আবার পরীক্ষায় বসেন এবং সেবারও ব্যর্থ হন। তা সত্বেও পরের চৌদ্দটা বছর ব্রুন হাই-স্কুলে পরিবর্তি শিক্ষকের পদে অর্ধেক মাইনেতে প্রাকৃতিব বিজ্ঞান পড়িয়ে যান।

তবে অধ্যাপনা তাঁর জীবনের একটা দিক ছিল। অন্যদিকে তাঁর প্রকৃতির সৃষ্টির রহস্য সমাধানের তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষক মানসে উঁকি দিত যে জীবজগতে একই প্রজাতির মধ্যে রঙে, আকারে আকৃতিতে কেন এত পার্থক্য। এজন্য ১৮৫৬ সালে তিনি তাঁর দীর্ঘ আট বছরের ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু করেন তিনি অল্টব্রুনের মঠের একটা ছোট্ট বাগানের মটরশুঁটি গাছ নেন। প্রায় দু' বছর পর্যবেক্ষণ করে তিনি পরস্পর বিপরীতধর্মী লক্ষণ-মটরগাছ বেছে নেন। তাঁর নির্বাচিত গাছগুলো ছিল খাঁটি অর্থাৎ গাছগুলোর যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন ভাবেও তার মধ্যে ছিল না। তিনি বিশুদ্ধ দীর্ঘকায় চরিত্রের এবং বিশুদ্ধ খর্বকায় চরিত্রের দুটো মটর গাছের মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জনন সম্পাদন করেন। এটা করতে তিনি এক গাছের ফুলের পরাগ নিয়ে বিপরীত অ্যালিলের গর্ভমুন্ডের ওপর স্থাপন করে পরাগ যোগ সম্পন্ন করেন। এইভাবে সংকর গাছ উৎপাদন করে মেন্ডেল মটরগাছের সাতপ্রস্থ বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার করেন। একটামাত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টি রেখে তিনি যে গবেষণা পরিচালনা করেন তাকে মনোহাইব্রিড বা একসংকর পরনিষেক বলে। তিনি দেখান যে, লম্বা ও বামন গাছের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটলে প্রথম পুরুষের গাছগুলোর মধ্যে ইতর পরাগ-সংযোগ করলে দ্বিতীয় পুরুষে চার ভাগের তিন ভগ গাছ লম্বা ও এক ভাগ বামন হয় অর্থাৎ অনুপাত ৩ঃ১। তিনি প্রথম পুরুষ প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে (লম্বাগুণ) ডমিনেন্ট এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে (বামনগণ) রিসেসিও নামকরণ করেন। বিপরীত বৈশিষ্ট্যের এক পৃথককরণ লক্ষ্য করেই তিনি বংশগতি সম্বন্ধে তাঁর "পৃথকীকরণ সূত্র" আবিষ্কার করেন। এই সূত্রানুযায়ী, নিষেককালে বিপরীতধর্মী গুণ কখনোই পরস্পর মিশে যায় না। জননকোষের সৃষ্টির সময় এরা পৃথক হয়ে যায়, যা

গ্যামেটগুলোতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া পরবর্তী বংশবৃদ্ধিতে সংকর প্রজাতিগুলোর মধ্যে ডমিনেন্ট চরিত্রের অনুপাত আগের মতোই ৩ঃ১। এরপর তিনি দুপ্রস্থ বৈশেষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে ডাইহাইব্রিড বা দ্বিসংকর পরনিষেক গবেষণা করেন। ফলস্বরূপ তাঁর দ্বিতীয় সূত্র—"যুক্ত সঞ্চারণ সূত্র" আবিস্কৃত হয়। এই সূত্র বলে, বিপরীতধর্মী একজোড়া বৈশিষ্ট্য অন্য জোড়া বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নহে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বংশ পরম্পরায় তার প্রকাশ ঘটে। এই দ্বিসংকর পরনিষেকে প্রজাতির মধ্যে ডমিনেন্ট চরিত্রের অনুপাত ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১

বংশগতির এই নীতিগুলোই গ্রেগর মেণ্ডেল মঠের বাগানে গবেষণা করে উদ্ভাবন করেন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার স্থান ব্রুন সোসাইটিতে গিয়ে পাঠ করেন। তবে সেদিন যদিও এই স্বশিক্ষিত প্রকৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণাকে কেউই মর্যাদা দেয় নি, তবুও নিজের কাজের গুণে তিনি মঠের মোহান্ত পদে উন্নীত হন। কিন্তু শেষ জীবনে মঠের করসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে এবং কিছু ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মতবিরোধ হয়।

তাঁর এই অনুসন্ধানের ফল ১৮৬৫ এবং ১৮৬৯ সালে ব্রুনের ন্যাচারাল সায়েন্স সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর এই আবিষ্কার সমাদর লাভ করে নি। পরে তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর ১৯০০ সালে, হল্যাণ্ডের দ্য ভ্রিস, জার্মানীর কোরেন্স এবং অস্ট্রিয়ার সারমাক এই তিন বিজ্ঞানী পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণা করে মেণ্ডেলের সেই মূলতত্ব পুনরাবিষ্কার করেন। এঁদের আবিষ্কারের ফলেই মেণ্ডেল আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মারা যাবার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর এই নম্র, সুশিক্ষিত বিজ্ঞানীকে যিনি কিনা এক ছোট্ট বাগানে আট বছর নিরলস গবেষণা করে জীববিদ্যার এক নতুন শাখা—প্রজনন শাস্ত্রের এক অতি আধুনিক দ্বারের উন্মোচন করেন, তাঁর প্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি প্রদান করা হয়।

লুই পাস্তুর
(খ্রীষ্টাব্দ ১৮২২—১৮৯৫)

মানুষের যত রকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন, তার সবগুলোই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্তি। এই জীবাণু বা 'মাইক্রোব'গুলোই সব রোগের বীজ। পথে-ঘাটে, বাতাসে, মানুষের শরীরে ভেতরে-বাহিরে এরা ঘুরে বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসা শাস্ত্রে এদের খাতির খুব বেশী। এই জীবাণুগুলোর ভালোরূপ পরিচয় নেওয়া, এদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলোর জব্দ করবার নানান প্রকার ব্যবস্থা করা। এখনকার ডাক্তারী শাস্ত্রে খুব একটা বড় ব্যাপার হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে চিকিৎসা প্রণালী আশ্চর্য রকম উন্নতি লাভ করেছে। এই সমস্ত উন্নতি এবং এই নতুন প্রণালীর মূলে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর।

লুই পাস্তুর ১৮২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের ডোলে শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ছোটবেলাতেই তাঁর পরিবার অ্যারবোয়িস শহরে স্থানান্তরিত হন। ফলে আরবোয়িসেই তিনি ছোটবেলাটা কাটান। লুই প্রথমদিকে বিজ্ঞানের থেকে শিল্পকলায় বেশী আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্যারিসের "ইকোলে নরম্যালে সুপারেইয়ারে" পড়তে এসে বিভিন্ন বড় বড় রসায়ন অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন এবং রসায়ন শাস্ত্র পড়তে শুরু করেন।

এই সময়েই তিনি কেলাসের মধ্যে দিয়ে সমবর্তন আলোকের গতিপথ সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং "মিস্টস্ চারলিখের রিডল" সমাধান করেন। ফলে রসায়ন বিদ্যায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই সাফল্যের জন্য তিনি লিল্লের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। লিল্লে শহর তখন বীট-চিনি থেকে মদ তৈরির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তবুও এই শিল্পে মাঝে মধ্যেই বিপত্তি দেখা যেত। কারণ মাঝে মধ্যেই বীট-চিনি থেকে মদ তৈরি করার সময় ঐ মদ নষ্ট হয়ে যেত। ফলে ব্যবসায়ীরা পাস্তুরের শরণাপন্ন হলেন। পাস্তুর অবশেষে গবেষণার পর দেখলেন যে, মদ পচার জন্য দায়ী কতকগুলো ব্যাকটেরিয়া; তবে এইসব ব্যাকটেরিয়ারা ১২০° ফা. তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না। এভাবে গরম করে জীবাণু নষ্ট করে, দুধ, মাছ, মাংস এবং নানান রকমের খাবার জিনিষ বাতাসশূন্য পাত্রে ভরে আজকাল ব্যবহার করা হয়—কোনও রকম নষ্ট হবার ভয় থাকে না। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "পাস্তুর-ক্রিয়া।"

ফলে ফ্রান্সের মদ্য-শিল্প রক্ষা পায়। ১৮৭০ সালে এই মদ্য শিল্পের থেকে প্রভুত পরিমাণ লাভ হয় এবং তা দিয়ে এক বছরেই ফ্রান্স প্রসিয়ার ঋণ শোধ করে দেয়। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান ও সম্রাজ্ঞী ইলজেনিক তাঁদের প্রাসাদে পাস্তুরকে আমন্ত্রণ জানান এবং নেপোলিয়ান প্রায় তিরিশ হাজার ফ্রাঁ খরচ করে পাস্তুরের জন্য একটা গবেষণাগার তৈরি করে দেন।

মদ্য শিল্পের মত ফ্রান্সের রেশম শিল্পও লুই পাস্তুরের কাছে ঋণী। একবার ফ্রান্সে রেশম পোকার একরকম রোগ দেখা দেয়। পোকার মধ্যে গোলমরিচের মতো এক ধরণের কালো ক্যাপ দেখা দেয়। এই রোগের নাম ছিল "পেব্রাইন", ফলে রেশম শিল্পের ভয়ানক ক্ষতি আরম্ভ হল, তখন পাস্তুর এর গবেষণায় লিপ্ত হলেন। তিনি দেখলেন যে "পেব্রাইন" ছাড়াও আর এক ধরণের জীবাণু সংক্রান্ত রোগ "ফ্ল্যাচারিয়ে"ও এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। সেই জীবাণুকে নষ্ট করবার উপায় আবিষ্কার করে তিনি সেই রোগ দূর করেন।

এছাড়া পাস্তুর "রোগের জীবাণু মতবাদ" ও প্রচার করেন। তাঁর মতে জীবাণু কখনোই আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না ; জীবাণু একমাত্র জীবাণু থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই আজকাল শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এত সাবধানতা —হাত ধোয়াধোয়ি, ফুটন্ত জলে ছুরি-কাঁচি ডোবানো, সাবান, ও কার্বলিক এ্যাসিডের ব্যবহার, নির্দোষ তুলো-ব্যাণ্ডেজের এত কড়াকড়ি, যাতে দুষ্ট জীবাণু কোন ফাঁকে ঢুকতে না পারে।

তবে পাস্তুরের অবশিষ্ট সাফল্যগুলোও সমান ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বার ঘেয়ো জ্বরের উৎপাতে দেশের গরু-ছাগল উজাড় হল দেখে তিনি সেই ঘেয়ো জ্বর দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখেন যে ১০৭° থেকে ১০৯° ফা. তাপমাত্রায় ঘেয়ো জ্বরের জীবাণুগুলো মারা যায়, ফলে লোকেরা ঘেয়ো-জ্বরে মারা যাওয়া পশুগুলো পোঁতার বদলে পুড়িয়ে ফেলে সাময়িক ভাবে রোগের কবল থেকে পশুগুলোকে রক্ষা করেন। তবে পাস্তুর আরো বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিরতরে এই রোগ দূর করার উপায় বার করেন। তিনি যে চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানে আজও তার বিজয়-পতাকা সমান ভাবে উড়ে চলেছে, তিনি বলেন যে রোগের বীজকে কাহিল করে সেই বীজের টীকা দিলেই রোগ সেরে যাবে। রোগাক্রান্তের শরীর থেকে জীবাণুর সাহায্যে রোগ প্রবেশ করাতে হবে। প্রাণীটা রুগ্ন হলে তার শরীরে লক্ষ-লক্ষ জীবাণু দেখা যাবে—তার শরীর থেকেই টীকার বীজ পাওয়া যাবে।

তাঁর শেষ স্মরণীয় অবদান বলতে "জলাতঙ্ক" রোগের প্রতিষেধকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভয়ানক রোগের জীবাণুগুলো এতই ছোট যে অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তুরের মতে, চোখে দেখা যাক আর না যাক জীবাণু আছেই। সেই অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা তিনি অন্য প্রাণীর মধ্যে রোগ জন্মিয়ে, টীকার বীজ তৈরি করলেন। এই সময় এ্যালসাসের একটা নয় বছরের ছেলে, জোসেফে মেইস্টারকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়। পাস্তুর সর্বপ্রথমে তার ওপর পরীক্ষা করেন। জোসেফের নাম চিকিৎসা-ইতিহাস অমর হয়ে গেল। প্রথম জলাতঙ্ক টীকা জোসেফের ওপর প্রয়োগ করা হল এবং জোসেফ সেই সাংঘাতিক রোগ থেকে বেঁচেও গেল। ফলে পাস্তুরের চিকিৎসা-প্রণালী ডাক্তারমহলে একেবারে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। প্যারিসে পাস্তুরের নামে যে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার সামনে এখনও জোসেফের একটা সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে।

কিন্তু এত সব সাফল্য সত্বেও তাঁর জীবন খুব একটা সুখের হয় না। অকালে তাঁর বাবা এবং দুই ছেলে মারা যায়। তিনি নিজেও পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পড়েন। শেষ জীবনে তিনি এমন আক্রান্ত হয়ে পড়েন যে তাঁকে একগ্লাস দুধ দেওয়া হলে তিনি বলেন: I can not. এগুলোই তাঁর জীবনের শেষ কথা, অবশেষে ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বহুদিন হল পাস্তুর মারা গিয়েছেন, ফরাসী জাতি রাজসম্মানে তাঁর সমাধি দিয়ে, সেই সমাধির ওপর তাঁরই নামে বিজ্ঞান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে এখনও নতুন নতুন আবিষ্কার চলছে।

পাস্তুরকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়; "তিনি সারাজীবন ধরে কি দেখলেন এবং কি শিখলেন?" তার উত্তরে পাস্তুর বলেন: "দেখলাম, এ জগতে সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।'

লর্ড কেলভিন (উইলিয়াম থমসন)

(খৃষ্টাব্দ ১৮২৪—১৯০৭)

১৮৯২ সালের প্রচণ্ডতম ঠাণ্ডার দিনে শীতের কোলকাতার রাত্রে এক থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখা গেল ২৯৩°। মনে হবে হয়তো ভুল দেখছি; আর না হলে থার্মোমিটারটা ঠিক নেই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোনটাই ঠিক নয়। কারণ যে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে তা হল তাপমাত্রার চরম স্কেল (কেলভিন স্কেল)। এই স্কেলে ২৯৩° মানে সেণ্টিগ্রেড স্কেলে ২০°। তাপমাত্রার এই চরম স্কেল উপাদানের ওপর নির্ভর করে না। এই স্কেলে 0° মানে ওই তাপমাত্রায় সমস্ত আণবিক গতি বন্ধ হয়ে যায়। যে কোন পদার্থ সর্বনিম্ন শক্তিতে থাকে। এই স্কেল অনুযায়ী জলের হিমাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক ৩৭৩° অর্থাৎ সেটিগ্রেড স্কেলের সঙ্গে পার্থক্য ঠিক ২৭৩°। আজকের তাপগতি বিজ্ঞান ও তাপপদার্থ বিজ্ঞান এই তাপমাত্রার রেস স্কেল এক প্রয়োজনীয় স্কেল। এই স্কেল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে উইলিয়াম থমসন, যিনি পরে লর্ড কেলভিন হন, আবিস্কার করেন।

উইলিয়াম থমসন ১৮২৪ সালে ২৬শে জুন আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। থমসন পরিবার ধর্মীয় নির্যাতনের জন্য অনেক বছর আগেই স্কটল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে আসেন! উইলিয়ামের বাবা জেমস থমসন, উইলিয়ামের জন্মের সময়, বেলফাস্টের রয়াল অ্যাকাডেমিক্যাল ইনস্টিটিউসনের গণিত শাখার প্রধান ছিলেন। পরে আট বছর বয়সে উইলিয়ামের মা মারা গেলে বাবা জেমস স্কটল্যাণ্ডে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক হয়ে আবার ফিরে আসেন। ছোটবেলা থেকেই উইলিয়ামের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। শুধু তাই নয় ল্যাটিন, গ্রীক প্রাকৃতিক দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রসায়ন এবং উচ্চতর অঙ্কে তাঁর সহপাঠী কিন্তু বয়সে বড় ছাত্রদের থেকে অনেক বেশীই জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করেন। তাঁর বাবা কলেজের ছাত্রদের নিয়ে জার্মান ভাষা শেখানোর জন্য জার্মানীতে অল্প কয়েক দিনের ভ্রমণে যান তখন ষোল বছর বয়সে উইলিয়াম তাদের সঙ্গে যান। কিন্তু

সেখানে জার্মান ভাষা শেখার বদলে, তিনি তাপশক্তি পরিবহনের ওপর ফুরিয়ারের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন।

১৮৪১ সালে উচ্চতর গণিত পড়ার জন্য তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে কেম্ব্রিজ ম্যাথামেটিকস জার্নালে কিছু মৌলিক প্রবন্ধ লেখার ফলে তিনি শীঘ্রই পরিচিতি লাভ করেন! পড়াশোনায় তিনি এখানেও যথারীতি প্রথম হতে থাকেন। শুধু পড়াশোনাই নয়, সাঁতার সঙ্গীত এবং নৌকাচালনাও তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। এমন কি তিনি এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত সোসাইটির সভাপতি পদেও কাজ করেন।

এরপরে তিনি প্যারিসে আসেন। সেখানে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় ছিল বাষ্পের তাপীয় ধর্ম। এর কিছু পরেই জুলের সঙ্গে পরিচিত হন, ১৮৪৬ সালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে, তিনি গ্লাসগোর প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। নিয়োগের অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আলাদা ঘরের কথা বলেন। যদিও এরকম অনুরোধ এর আগে কর্তৃপক্ষ কখনো শোনেন নি, তবুও সম্ভবত তাঁর দৃঢ়তার জন্য এই অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়। এইভাবে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং আধুনিক গবেষণার, স্থানাভাবের জন্য একটা পুরোনো মদ্য সংরক্ষণের ঘরে স্থাপিত হয়।

থমসন ব্যবহারিক এবং অব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করেন; যেমন, তাপগতিবিদ্যার সূত্র, তড়িৎ-চৌম্বকীয় দোলন এবং বিকিরণ (রেডিও)। তিনি কার্নো এবং জুলের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তাপ-মাত্রার চরম স্কেল আবিষ্কার করেন। এছাড়া "এনট্রপি', উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন যে তাপশক্তি অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হলে কিছু শক্তির এনট্রপির মাধ্যমে অপচয় হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে জগতের সমস্ত প্রাপ্তিসাধ্য শক্তির পরিমাণ হবে শূন্য এবং সমস্ত পদার্থ একই তাপমাত্রা চরম শূন্যে অবস্থান করবে। এছাড়া জুলের সঙ্গে জুল থমসন ক্রিয়া আবিষ্কার করেন, যা নিম্ন-তাপমাত্রার পদার্থ বিজ্ঞানের এক নতুন ক্ষেত্রের দ্বারোদ্ঘাটন করে।

এছাড়া থমসন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ভাবন করেন এবং সেগুলোর পেটেন্টের ফলে অর্থও উপার্জন করেন ও তাঁর গবেষণার জন্য স্বল্প অর্থ-নৈতিক সঙ্কটকে কাটিয়ে ওঠেন। এই সমস্ত উদ্ভাবনার ফলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এবং এরই ফলে সাইরাম ফিল্ড, ফিল্ডের অতলান্তিক কেবল কোম্পানীর টেকনিকাল পরামর্শদাতা হিসেবে থমসনকে নিযুক্ত করেন।

এইসময় তিনি জলের তলা দিয়ে আয়ার্ল্যান্ড এবং এবং নিউফাউন্ডল্যান্ডের মধ্যে প্রায় দু'হাজার মাইল টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করেন। এই আবিষ্কারের ফলে রাণী তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

এছাড়া তিনি নৌ-কম্পাসের উন্নতিবিধান করেন ও জোয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করে জোয়ার বিশ্লেষক, মাপক ও নির্ধারক যন্ত্র উদ্ভাবন করে নৌ-বিদ্যায় অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি জলের গভীরতা-মাপক ফ্যাদোমিটারও নির্মাণ করেন।

থমসন তাঁর সুদীর্ঘ, ফলপ্রসূ জীবনে প্রভূত সম্মান উপার্জন করেন। ৮৯০ সালে রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্টে পদে নির্বাচিত হন এবং ১৮৯২ সালে লার্গসের লর্ড কেলভিন উপাধি পান। প'চাত্তর বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন এবং ১৮৮৪ সালের জন হপকিনস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আলোকের তরঙ্গ সূত্রের সংস্করণে মন দেন। তাঁর এই আবিষ্কার ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর তিন বছর বাদে ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং সসম্মানে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে বিজ্ঞানবীর নিউ-টনের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

............জোসেফ লিস্টার ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮২৭—১৯১২)

আধুনিক অ্যান্টিসেপটিক শল্য-চিকিৎসার জনক হিসেবে যিনি বিজ্ঞান-ইতিহাসে তারকার মতো দীপ্যমান তিনি হলেন জোসেফ লিস্টার।

জোসেফ লিস্টার ১৮২৭ সালে ৫ই এপ্রিল লণ্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা লণ্ডনের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এছাড়া শখের বিজ্ঞানী হিসেবে লেন্স এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতিবিধান করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ করেন। সেজন্য তাঁর বাবা তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে ঠেলে দেন। জোসেফ বিজ্ঞানের দিকে আসেন এবং শল্যচিকিৎসার দিকে আগ্রহান্বিত হন।

শল্যচিকিৎসা শিক্ষার জন্য তিনি লণ্ডনের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ডাক্তারী পড়াকালীন সময়ে তিনি রাতের পর রাত হাসপাতালে

জেগে কাটান। রোগীদের অসহ্য যন্ত্রণার চীৎকারে তাঁকে ভীষণ-ভাবে মর্মাহত করত। যখনই কোন অপারেশন হয়, প্রায়ই তার পরে সেই সঙ্গে কি অসীম যন্ত্রণা। ভয়ে লোকে হাসপাতালে আসতে চাইতো না কারণ তখন লোকের মনে এরকম আতংক দাঁড়ায় :যে, হাসপাতালে এসে অপারেশন করলেই মরতে হবে, মৃত্যু সংখ্যা এত বাড়তে লাগল যে, ক্রমে ডাক্তারদেরও অপারেশন করতে কুণ্ঠিত হতে হোত।

এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে লিস্টার শল্যচিকিৎসক হলেন এবং ১৮৫৩ সালে বিখ্যাত স্কট শল্যচিৎসাবিদ্ জেমস সাইমের কাছে চলে গেলেন। এই ঘটনা তাঁর জীবনে এক বিখ্যাত আবিস্কার এনে দেয়। কারণ এডিনবার্গে তিনি জেমসের মেয়ে অ্যাগ্নেসের প্রেমে পড়েন ; অ্যাগ্নেসও তাঁর কাজে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন এবং জোসেফের পরবর্তী আবিষ্কারে অ্যাগ্নেসের এক বিরাট ভূমিকা দেখা যায়। কারণ তিনি ফরাসী ভাষা পড়তে জানতেন। তাঁরই অনুবাদের ফলে লিস্টার পাস্তুরের বাণী শুনতে পেলেন ঃ "আমাদের দৃষ্টির বাইরে, বাতাসে অসংখ্য সব জীবাণু আছে, যারা জিনিষকে পচিয়ে তোলে।"

লুই পাস্তুরের এই সিদ্ধান্তে লিস্টারের মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল, তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা হলো যে, এই সমস্ত জীবাণু দ্বারাই মানুষের ক্ষতস্থান দূষিত এবং বিষাক্ত হয়ে ওঠে। চোখের অদৃশ্য থেকে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন অকালে হরণ করে নিচ্ছে। কিন্তু বাতাস তো সর্বত্রই রয়েছে! আর বাতাসে লক্ষ লক্ষ জীবাণু। কি করে জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে ক্ষতস্থানকে রক্ষা করা যায়? যদি এমন কোন প্রতিষেধক ওষুধ ব্যবহার করা যাবে, যার সংস্পর্শে জীবাণুরা মরে যাবে, তাহলে এর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। এইভাবে লিস্টার প্রথম প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে ১৮৬৫ সালে অস্ত্রচিকিৎসার সময় ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিডের ব্যবহার প্রথম প্রচলন করলেন। তাতে বেশ সুফল পেলেন, কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন যে, সেই তীব্র ওষুধ ব্যবহার করার ফলে ক্ষতস্থান শুকোতে খুব দেরী হতো ফলে এটাকে সংস্কার করে তিনি শেল্যাকের (চাঁচগালা) সঙ্গে কার্বলিক অ্যাসিডের দানা মিশিয়ে ল্যাক প্লাস্টার তৈরী করেন এবং সুতোর কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দেন। এই কাপড় দিয়ে যখন কোন ক্ষতস্থান বাঁধা হোত, তা যেমন জীবাণু থেকে রক্ষা পেত তেমন হাওয়া ঢোকার ফলে তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যেত, পরে তিনি অবশ্য অশোষক ল্যাক প্লাস্টারের জন্য এক

ধরণের ব্যাণ্ডেজও তৈরি করেন। পরে তিনি ক্ষতস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুকে জীবাণুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য, শল্য চিকিৎসক ছুরি, কাঁচিকে কার্বলিক অ্যাসিডে ধুয়ে নিতেন, চার ধারে কার্বলিক অ্যাসিড স্প্রে করতেন। কার্বলিক অ্যাসিড তাঁর ছাত্র এবং নার্সদের মধ্যে যদিও তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারল না কারণ এতে হাত খসখসে হয়ে যেত কিন্তু তবুও হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫ o/o থেকে কমে ১৫ o/o তে দাঁড়াল।

তাঁর এই নতুন পদ্ধতি কিন্তু সবাই সহজে মেনে নিল না। কিছু গোঁড়া, ধর্মবিশ্বাসী লোক তো সরাসরি বাধা দিতে লাগল। তবে এই সময় তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার একটা ফোড়া কার্বলিক অ্যাসিডের সাহায্যে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করেন। ফলে রাণী কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে ব্যারণ পদবী দান করেন, যা তখনকার দিনে হাউস অফ লর্ডসের সভ্যদের সমান সম্মানিত পদ ছিল। এছাড়া ফ্রান্স-প্রুসিয়া যুদ্ধেও লিস্টারের এই অ্যানটি-সেপটিক শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি দারুণ ভাবে সফল হয়, ইউরোপের সব বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক তাঁর এই পদ্ধতির জয়গান করতে থাকেন। উপরোক্ত এই দুই ঘটনায় লিস্টারের শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি অবশেষে চিকিৎসা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিস্টার দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর অবদানের ফলেই আজ সমগ্র জগৎ অকালমৃত্যু অধিক যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করবার উপায় খুঁজে পেয়েছে। শুধু অ্যানটিসেপটিক শল্য চিকিৎসা পদ্ধতিই নয়, তিনি অনেক শল্যচিকিৎসার, যেমন বুকের ক্যানসার, মূত্রনালী প্রভৃতি উন্নতিবিধান এবং শল্যচিকিৎসার যন্ত্র যেমন শ্রবণ যন্ত্র, সাইনাস এরসোস এরকম আরো অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন।

তাঁর অবদানের জন্য উপসংহার আমেরিকার রাষ্ট্র-প্রতিনিধির সেই কথাটি উল্লেখ করা যায়, যা তিনি এক রাজকীয় ভোজসভায় লর্ড লিষ্টারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন। "হে লর্ড লিস্টার, কোন জাতির প্রতিনিধি নয়, কোন জাতি বা সম্প্রদায় নয়, চেয়ে দেখ সমগ্র মানবতা নত হয়ে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

............জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল...

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩১—১৮৭৯)

১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল। এডিনবার্গের রয়্যাল সোসাইটির নিয়মিত বৈঠক সবে শুরু হয়েছে। সোসাইটির সদস্য সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা জড়ো হয়েছেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অধ্যাপক জেমস ফরবেস ডিম্বাকৃতি জ্যামিতিক নকশার অংকন-পদ্ধতি ও আলোকের প্রতিসরণের ওপর এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে শোনান, এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই বিশেষ বৈঠকে একটা অস্বাভাবিকতা ছিল। সেটা এই যে, যিনি এই সৃজনমূলক প্রবন্ধ লেখেন তিনি কিন্তু এটা পড়ছেন না, পড়ছেন অন্য একজন। কারণ এর আবিষ্কর্তার বয়স তখন এতই কম ছিল যে, প্রকাশ্য সভায় তাঁর গবেষণা পড়ে শোনাবার জন্য তাঁকে বক্তৃতা-মঞ্চে ওঠানো সমীচীন মনে করা হয় নি। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স যিনি এই আবিষ্কার সম্পন্ন করেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ম্যাক্সওয়েলকে উনবিংশ শতাব্দীর সেরা দুজন অব্যবহারিক পদার্থবিদদের মধ্যে অন্যতম একজন বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জেসস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ১৮৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর, স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল একজন আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু তিনি বেশীর ভাগ সময় তাঁর গ্লেনশেয়ারের জমিদারীর তদারকীতে এবং তাঁর একমাত্র ছেলে জেমসের পড়াশোনার দিকে ব্যয় করতেন। খুব ছোটবেলা থেকে জেমসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র তিন বছর বয়সেই তিনি কোন বস্তু কাজ কেন করে এ নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করে তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত তিনিও ছোটবেলায় নানান ধরণের উদ্ভিদ ও পোকামাকড় সংগ্রহ করতেন। তবে তাঁর সংগৃহীত পোকামাকড় একটু দুর্বল হয়ে গেলেই তিনি দয়াপরবশত তাদের ছেড়ে দিতেন।

দশ বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে এডিনবার্গ অ্যাকাডেমীতে ভর্তি করে দেন। এই সময় অসুস্থতা বশতঃ তিনি প্রায়ই স্কুল কামাই করতেন। এছাড়া স্কুলে তাঁর পড়াশোনারও খুব একটা উন্নতি দেখা যায় না। তবুও তিনি এই সময় কাকীমা ইসাবেলের বাড়ীতে নানান ধরণের বই পড়েন। কারণ

এডিনবার্গ অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময় তিনি কাকীমা ইসাবেলের বাড়ীতে থাকতেন এবং বাবা ও ছেলে দুজনে মিলে এডিনবার্গের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতেন। এইরকম এক সপ্তাহান্তে ভ্রমণে তাঁরা "তড়িৎ-চৌম্বকীয় যন্ত্রের" এক প্রদর্শনী দেখেন। এই প্রদর্শনীই পরবর্তীকালে ম্যাক্সওয়েলের সর্বোত্তম অবদান "এ ট্রিটাইস অন ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম"-এর বীজ বপন করে।

জেমস আস্তে আস্তে অ্যাকাডেমির জীবনের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য এবং পড়াশোনা দুয়েরই উন্নতি হতে থাকে। এই সময়ে বারো বছর বয়সে তিনি বাবার সঙ্গে এডিনবার্গের রয়াল সোসাইটির এক বৈঠকে যান। এখানে বিজ্ঞান ও অংকের নতুন নতুন উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, এতই অনুপ্রাণিত হন যে তিনি নানান জ্যামিতিক চিত্র নির্মাণ করতে শুরু করেন। কোনও রকম জ্যামিতি না পড়েই তিনি চতুস্তলক এবং বারোতল বিশিষ্ট চিত্র নির্মাণ করেন, এছাড়া আরো জটিল চিত্রও তিনি নির্মাণ করেন। এবং এই সব জটিল চিত্রগুলোর মধ্যে দিয়েই তাঁর ভবিষ্যত গণিত প্রতিভা প্রথম লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শুধু যে তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে এডিনবার্গের বিজ্ঞান সোসাইটির বৈঠকে যোগ দেন তা নয়, এই সময় তিনি এডিনবার্গের শিল্পকলা সোসাইটির বৈঠকে যোগদেন। এইখানে ডি. আর. হের সংগে পরিচিত হন। এই বৈঠকে ডি. আর. হে দেখান যে অংকের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর আকৃতি এবং রঙ সংমিশ্রণ উৎপন্ন করা যায়। ডি. আর. হে. এজন্য কৃত্রিম উপায়ে পিন, পেন্সিল ও সুতোর ফাঁস দিয়ে নানান ধরণের চিত্র আঁকতেন। জেমসও পিন ও সুতোর ফাঁস দিয়ে নানান পরীক্ষা করেন। ফলস্বরূপ তিনি ডিম্বাকৃতি চিত্র অংকন করেন এবং তাঁর অংকিত চিত্র সম্বন্ধে এক গাণিতিক সূত্রও আবিস্কার করেন।

এই একই পিন ও সুতোর ফাঁস দিয়ে তিনি কাচের এক বক্রতলের ওপর আলোকের প্রতিসরণের ওপর গবেষণা করেন, ও কিছু সূত্রও আবিষ্কার করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ডিম্বাকৃতি নকশা এবং আলোকের প্রতিকরণের সম্বন্ধে এক গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন।

১৮৪৭ সালে তিনি প্রথাগত শিক্ষার জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা শীঘ্রই তাঁর প্রতিভার সম্বন্ধে অবগত হন, এবং তাঁদের গবেষণাগারে জেমসকে গবেষণা করার সুযোগ

দেন। ফলে জেমস আলোকের প্রতিসরণ, জ্যামিতিক বক্ররেখা এবং রাসায়নিক মাধ্যমে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলেই তিনি আলোকের সমবর্তন আবিষ্কার করেন। বিশেষ অপটিক্যাল পদার্থের মধ্যে দিয়ে যাবার কালে আলোকের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় "সমবর্তন।"

আঠারো বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি প্রচণ্ড ভাবে পড়াশোনা করতে থাকেন। এখানে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পরীক্ষা তাঁর ব্যবহারিক জীবনে করেন। যেমন ঘুম নিয়ে। তিনি বিকেল পাঁচটার থেকে স্যাড়ে নটা অবধি ঘুমোতেন। তারপর রাত দশটা থেকে রাত দুটো অবধি পড়াশোনা করতেন, দুটো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত করিডোর দিয়ে দৌড়তেন এবং সিঁড়ি দিয়ে ওপর নীচ করে ব্যায়াম করতেন, এবং আবার আড়াইটে থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত ঘুমোতেন। তাঁর এই কাজকর্মে অন্যান্য বাসিন্দারা বিরক্ত হয়ে তাঁকে জুতো ও অন্যান্য জিনিষ ছুঁড়ে অভিনন্দন জানান এবং ফলে তাঁর এই অদ্ভুত পরীক্ষা শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়।

যাইহোক ১৮৫৪ সালে তিনি স্ব-সম্মানে গ্র্যাজুয়েট কোর্সে উত্তীর্ণ হন। পরে তাঁর বাবা ও অধ্যাপকদের পরামর্শে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজেই গবেষণা শুরু করেন। এখানে তিনি বর্ণানুভূতি ও আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং অপথ্যালমোস্কোপ উদ্ভাবন করেন। এছাড়া বর্ণান্ধ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, নীল ও হলুদ বর্ণের আলোক মিশ্রিত হলে রঙের আলোক গোলাপী উৎপন্ন হয়। এইভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে, পৃথক বর্ণের আলোক সংমিশ্রণ পদ্ধতি, পৃথক বর্ণের রঞ্জক সংমিশ্রণ পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বর্ণানুভূতি ও বর্ণান্ধ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৮৬০ সালে তিনি রামফোর্ড পদক লাভ করেন। তিনি মাইকেল ফ্যারাডের "এক্সপেরিমেণ্টাল রিসার্চেস" বইটা আদ্যোপান্ত পড়েন এবং এর ওপর ভিত্তি করেই ১৮৫৫ সালে কেম্ব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটিতে তাঁর নিজস্ব প্রবন্ধ "অন ফ্যারাডেস লাইনস অফ ফোর্স" পাঠ করেন। এতে তিনি ফ্যারাডের থিওরীগুলোকে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর এই প্রতিভায় ফ্যারাডেও মুগ্ধ হয়ে যান এবং ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েলকে এক চিঠিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

অবশ্য ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ গবেষণায় সাময়িক ভাবে ছেদ পড়ে যখন তিনি শনির বলয় নিয়ে গবেষনা করেন। এই গবেষণা ফলস্বরূপ আটষট্টি

পৃষ্ঠার এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং দুশোরও ওপর সমীকরণ দ্বারা তিনি অণুর গতি সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত সূত্র "ম্যাক্সওয়েল ল অফ ডিস্ট্রীবিউসন অফ ভেলোসিটিস" আবিষ্কার করেন, এর ফলেই আধুনিক প্লাজমা-পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়।

১৮৫৮ সালে অ্যাবার্ডিনের মরিশ্চল কলেজে পড়ানোর সময়, তিনি সেই কলেজেব অধ্যক্ষের মেয়ে ক্যাথারিন মেরী ডেওয়ারকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে হয় না এবং এই ঘটনাই তাঁদের আরো নিবিড়, ঘনিষ্ঠ করে তোলে। যদিও মেরী গণিতজ্ঞ ছিলেন না, তবুও মেরী ম্যাক্সওয়েলকে জানান পরীক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তবে মেরীর সবচেয়ে বিখ্যাত অবদান, পানিবসন্তে আক্রান্ত মৃতপ্রায় ম্যাক্সওয়েলকে সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলা। ১৮৬০ সালে তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। লণ্ডনে পাঁচ বছর থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ও মেরী তাঁদের কেনসিংটনের বাড়ীতে চিলে কোঠার ঘরে গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করেন। ফলস্বরূপ গ্যাসের সাতন্দ্রতার অব্যাবহারিক সূত্র আবিষ্কার করেন, যা ১৮৭৬ সালে তাঁর লেখা "ম্যাটার এ্যণ্ড মোশন" বইতে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি তড়িৎ প্রবাহ এবং বিকিরিত তাপ প্রবাহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই সম্বন্ধে গবেষণা করেন গ্যাসের আণবিক গতি সূত্র আবিষ্কার করেন।

তবে তাঁর সর্বোত্তম বিখ্যাত আবিষ্কার—তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে তাঁর নির্ণীত সমীকরণ, যা প্রায় কুড়ি বছর নানান পরীক্ষার পর ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি দেখান যে সমস্ত তড়িৎ ও চৌম্বিক ক্রিয়া জড় মাধ্যমের গতিবেগ ও পীড়নের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। তিনি এই জড় মাধ্যমকে কাল্পনিক "ইথার" নামকরণ করেন। তাঁর থিওরীর একটা অংশ হিসেবে তিনি নির্ধারণ করেন যে, আলোকও এক ধরণের "তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ"।

যাইহোক তিনি পড়ানোর মধ্যেই তেত্রিশ বছর বয়সে অবসর নিয়ে গ্লেনলেয়ারে চলে যান এই সময় তিনি আণবিক পদার্থ বিজ্ঞান, তাপ, গতি ও বস্তু, আলোক, তড়িৎ এবং চৌম্বক বিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণা লব্ধ ফলগুলো চূড়ান্ত আকারে লিখে বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অবশেষে ছ' বছর বাদে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে আবার অধ্যাপনা জগতে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি ক্যাভেণ্ডিসের বিখ্যাক তড়িতক অবদানের ওপরও "দি ইলেকট্রিক্যাল রিসার্চেস অফ দি অনারেবল হেনরী ক্যাভণ্ডিস"

নামে একটা বই লেখেন। ১৮৭৯ সালে এই বই প্রকাশিত হয় এবং একই বছরে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সেরা অব্যবহারিক (গাণিতিক) পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

অ্যালফ্রেড বের্ণহার্ড নোবেল

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৩—১৮৯৬)

ইউরোপ থেকে যখন খবর পাওয়া গেল যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন তখন সারা ভারতবর্ষে এক আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এই "নোবেল প্রাইজ" জিনিষটা কী? পরে জানা গেল যে, বিজ্ঞান জগতে সৃজনমূলক আবিষ্কারের জন্য, সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য যাঁরা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, তাঁরা যে দেশের লোকই হন না কেন, তাঁদের লক্ষাধিক টাকার অর্ঘ্য দেওয়া হয় এবং একেই বলা হয় নোবেল প্রাইজ। এই টাকা আসে কোথা থেকে? এই টাকা আসে এক সুইডিস রসায়নবিদের দান করা প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকার সম্পত্তির আয় থেকে। এই সুইডিস বিজ্ঞানীই হলেন আলফ্রেড 'বের্ণহাড' নোবেল।

আলফ্রেড বের্ণহার্ড নোবেল ১৮৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা রাশিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিগর হওয়ার জন্য, বালক নোবেলও তাঁর বাবার সঙ্গে সাংঘাতিক গোলাবারুদের কাজে লিপ্ত হন। বারুদ কেবল যুদ্ধের কাজেই নয়, রেলপথ, রাস্তা তৈরী করবার জন্য বড় বড় পাহাড় ভাঙ্গতেও ব্যবহৃত হোত। কিন্তু অনেক সময় বারুদের তেজও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারত না। এছাড়া আরো অনেক জিনিষের কথা সেসময় লোকেরা জানত যা বারুদের থেকেও বেশী শক্তিশালী। কিন্তু এ সমস্ত জিনিষ এত সামান্য কারণে ফেটে যেত যে, তাকে কাজে লাগাতে কেউ সাহস পেত না। এই সমস্যার সমাধান করেন নোবেল। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে এই অসুবিধে দূর করেন। ডিনামাইটের শক্তি সাধারণ বারুদের চেয়ে আটগুণ বেশী অথচ একে সাবধানে নাড়াচাড়া করলে কোন ভয়ের কারণ নেই।

ডিনামাইট ছাড়াও, কামানের গোলা ছোঁড়বার জন্য যে সব প্রচণ্ড বারুদের ব্যবহার করা হয়, তাও নোবেলই আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত সাংঘাতিক জিনিষের কারবারের জন্য নোবেল বড় বড় কারখানা বসান এবং পৃথিবী জুড়ে এক বিশাল ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।

নোবেলের জীবনের কাহিনী বড় অদ্ভুত। স্বাস্থ্যের জন্য সারাজীবন তাঁকে রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরে কাটাতে হয়। তিনি একজন যেমন ভীরু ও নিরীহ ছিলেন এবং সামান্য দুঃখ কষ্ট বা উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে পড়তেন; তেমনি অপরদিকে তাঁর মনের মধ্যে এমন এক অসাধারণ শক্তি কাজ করত যে যার ফলে ঘোর বিপদের মধ্যে বা রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি ধীর-স্থির ভাবে কাজ করে যেতেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি সাংঘাতিক সব বারুদের মশলা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় পদে পদে বিপদ ওত পেতে বসে থাকত। এতে অনেক লোকের প্রাণহানিও হোত। একবার তো এক কারিগরের অসাবধানতায় তারই একটা কারখানা ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক লোক মারা যায়। কিন্তু এতেও তিনি দমেন না! আবার নতুন করে কারখানা স্থাপন করেন এবং এরূপ দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ভগ্ন শরীরে এই রকম সাংঘাতিক জিনিষের কারবার করে প্রত্যহ বিপদের মধ্যেও দিয়ে যাঁর জীবন কাটে, ১৮৯৬ সালে, মৃত্যুকালে তাঁর শেষ চিন্তা হয় জগতে শান্তি স্থাপন করার, জ্ঞান ও আনন্দ বিস্তারের চিন্তাও তিনি করেন। ফলে তাঁর সমস্ত জীবনের উপার্জিত অর্থ তিনি দান করে যান এবং ফলস্বরূপ "নোবেল প্রাইজের" প্রবর্তন হয়।

নেপোলিয়ান যখন ইটালী বিজয় করতে যান তখন সকলে বলে যে এ অসম্ভব কথা; কারণ এই প্রচণ্ড শীতে আল্পস পাহাড় পার হওয়া সম্ভব নয়। তার উত্তরে নেপোলিয়ান বলেন, "There shall be no Alps."

"নেপোলিয়ান আল্পস পার হয়ে যান। এর প্রায় একশো বছর পরে যখন ফ্রান্স, ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্পস্ পাহাড় ভেদ করে রেলপথ বসানো হয়, তখন নোবেলও বলতে পারতেন: "There shall be no Alps".

লক্ষ যুগের পাহাড়ের বাঁধা একজন রুগ্ন দেহ দুর্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে সরে পড়ে।

ডিমিট্রি আইভানোভিচ মেণ্ডেলীভ

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৪—১৯০৭)

মৌলের পর্যায় সারণীর সঙ্গে সঙ্গে দুটো নাম মনে পড়ে—একজন হলেন ড্রিমিট্রি আইভানোভিচ মেন্ডেলীভ ও অপরজন হেনরী মোসলে।

১৮৩৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সাইবেরিয়ার নির্জন টোবিলস্কে এক হাই স্কুলের পরিচালকের সতেরোতম ও শেষ সন্তান হিসেবে মেণ্ডেলীভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সাতচল্লিশ বছর আগে যখন রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট রাশিয়াকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে গড়তে মনস্থির করেন। তখন মেণ্ডেলীভের ঠাকুর্দা প্রথম সাইবেরিয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ডিমিট্রির জন্মের স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর বাবা যক্ষ্মারোগে মারা যান। ফলে ডিমিট্রি তাঁর মায়ের অধীনেই মানুষ হতে থাকেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মা মারিয়া মেণ্ডেলীভ তাঁকে নিয়ে মস্কোতে আসেন। কিন্তু সাইবেরিয়ান ভাষার জন্য ডিমিট্রি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পান না। কিন্তু এই ঘটনায় দমে না গিয়ে মারিয়া, ডিমিট্রিকে নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান এবং সেখানকার ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁর মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড মর্মাহত হন। কারণ তাঁদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে; এমনকি তাঁর শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। ফলে এক ডাক্তারের পরামর্শে উষ্ণ জলবায়ু যুক্ত স্থান ক্রিমিয়াতে সিমফেরোপোলে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে চলে যান। কিন্তু যখন ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ লাগে তিনি আবার সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

রাশিয়াতে বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষালাভের কোন সুযোগ না দেখে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ফ্রান্সে কিছুদিন তিনি হেনরী রেনোর অধীনে পড়াশোনা করেন। ফ্রান্স থেকে তারপর যান হেইডেলবার্গে। হেইডেলবার্গে তিনি বুনসেন ও কারশফের সঙ্গে এবং তাঁদের উদ্ভাবিত "বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের" সঙ্গেও পরিচিত হন। এই যন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে মৌল নির্ধারণ করা যায় তাও জানলেন। এরপর রাশিয়ায় ফিরে এসে জৈব যৌগের ওপর পাঠ্য বই লেখেন এবং ডোমিডফ পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়

তিনি জলের সঙ্গে অ্যালকোহলের সংমিশ্রণের ওপর গবেষণা করে ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেন এবং একত্রিশ বছর বয়সে সেণ্ট পিটার্সবার্গের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

এর পরেই তিনি মৌলের পর্যায়সারণীর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সে সময়ের জানা তেষট্টিটি মৌলের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য যোগাড় করতে লাগলেন। সেই তেষট্টি মৌলকে এক একটা কার্ড দ্বারা সূচিত করে তিনি গবেষণাগারের দেওয়ালে স্থাপন করেন এবং সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে থাকেন। এই গবেষণার ফলেই তিনি তাঁর বিখ্যাত "পর্যায় সূত্র" আবিষ্কার করেন। এই সূত্রানুযায়ী, মৌলের রাসায়নিক ধর্ম তাদের পারমাণবিক ভরের পর্যায়ক্রমের তালিকা। এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি একটা পর্যায়সারণীও প্রস্তুত করেন, যা ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এতে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়, কারণ এতে বেশ কিছু জায়গা ফাঁকা ছিল, যাতে কোন মৌলই খাপ খায় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে কোনও না কোনও দিন মৌল আবিষ্কৃত হবে যারা ওই শূন্য জায়গায় অবস্থান করবে এবং তাদের পারমাণবিক ভর ও ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বাভাস করেন। পরে যখন গ্যালিয়াম, জারমেনিয়াম ও স্ক্যানডিয়াম আবিষ্কৃত হয় তখন মেণ্ডেলিভের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় এবং তাঁর এই সূত্র ও তালিকা মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এতেও কিছু কিছু ভুল ছিল, যা পরে হেনরী মোসলে সংশোধন করে সঠিক রূপ দেন।

বিজ্ঞান ছাড়াও সঙ্গীত এবং শিল্পকলার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। তিনি বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক টলস্টয়ের একজন গুণমুগ্ধও ছিলেন। প্রথম বিয়ে সুখের হয় না বলে তিনি আবার সাতচল্লিশ বছর বয়সে আন্না পাপোভা নামে একজন গুণী শিল্পীকে বিয়ে করেন। আন্না দুটো ছেলে ও দুটো মেয়ের জন্ম দেন এবং তাঁদের পারিবারিক জীবন খুব সুখের হয়।

তাঁর প্রচণ্ড সৎ সাহসও ছিল। স্বেচ্ছাচারী জারের আমলেও তিনি সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। তিনি নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, জ্ঞানীদের অপব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং কৃষকদের ওপর কর-বোঝা কমানোরও দাবী করেন। এমন কি ১৮৯০ সালে ছাত্রদের আরো বেশী স্বাধীনতার আবেদন যখন নাকচ করা হয় তখন তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে ইস্তফা দেন। কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং সরকারের প্রতি তাঁর বিভিন্ন অবদানের জন্য জার তাঁকে কিছু বলতেন না। সরকারের প্রতি অবদান বলতে তিনি ককেসাসে তৈল উৎসের

এক প্রয়োজনীয় মূল্যবান জরিপ করেন এবং তৈল খননের এক উন্নত পদ্ধতি এবং ন্যপথা পাতনের এক ব্যবসায়িক পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। এছাড়া রাশিয়ার শিল্পোন্নতি এবং কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থারও উন্নতি করেন।

১৯৮৪ সালে ৭৩ বছর বয়সে রুশ জাপান যুদ্ধে তিনি সরকারের পক্ষে কাজ করেন এবং পাইরো কলোডান নামে ধোঁয়াহীন এক ধরণের পাউডার নির্মাণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এতে হয়তো রাশিয়ার জয় ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু রাশিয়া সে যুদ্ধে হেরে যায়। যাইহোক রাশিয়ার এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী তিয়াত্তর বছর বয়সে ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউমোনিয়ায় মারা যান। রসায়ন জগতে তাঁকে সর্বদাই স্মরণ করা হবে কারণ তাঁর আবিস্কারই, অনাবিস্কৃত মৌলের আবিস্কারের জন্য মূলত দায়ী।

..........অগাস্ট ভাইসমান..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৪—১৯১৪)

বিখ্যাত জার্মানী কবি গোটে মারা যাবার ঠিক দুবছর পর ১ ১৭ই জানুয়ারী, গোটে যে শহরে জন্মগ্রহণ করেন সেই শহর প্রতিভার অভাব পূরণ করতে আর এক প্রতিভা অগাষ্ট ভ পশ্চিম জর্মানীর ফ্রাংকফুট-অ্যাম-মেইনে এক শিক্ষিত প করেন। শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি বড় হন। ছোটে জাতের ওপর তাঁর এক আকর্ষণ দেখা যায়।

তাঁর ডাক্তারী শিক্ষার শুরু হয় গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্য সালে তিনি এম, ডি, ডিগ্রি লাভ করেন। অষ্ট্রি সার্জেন হিসেবে চাকরী করেন। যুদ্ধক্ষেত্রের ট তাঁর কোমল মনে ভীষণভাবে আঘাত করে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করবার জন্য মনস্থির শান্তির জন্য তিনি উত্তর ইটালীর বিভিন্ন স্থ বেড়ান। এই ভ্রমণ কালে তাঁর সঙ্গে তিনি ঐ জার্মান দম্পতির সুন্দরী মে বছর পরে বিয়ে করেন।

এর পরে জার্মানীতে ফিরে এসে গিসেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে শুরু করেন। এখানে তিনি কার্ল লিউকার্ট নামে একজন 'অমেরুদন্ডী প্রাণীবিদের' সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই প্রভাবে তিনি কীট-পতঙ্গের ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন।

গিসেনের পাঠক্রম শেষ করে ভাইসমান স্যাক্সনির আর্চডিউকের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি পড়াশোনা এবং গবেষণার জন্য প্রভূত সময় পান; এবং বিবর্তনে নানান বৈশিষ্ট্য কিভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তা গবেষণা করতে থাকেন। ১৮৬৫ সালে তিনি ডারউইন মতবাদের যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণের জন্য এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার সারগর্ভতার সুবাদে তিনি ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং প্রায় অর্ধ শতকেরও কাছাকাছি তিনি এই পদেই বহাল থাকেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিলো তাঁর সামনে বুঝি এক মধুর, সুখী ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তা হল না! বাদ সাধল তাঁর চোখ। তাঁর চোখের দৃষ্টি শক্তি এরকম কমে যায় তাঁর পক্ষে ডাক্তারের সাবধান বাণীকে উপেক্ষা করে অণুবীক্ষণের মধ্যে চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে কি তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের ইতি হয়ে গেল! কিন্তু ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ! এই সময় তিনি মেরী গ্রুবারকে বিয়ে করেন এবং গ্রুবারের চোখ দিয়ে তিনি তাঁর গবেষণা আবার নতুন করে শুরু করলেন।

১৮৬৮ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে, ভাইসমান অমেরুদণ্ডীদের বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার ওপর এক গুচ্ছ প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় তিনি এককোষী প্রাণীর অযৌন জনন পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে, এককোষী প্রটোজন বিভাজন প্রক্রিয়ায় দুটো কোষে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা হয়ে হয়ে তাদের বংশগতি হতে থাকে।

কিন্তু বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে তিনি সোমাটোপ্লাজম্ অর্থাৎ দেহকোষের উপাদান এবং জার্মপ্লাজম্ অর্থাৎ জনন কোষের উপাদানের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করেন। এরপর তিনি যুক্তির দ্বারা উপলব্ধি করেন যে ভ্রূণগত জনন কোষেই বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর নিয়ন্ত্রক উপাদান থাকে। কারণ সোমাটোপ্লাজম্ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়। কিন্তু জার্মপ্লাজম্ জনন কোষের বা গ্যামেটের মিলনের মধ্যে দিয়ে বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। তাঁর এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে অবশেষে তিনি বংশগতির বাহক হিসেবে জার্মপ্লাজমের মতবাদ আবিষ্কার করেন। এই

মতবাদের মাধ্যমে তিনি বলেন যে, যৌন কোষের বৃদ্ধিতে, দেহ কোষের কোন প্রতিক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেজন্য তাদের দ্বারা স্থানান্তরিত বংশগতি বৈশিষ্ট্য পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়া কোনরকম পরীক্ষিত প্রমাণ না পেয়েও শুধুমাত্র যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই প্রস্তাব করেন যে, জীবকোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোজোমই প্রকৃতপক্ষে জার্মপ্লাজম্ অর্থাৎ বংশগতিরর প্রাথমিক উপদান। কারণ, বংশ-গতির উপাদান স্থানান্তর পদ্ধতি অবশ্যই একটা সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল পদ্ধতি, সেদিক থেকে বীজকোষ গঠন কালে ক্রোমোজোম বিভাজন পদ্ধতিও একটা সুবিন্যস্ত পদ্ধতি।

কিন্তু তাঁর এই জার্মপ্লাজম মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করলেন লামার্ক-মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ। লামার্কের অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী, অর্জিত প্রকারণ বংশগতির ধারায় বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত হয় এবং এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে পরিশেষে জীবের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। এরই ফলশ্রুতি নতুন জীবের সৃষ্টি। ব্যবহারের ফলে অঙ্গ পুষ্টির উদাহরণ হিসেবে জিরাফের লম্বা ঘাড়ের কথা লামার্ক বলেন। লামার্কের মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের ঘাড় খাটোই ছিল। কিন্তু তাদের কাছে উৎকৃষ্ট গাছের পাতা খাবার জন্য তারা ঘাড়কে প্রসারিত করার চেষ্টা করে, যাতে পাতার নাগাল পাওয়া যায়। দিনের পর দিন এইভাবে চেষ্টা করার ফলেই তাদের ঘাড় লম্বা হয়। ঘাড়ের এই বিশেষ ধর্ম পরবর্তী জননে সঞ্চালিত হয়; এবং এইভাবে কয়েক জননের পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট জিরাফের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু ভাইসমান প্রমাণ দ্বারা লামার্কের মতবাদ ভুল বলে প্রমাণিত করেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী ইঁদুরের লেজ পর পর বাইশ জনন ধরে কেটে ফেলে দেখেন যে, কাটা লেজ বিশিষ্ট ইঁদুর কোন জননেই জন্মায় না। অর্থাৎ অর্জিত গুণাগুণ কখনই পরবর্তী জনন-কোষের জার্মপ্লাজমের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পরবর্তীকালে তিনি অভিব্যক্তি জনিত সমস্যার দিকেও আগ্রহী হন। তাঁর মতে বংশ পরম্পরার পরিবর্তনে পরিবেশের কোন প্রভাবই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবর্তন হয় এবং সেটা হয়তো কোন প্রজাতির অস্তিত্ব সংগ্রামে সহায়কও হয়। তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই প্রকারণের উৎস কি? এর উত্তর ভাইসমানও দিতে পারেন নি এবং আজ আধুনিক জেনেটিকবাদীরা এর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ১৯০৪ সালে অভিব্যক্তির ওপর তিনি তাঁর শেষ বই "দি এভোলিউশানারি থিওরী" লেখেন।

যদিও তাঁর অনেক মতবাদই পরবর্তীকালে জীববিদগণের দ্বারা পরিশোধিত হয়, তবুও তাঁকে সমসাময়িক জেনেটিক থিওরীর জনক না বললেও, পূর্ব পুরুষ নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রায় আটাত্তর বছর বয়স অবধিও তিনি শিক্ষকতা করে যান। দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতার জন্য হতাশা ওঁকে ঘিরে ফেলে, অপরের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়; কিন্তু তা সত্বেও অদম্য এক মানসিকতা নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্তও তিনি প্রকৃতির রহস্য-সমাধানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। অবশেষে ১৯১৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁর লেখা শেষ বইটার ভূমিকায় তিনি লিখে যান যে, তাঁর সারাজীবনের বক্তৃতা এবং লেখাগুলো "a mirror of my own intellectual evolution."

..........রবার্ট কখ..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৩—১৯১০)

আজকের বিজ্ঞান জগতে এটা সুবিদিত যে, সমস্ত রোগের মূলে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বা মাইক্রোব। শুধু এইটুকুই নয়, বিশেষ বিশেষ রোগের মূলে রয়েছে বিশেষ বিশেষ জীবাণু। তাই ডাক্তারেরা আজকে অজানা কোন রোগ নির্ধারণে, সেই রোগের বাহক জীবাণুর সন্ধান করেন। এবং জীবাণুর অস্তিত্বের সন্ধান পেলে তাদের নিধন করার উপায়ও বার করতে চেষ্টা করেন, যাতে করে সেই রোগ সারান যায়। এই যে ধারণা, বিশেষ রোগের মূলে রয়েছে বিশেষ জীবাণু, তা সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচরে করেন একজন জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কখ, রবার্ট কখের সম্বন্ধে পল ডি ক্রুইফ তাঁর "মাইক্রোব হান্টারস" বইতে লেখেন: "The man who really proved that microbes are our most deadly enemies, who brought microbe-hunting near to being a Science, the man who is now the partly forgotten captain of an obscure heroic age." অন্যান্য লেখক এবং বিজ্ঞানীরাও এই জার্মানী চিকিৎসকের সম্বন্ধে প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করেন।

রবার্ট কখ ১৮৪৩ সালে জার্মানীর ক্লসথালে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবন কাহিনীর সঙ্গে কবি থমাস গ্রের, "Full many a flower is born to blush unseen/And wast its sweetness on the desert air." এই কথাগুলোর খুব

মিল রয়েছে। কারণ এক ছোট্ট শহরের ডাক্তার হিসেবে তাঁকে এক সময় হতাশা, স্বল্প আয় ইত্যাদি ঘিরে রাখে, তাঁর পত্নীও তাঁর কাজকর্মে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, তবে তাঁর পত্নীর কাছে বিশ্ববাসী একটা ব্যাপারে কৃতজ্ঞ যে, তিনি কখকে জন্মদিনে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপহার দেন এবং এরই ফলে পরবর্তীকালে বিজ্ঞান জগত জীবাণুদের সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে অবগত হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা হাতে পেয়ে তিনি এর ভেতর দিয়ে নানান ধরণের জীবাণু পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এজন্য তিনি তাঁর ডাক্তারখানার একটা কোণ ঘিরে একটা ছোটখাট্ট গবেষণাগারও তৈরি করে ফেলেন। গবেষণাগারে তিনি প্রথম তাঁর পর্যবেক্ষণ অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর ওপর কেন্দ্রীভূত করেন। তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত এক পশুর শরীরের মধ্যে সরু, লম্বা জীবাণুর অস্তিত্ব নির্ধারণ করেন। এরপর নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি ১৮৭৬ সালে ঐ জীবাণুর এক বিশুদ্ধ কালচারও তৈরী করেন।

কখ তাঁর এই আবিষ্কার ব্রেসলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রকাশ্য জনসভায় প্রকাশ করেন। ফলে তিনি বিজ্ঞান সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। এই খ্যাতির সুবাদে তিনি বার্লিনের "ইম্পিরিয়াল হেলথ অফিসে" তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন; সেখানে তিনি একটা গবেষণাগার ও দুজন সহকারী পান। বার্লিনে এরপর তিনি যক্ষ্মা-রোগের জীবাণুর কালচার তৈরির দিকে নিবদ্ধ হন। একজন যক্ষ্মারোগে মৃত এক রোগীর থেকে জীবাণু নিয়ে খরগোশ জাতীয় এক প্রাণীর চোখে ইঞ্জেকশন করেন। এরপর বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক রঞ্জকের ওপরে রেখে কালচার তৈরি করতে থাকেন। বার বার ব্যর্থ হন। পরিশেষে দুশো একাত্তর বারের বেলায় মিথিলিন ব্লু ব্যবহার করে ১৮০১ সালে তিনি যক্ষ্মারোগের জীবাণুর কালচার তৈরি করেন। এছাড়া ১৮৮৩ সালে তিনি এসথেটিক কলেরা নিবারণের জন্য মিশরে যান। সেখানে এই রোগের জীবাণু হিসেবে 'কমা'র মতো এক ধরণের জীবাণুর আবিষ্কার করেন এবং গরুর মাংসের ক্বাথের সাহায্যে এর কালচার তৈরি করেন। তিনি বলেন যে, যেমন যক্ষ্মারোগের জীবাণু বায়ুবাহিত, তেমনই কলেরার জীবাণুও জলবাহিত। ১৮৯৭ সালে তিনি ম্যালেরিয়া ও বিউবোনিক প্লেগ অনুসন্ধানের জন্য বোম্বাইতে এবং স্লিপিং সিকনেস" রোগের কারণে পূর্ব-আফ্রিকাতে তার কয়েক বছর বাদেই যান, অর্থাৎ কোথাও কোন অজানা এবং অনিয়ন্ত্রিত রোগ দেখা দিলেই এই ছোট্ট জার্মানী ডাক্তার রবার্ট কখের ডাক পড়ত। অবশেষে ১৯১০ সালে হৃৎপিণ্ডের রোগে

তিনি মারা যান। তাঁকে আজও জগত তাঁর অবদানের জন্য স্মরণ করে। মানবজাতির সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগগুলো জয় করবার পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর নাম আজ বিজ্ঞান-জগতে সুবিদিত।

·········উইলহেল্ম কোনরাড রনজেন·········
(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৫—১৯২৩)

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম শৃঙ্খল বিক্রিয়া" সাফল্যের সঙ্গে ঘটে। কিন্তু এই "শৃঙ্খল বিক্রিয়া" হয়তো সম্ভব হতো না যদি না ১/৯৫ সালে জীবন্ত মানুষের হাতের ছবিসহ একটি ম্যানুস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত হত। হাতের ছবিটা কিন্তু সাধারণ ছবি ছিল না; এতে ওপরের মাংস ও পেশী ছাড়াই শুধুমাত্র হাতের হাড়ের ছবি ছিল। রাতারাতি এই আবিষ্কার অর্থাৎ এক্স-রে আবিষ্কারের জন্য পঞ্চাশ বছরের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-শাখার প্রধান উইলহেল্ম কোনরাড রনজেন বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এই আবিষ্কারের সংবাদ জগতের সমস্ত সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে যায়। এক্স-রশ্মির প্রয়োজনীতা শীঘ্রই সমস্ত বিজ্ঞান জগত উপলব্ধি করে। এক্স-রশ্মির ভিত্তি করেই পরবর্তীকালেই বেকারেলের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার আবিস্কার, থমসনের ইলেকট্রন আবিষ্কার এবং রাদারফোর্ডের পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার সম্পন্ন হয়।

জগতের একজন সেরা পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ হলেও বাল্যকালে তার খুব একটা আভাস পাওয়া যায় না। ১৮৪৫ সালের ২৭শে মার্চ একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে হিসেবে উইলহেল্ম কোনরাড রনজেন জার্মানীর লেন্নেপ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে তাঁর পরিবার বৈপ্লবিক গণ্ডগোলের জন্য হল্যাণ্ডে চলে যান। হল্যাণ্ডে তিনি উইট্রেথট টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু একজন শিক্ষককে ব্যঙ্গ করার জন্য তাঁকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সত্বেও তাঁর যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে এক দক্ষতা গড়ে। এই দক্ষতার কথা শুনে, তাঁর বাবা উইট্রেথট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাঁকে এক শিক্ষকের কাছে নিযুক্ত

করেন। ভাগ্য আবার তাঁর প্রতি বিরূপ হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকদের মধ্যে একজনের জায়গায় সেই শিক্ষক, যাঁকে তিনি ব্যঙ্গ করেন, নিযুক্ত হন। শোনা যায় যে, এই শিক্ষকের জন্যই সেবারেও তিনি নাকি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেন। তবে তাঁকে পরবর্তী দুটো ষাণ্মাসিক পাঠক্রমের ক্লাস করবার জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর তিনি সুইজারল্যাণ্ডের, জুরিখের পলিটেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হয় এবং তিনি কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনার থেকে নানা রকম খেলাধুলোয়ই তাঁর বেশী আগ্রহ দেখা যায়। ফলে তাঁর ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যাপকগণ নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে তিনি জীবনে কোনদিন পাশ করতে পারবেন না, ঠিক সেই সময়ই তাঁর সঙ্গে ঐ স্কুলেরই তরুণ, প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞার অধ্যাপক অগাস্ট কুণ্ডতের সাক্ষাৎ হয়। ইঞ্জিনীয়ারীংয়ে তাঁর অনীহার কথা বোধ করে অগাস্ট কুণ্ডত্ তাঁর গবেষণাগারে, রনজেনকে সহকারী হিসেবে ডেকে নেন। এবং এইভাবে চব্বিশ বছর বয়সে পদার্থবিদ্যার ওপর তাঁর ভবিষ্যত সফলজীবনে সূত্রপাত হয়। জীবনে সেই প্রথম রনজেন মন দিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এই সময়ে এক উল্লেখযোগ্য কম সময়ের মধ্যেই তিনি পদার্থবিদ্যার নীতিগুলো আয়ত্ত করেন। দিনে গবেষণাগারে অগাস্ট কুণ্ডতের কাজকর্মে সাহায্য করতেন; কিন্তু রাত্রিবেলায় বিভিন্ন জার্নালের মধ্যে প্রকাশিত পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো পড়তেন। কিছুকাল পরেই কুণ্ডত্ যখন স্ট্রাসবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি সহকারী রনজেনকেও সেখানে নিয়ে যান। এইখানে রনজেন কিছু প্রথম সারির গবেষণামূলক কাজ করেন। যেমনঃ গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের অনুপাত নির্ণয়, কেলাসের তাপ পরিবহণ ক্ষমতার পরিমাপ। এছাড়া তিনি জলবাষ্পে তাপের শোষণ এবং গ্যাসের মধ্যে সমবর্তনের তলের তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘূর্ণনের ওপরেও পরীক্ষা করেন।

খুব শীঘ্রই তিনি একজন প্রতিভাবান পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্ হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার প্রস্তাব পান, এইভাবে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে, হেলমোৎস ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সুপারিশে, তিনি, গিয়েসেনের, হেসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে এবং এখানকারই সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন।

এইখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত—"এক্স-রশ্মি" (x-ray) আবিষ্কার করেন। একদিন তিনি ক্রুকের টিউবের সাহায্যে যখন তাঁর অন্ধকার গবেষণাগারে ক্যাথোড রশ্মির অতিরিক্ত কিছু ধর্ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন, সেইসময় তিনি দেখেন যে, টিউব থেকে চার ফুটের কিছু দূরে একটা সবুজাভ আলোক, কারণ হিসেবে তিনি লক্ষ্য করেন যে আলোকের উৎস একটা বেরিয়াম-প্ল্যাটিনো সায়ানাইডের প্রলেপ যুক্ত ছোট পর্দা। বার বার পর্দাটাকে সরিয়ে পরীক্ষাটা নিষ্পন্ন করেন। এতে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন ক্রুক টিউব থেকে অজানা এক অদৃশ্য রশ্মি রাসায়নিক পদার্থে পড়ছে ; রাসায়নিক পর্দা সেই রশ্মি শোষণ করছে এবং দৃশ্যমান আলোক হিসেবে তাকে পুনর্বিকিরিত করছে। তিনি এই রশ্মির নামকরণ করেন—"এক্স-রশ্মি," তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যই প্রথম ১৯০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তিনিই "নোবেল প্রাইজ" পান।

X-ray Apparatus
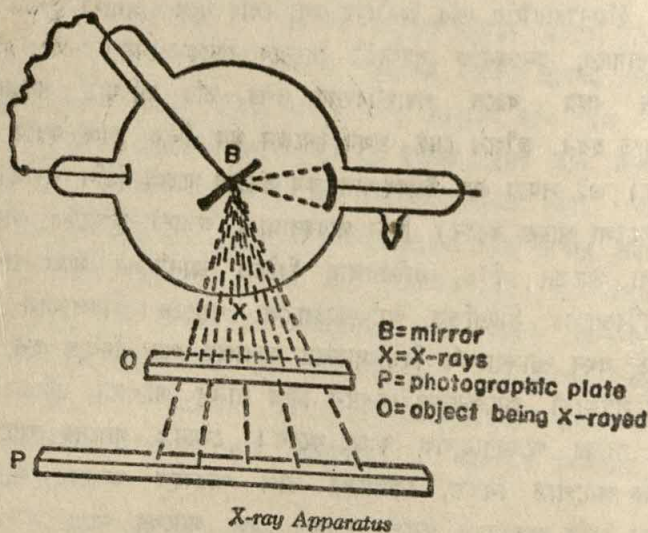
তাঁর আবিস্কারের পেটেন্ট নিয়ে তিনি সহজেই কোটিপতি হতে পারতেন। কিন্তু, তাঁর পূর্বসূরী জোসেফ হেনরীর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিরই সম্পদ এবং পেটেন্ট নিয়ে কোনমতেই সেই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। এমন কি তাঁর সহকর্মীরা যখন এক্স-রশ্মিকে, "রনজেন রশ্মি" বলে প্রচলিত করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ জানান। ১৯০১ সালে তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন, এবং ১৯২০ সালে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই

থাকেন। ১৯০১ সালে তিনি "নোবেল প্রাইজ" পান, কিন্তু প্রাইজের সমস্ত অর্থই তিনি উর্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে যান। অবসর গ্রহণের পরে খুবই স্বল্পকাল তিনি বেঁচে থাকেন। আটাত্তর বছর বয়সে, ১৯২৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী এই পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ মারা যান। দুর্ভাগ্যের কথা তিনি ক্যান্সার রোগে মারা যান; এবং এই ক্যান্সার রোগই আজকাল এক্স-রে দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।

টমাস আলভা এডিসন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৭—১৯৩১)

১৮৬৯ সাল, বাইশ বছরের এক তরুণ এক শুভ প্রভাতে নৌকা করে নিউইয়র্ক শহরে আসেন। কপর্দকশূন্য অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় সমস্তদিন ঘোরেন। সন্ধ্যে নাগাদ একজন পরিচিত টেলিগ্রাফ অপারেটারের সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং তাঁর কাছ থেকে এক ডলার ধার নিয়ে তিনি তাঁর ক্ষিধে মেটান। সন্ধ্যেয় তিনি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর একটা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেন ও চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত গোল্ড ইন্ডিকেটার কোম্পানীর ব্যাটারী ঘরে রাতে থাকবার অনুমতি পান। দিনের বেলায় তিনি গোল্ড ইন্ডিকেটার কোম্পানীর অপারেটিং ঘরে কাটাতেন। এইভাবে দুটো দিন চলে যায়। তৃতীয় দিনে একটা দুর্ঘটনার ফলে সেন্ট্রাল ট্রানসমিটিং মেশিনটা-হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের খরিদ্দারের প্রায় তিনশো মেশিনও বন্ধ হয়ে যায়। সে এক মহামারী কান্ড। কি যে হয়েছে কেউ তা ঠিক করতে পারছে না। এই সময় এই নবাগত অপরিচিত যুবক হঠাৎ প্রেসিডেণ্টের সামনে এসে বলেন যে তিনি মেসিন চালিয়ে দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট তো অবাক হয়ে যান। নিরুপায় হয়ে তিনি সেই যুবককে অনুমতি দেন। তখন সেই যুবক সেই যন্ত্রে হাত দেন। আশ্চর্যের বিষয়, দু-ঘণ্টার মধ্যে সেই যন্ত্র আবার চলতে থাকে। তখন তাঁকে সেখানে মাসিক তিনশ-ডলার মাইনেতে সুপারিটেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োগ করা হয়। সেদিনের সেই করিতকর্মা যুবকই হলেন, সর্বকালের সর্বদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের শ্রেষ্ঠতম বলে উল্লেখিত টমাস আলভা এডিসন।

টমাস আলভা এডিসন ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার মিলানের ওহিয়ো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি মাঝেমধ্যেই অসুস্থতায় ভুগতেন। কিন্তু তা হলেও ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক আগ্রহ দেখা যায়। দুর্বলতার জন্য স্কুল থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হয় এবং বাড়ীতেই তিনি মায়ের সযত্ন তত্বাবধানে পড়াশোনা করতে থাকেন।

দশ-এগারো বয়সেই রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর এক প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। এর ফলে তিনি রসায়নের নানান বই পড়েন একটা ছোট্ট ঘরে গবেষণাগার তৈরী করেন। স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে নানান পরীক্ষা করেন। কিন্তু এই গবেষণায় রাসায়নিক পদার্থ খরচের জন্য তাঁর হাত খরচ যথেষ্ট নয় দেখে তিনি বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে, পোর্টহারণ থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রেলওয়ের ট্রেনে ট্রেনে সংবাদপত্র ও অন্যান্য খুচরো জিনিষ বিক্রি করতে শুরু করেন। তাঁর জিনিষের রাখবার জন্য মালগাড়ীর একটা কামরা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি সেখানই বাড়ী থেকে তাঁর গবেষণাগার তুলে আনেন এবং অবসর সময়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা পুরানো মুদ্রাযন্ত্র ও কিছু টাইপ কিনে একটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে ট্রেনে বেচাতে শুরু করেন। এই সাপ্তাহিকের নাম দেওয়া হয় "উইকলি হেরাল্ড" এবং এডিসন হন এই পত্রিকার সর্বেসর্বা। যতদূর জানা যায় চলতি ট্রেনে ছাপা এটাই প্রথম সংবাদপত্র। এইভাবে এডিসন প্রায় দু-তিন বছর কাটান, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় একদিন ফসফরাস সমেত একটা শিশি গাড়ীর মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং কামরায় আগুন ধরে যায়। তখন ট্রেনের গার্ড বালক এডিসনকে শিশি বোতল শুদ্ধু গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয় এবং তাঁর কর্ণমূলে এমন এক ঘুঁষি মারে যে, সেই দিন থেকেই তাঁর কানের গণ্ডগোল ঘটে ও এর ফলেই ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি বধির হয়ে যান।

এই ঘটনার কিছুদিন আগেই তিনি এক স্টেশনের কর্মচারীর মেয়েকে রেল পাইনের ওপর থেকে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ বাবা এডিসনকে টেলিগ্রাফী শেখাতে রাজী হন। সুতরাং তিনি যত্ন সহকারে টেলিগ্রাফী শিখতে থাকেন। একই সঙ্গে রাসায়নিক গবেষণা ও তড়িৎ-বিদ্যাও চলতে থাকে। কিছুদিন পরেই তিনি এক শ্রেষ্ঠ টেলিগ্রাফার বলে খ্যাতি লাভ করেন। পাঁচ বছর এই ভাবে কাজ করেন।

এই সময় তিনি টেলিগ্রাফীর দ্বিত্ব প্রণালী আবিষ্কার করেন। কিন্তু এর পেটেন্ট বিক্রয়ের চেষ্টায় নানান কারণে ব্যর্থ হন। ১৮৬৯ সালে বোস্টন শহরে "স্টকটিকার" নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে অপর কয়েকজনের চাঁদার সাহায্যে সেটাকে তিনি ব্যবসায়ের সামগ্রী করে তোলেন।

একই বছরে অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে তিনি নিউইয়র্কে আসেন। এখানে তিনি গোল্ড ইন্ডিকেটার কোম্পানীতে নিযুক্ত হন। এখানে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কোম্পানীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং "স্টক-প্রিন্টার" সম্পর্কিত কয়েকটি আবিষ্কার করে এক সঙ্গে ৪০ ০০০ ডলার পুরস্কার পান। এই অর্থ দিয়ে তিনি নেওয়ার্কে এক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপর থেকে এই কারখানাতেএ শুরু হয় তাঁর আবিষ্কারের বন্যা।

তিনি যে কত আবিষ্কার করেন তা বলতে গেলে কোন মহাভারত সৃষ্টি করতে হবে তবে উত্তর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম, টেলি-ফোনের কার্বন ট্রান্সমিটার, চতুর্গুন টেলিগ্রাফ প্রণালী। এছাড়া ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন, ১৮৭৯ সালে ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প এবং ১৮৯১ চলচ্চিত্র গ্রহণের উপযোগী যন্ত্র আবিস্কার করে বিশ্ব বাসীকে মুগ্ধ করে দেন। তাঁর জীবন ইতিহাসে শুধু আবিষ্কার, আবিষ্কারের পর পেটেন্ট, পেটেন্ট বিক্রয় থেকে অর্থ এবং সেই অর্থ আবার নতুন আবিষ্কারে ব্যয়। এইভাবে এই "নরদেহী বিশ্বকর্মার" জীবনে বৃত্তাকারে এই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর জীবন প্রদীপ ১৯৩১ সালে চিরতরে নিভে যায়।

এডিসনের অবদানের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তাঁর কাছ থেকে উপকার পায়নি বা তাঁর কাছে ঋণী নয় এমন লোককে খুঁজে বার করতে গেলে গভীরতম অরণ্যে যেতে হবে। মানব সভ্যতা যতদূর পর্যন্ত পৌছেছে, এডিসনের প্রভাব ততদূর পর্যন্ত।

——ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক——

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫৮—১৯৪৭)

আলোক কি? আলোকের প্রকৃতি কি? আলোক কি তরঙ্গ, না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি? এই প্রশ্নটি নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীগণ দুভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল নিউটনের "কণা-তত্ত্বকে" সমর্থন করেন এবং অন্যদল ক্রিস্টিয়ান হাইজেনসের "তরঙ্গ-তত্ত্ব"কে অনুসরণ করেন। জগতের সেরা গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী, এই খ্যাতির সুবাদে এর পরের একশো বছর নিউটনের মতবাদই স্বীকৃতি পেয়ে আসে। কিন্তু এরপর আলোকের ব্যাভিচার, ম্যাক্সওয়েলের বিখ্যাত তড়িত-চৌম্বক তত্ত্ব প্রভৃতির আবিষ্কারে, আলোকের তরঙ্গবাদ প্রাধান্য পায়। এমনকি হেইনরিখ হার্টজ ঘোষণা করেন: "........The wave theory of light is a certainly". এর ঠিক এগার বছর বাদে জার্মান-বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংক কোয়ান্টাম থিওরী প্রবর্তন করে এই দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন করেন। এই থিওরী অনুযায়ী আলোক-শক্তি, এমনকি তাপশক্তিও কতকগুলো শক্তি কণার সমষ্টি। এই কণাগুলোর নাম "কোয়ান্টা"।

ম্যাক্স প্ল্যাংক, ১৮৫৮ সালের ২৩শে এপ্রিল, জার্মানীর বন্দর-শহর কিয়েলে এক জার্মান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর পরিবার মিউনিখে চলে আসে, এবং সেজন্য সেখানকার "ম্যাক্সি মলিয়ান জিমন্যাসিয়ামে" ম্যাক্স প্ল্যাংকের শিক্ষালাভ হয়। এখানেই তিনি গণিত ও বিজ্ঞানের একজন সত্যিকারের সুযোগ্য শিক্ষক হারমান মুলারের সংস্পর্শে আসেন এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র, তাপ গতিবিদ্যার সূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অবগত হন।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা করতে শুরু করেন। প্রথমে শক্তি ও এনট্রপি সম্বন্ধে গবেষণা করেন, ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন পদার্থবিদ্যা প্ল্যাংকের এই প্রবন্ধগুলোতে কোন সাড়াশব্দ দেন না। একথা তিনি তাঁর "সায়েন্টিফিক অটোবায়োগ্রাফী"তে প্রকাশ করেন। তখনকার অধ্যাপকদের মনে হোত যে তাঁরা প্ল্যাংকের এই প্রবন্ধগুলোর আদৌ কিছু বুঝতে পারতেন না; কিন্তু তবুও তাঁরা প্ল্যাংকের পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে ও গণিতের সেমিনারে অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য এগুলোকে থিসিস

হিসেবে মেনে নিতেন এমনকি এই বিষয় নিয়ে যারা কাজ করতেন। সেই সমস্ত পদার্থবিদগণও তাঁর গবেষণায় কোনরকম আগ্রহই প্রকাশ করতেন না; যেমন, না ডন জলি না হেলমোহৎস প্ল্যাংকের প্রবন্ধগুলো আদৌ পড়তেন আর কারশফ এর বিষয়বস্তু যদিও পড়তেন, তবে অনুমোদন করতেন না। এভাবে বেশ কয়েকটা বছর তিনি শক্তি ও এনট্রপি সম্বন্ধে গবেষণা করে যান। তিনি দেখতে পান যে, সমস্ত প্রাকৃতিক সিস্টেমগুলোর সবথেকে প্রয়োজনীয় ধর্ম হচ্ছে শক্তির পরেই এনট্রপি। এনট্রপি এক প্রকারের অব্যবহৃত শক্তি যা শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হবার কালে সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি আবিষ্কার করেন যে, এনট্রপি পদ্ধতির দ্বারাই সমস্ত ভৌত ও রাসায়নিক সাম্যতার সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এবারও দুর্ভাগ্যক্রমে প্ল্যাংক তাঁর গবেষণার জন্য কোন রকম স্বীকৃতি পান না; কারণ এই একই সূত্র আগেই আমেরিকান অব্যবহারিক পদার্থবিদ্ জোসিহ উইলার্ড গিবস আবিষ্কার করেন, যদিও প্ল্যাংক এই সূত্র নিজেই স্বাধীন ভাবে আবিষ্কার করেন। এভাবে ছ-ছটা বছর প্ল্যাংককে অধ্যাপকদের জন্য অতিবাহিত করতে হয়। অবশেষে ১৮৮৫ সালে তিনি গটিঞ্জেন ফিলসফিক্যাল ফ্যাকালটিতে তাঁর "দ নেচার অফ এনার্জি" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্ল্যাংক এই প্রবন্ধের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার পান। পরিশেষে ১৮৮৫ সালে অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কারশফের সহকারী অব্যবহারিক পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখানেই তিনি ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

বার্লিনে তিনি আবার তাঁর প্রিয় বিষয়, এনট্রপি ও শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। এই সময় তিনি "কালো-বস্তু" বিকিরণের সমস্যার মুখোমুখি হন। এই সমস্যার সমাধানে তাঁর অনেক পূর্বসূরীও নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁরা প্রচলিত পদার্থ বিজ্ঞানের থিওরীর সাহায্যে এই সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হন। সমস্যাটা এইরকম যে, লর্ড র‍্যালে ও জীন অতি বেগুনী রশ্মি বিকিরণের জন্য পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্যে এক লেখচিত্র অংকন করেন এবং ওথাইন ও বোল্টজম্যান অবলোহিত রশ্মি বিকিরণের জন্য আর এক ধরণের লেখচিত্র পান; এই দুই লেখচিত্রের সমন্বয় সাধনপূর্ব একটা সূত্র আবিষ্কার করতে হবে, যা দুটো লেখচিত্রকেই ব্যাখ্যা করতে পারে। প্ল্যাংক

এই সমস্যার সমাধানে রত হন এবং ফলস্বরূপ তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "কোয়াণ্টাম থিওরীর" আবিষ্কার হয়। এই সূত্রের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেন যে, কোন বস্তু অবিচ্ছিন্ন ভাবে শক্তি বিকিরন করে না; বরং বিচ্ছিন্ন ভাবেই শক্তির বিকিরণ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, কালোবস্তু থেকে বিকিরিত শক্তি, কোয়াণ্টার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এবং প্রত্যেক কোয়াণ্টার শক্তি $h\nu$-এর সঙ্গে সমান, সেখানে ν হচ্ছে বিকিরণের কম্পাঙ্ক এবং h হচ্ছে একটা ধ্রুবক রাশি, যার মান তিনি নির্ধারণ করেন $6{\cdot}56 \times 10^{-34}$ হিসেবে। তিনি এই আবিষ্কার ১৯০০ সালের ১৯শে অক্টোবর, বার্লিন ফিজিক্যাল সোসাইটির এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে পাঠ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খুব কম বিজ্ঞানীই তাঁর এই সূত্র উপলব্ধি করেন, যেটা অবিরত শক্তি নির্গত তরঙ্গ সূত্রে প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত তরঙ্গের সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে তাঁর থিওরীর ভিতই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভাবে নির্গত শক্তি। সেজন্য তাঁকে স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘ আঠারো বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত "ফটো-তড়িৎ ক্রিয়া" ব্যাখ্যা করতে প্রথম প্ল্যাঙ্কের সূত্র ব্যবহার করেন। ১৯১৩ সালে নীলস বোরের পারমাণবিক গঠন প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে মিলিকান আইনস্টাইনের গাণিতিক সমীকরণ ও ফটোতড়িৎ সূত্রের পরীক্ষামূলক যাচাইকরণ করতে গিয়ে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (h)-এর মান নির্ণয় করেন এবং তা "কালো বস্তু বিকিরণের" ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্ল্যাঙ্কের মানের সঙ্গে সমান। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে প্ল্যাঙ্কের মতবাদের যথার্থতা প্রমাণিত হয় এবং ১৯১৮ সালে সর্বোত্তম মৌলিক আবিষ্কার "কোয়াণ্টাম থিওরীর" জন্য ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নোবেল প্রাইজ পান। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের জন্যই জগতের এক নতুন রহস্যের সমাধান হয় এবং আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের শুরু হয়। আজকের দিনে পরমাণু শক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীগণ তরঙ্গ-কণা মতবাদ স্বীকার করে নেন।

বিজ্ঞান জগতের মত ব্যবহারিক জীবনেও তাঁকে অনেক মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৯০৯ সালে তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যান। এর পরে যদিও তিনি আবার বিয়ে করেন এবং প্রথম পক্ষের চারটে সন্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষে আরও তিনটে সন্তান হয়। কিন্তু তবুও তাঁর সাতটা ছেলে-মেয়ে কেউই বেঁচে থাকে না। ১৯১৬ সালে তাঁর বড় ছেলে কার্ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং তার এক বছর পরেই তাঁর দুই মেয়ে "চাইল্ডবার্থ" রোগে মারা যান। ১৯৩৩ সালে নাৎসীশক্তি জার্মানীতে ক্ষমতায় এলেও প্ল্যাঙ্ক জার্মানীতেই থাকেন। তাহলেও তিনি প্রকাশ্য ভাবে

হিটলারের বর্বরনীতির বিরোধিতা করেন। এটা প'চাত্তর বয়সী এক মানুষের পক্ষে যথেষ্ট সাহসিকতার একটা ব্যাপার ছিল। তবে এজন্য তাঁকে চরম মূল্যও দিতে হয়। তাঁর শেষ সন্তান এরউইন প্ল্যাঙ্ককে, হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে, ১৯৪৪ সালে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত করা হয় এবং মেরে ফেলা হয়। এর পরেই এক বিমান আক্রমণে তাঁর গবেষণাগার, বাড়ীঘর নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি ও তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী অল্পের জন্য বেঁচে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্পকাল পরেই, তাঁর নব্বইতম জন্মবার্ষিকীর মাত্র ছমাস আগে, ১৯৪৭ সালের ৪ই অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর সম্মানে কাইজার উইলহেল্ম অ্যাকাডেমীর নাম বদলে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক অ্যাকামেডী রাখা হয় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুরস্কার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডেলও প্রবর্তিত করা হয়। বিজ্ঞান ইতিহাসে তাঁর মত প্রতিভা অল্পই পাওয়া যায়। তাঁর মতবাদ শুধু যে দুটো ক্লাসিক্যাল থিওরীর সমন্বয় সাধন করেন তা নয়, উপরন্তু আমাদের পারমাণবিক বিশ্বের এক নতুন রূপ উন্মোচন করেন। তাঁর প্রতিভার অপারিসীমতা সম্পর্কে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়ঃ একবার মহামনীষি আইনস্টাইনকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের বইয়ের ওপর একটা ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করা হলে তিনি প্ল্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক গল্প বলেন। তিনি বলেন যে, একবার বিদ্যার দেবী ঠিক করেন যে বিজ্ঞানচর্চা ঠিক মতন হচ্ছে না বলে পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানচর্চা তুলে নিয়ে যাবেন। এজন্য তিনি নানান স্থান থেকে বিজ্ঞানচর্চা তুলে নিয়ে পরিশেষে জার্মানের মূল স্তম্ভের দিকে এগোন। থামের কাছে এসে দেখেন যে ভেতর থেকে একটা আলো বেরিয়ে আসছে। আলোক অনুসরণ করে দেবী দেখেন যে একজন ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে বিজ্ঞান-গবেষণা করছেন। দেবী তখন তাঁকে ডাকলেন ; কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে তিনি বললেন যে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন এবং তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। তিনি তাঁর গবেষণায় এতই মগ্ন যে, বিদ্যার দেবীকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে বিদ্যার দেবী সম্যক উপলব্ধি করেন যে, না এখনও পৃথিবীতে সত্যিই বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তার কার্যসূচী পরিত্যাগ করে আবার ফিরে যান। এই ব্যক্তি, যিনি সেই তন্ময় হয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করছিলেন। তিনিই হলেন স্বয়ং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক।

আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ

(খৃীষ্টাব্দ ১৮৪৯—১৯৩৬)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে নামটি সবচেয়ে বেশী বিতর্কের আলোড়ন তোলে, যাঁকে কমিউনিস্টরা রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসীয় বিজ্ঞানী হিসেবে মাহাত্ম্য দান করে, যাঁকে রাশিয়ার বাইরের পৃথিবীর বিজ্ঞানীগণ সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদগণের সম্মানীয় ডীন বলে মনোনয়ন করেন, শুধু এইটুকুই নয়, যিনি-তাঁর স্বদেশের অর্থাৎ রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক স্বাধীনতার শ্বাসরোধের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন: "If what is happening in Russia is an experiment, for such an experiment I would deeply regret having to sacrifice a single frog." আবার পরবর্তীকালে এই তিনিই প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন, যা কিনা কোন জাতি কখনো কোন বিজ্ঞানীকে দেয় নি, উচ্চস্বরে জগতের কাছে প্রকাশ করেন: "Our Government, like myself, is an experimenter but in an incomparably higher order , I passionately desire to see the completion of our historic social experiment."—এই সমস্ত বিপরীত গুণ যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মধ্যে সমাবেশ হয় তিনিই হলেন রাশিয়ার স্বনামধন্য মনীষি আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ।

আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ ১৮৪৯ সালে মস্কোর অন্তর্গত একটা ছোট্ট গ্রাম রিয়াজানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান যাজক ছিলেন। তাঁর বাবা তাঁকে একজন সরল, ভদ্র, সাধাসিধে করে গড়ে তোলন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁর ছেলেও যেন তাঁরই মত একজন যাজক হয়। সেজন্য আইভান পেত্রোভিচ গ্র্যাজুয়েট হবার পর স্থানীয় সেমিনারীতে প্রবেশ করে ব্রহ্মবিদ্যা পড়তে শুরু করেন। সেমিনারীতে তাঁর দিনগুলোকে ছিল খুবই সুখের, এই দিনগুলোকে পরবর্তী জীবনে তাই মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণ করতেন। এখানে প্রত্যেক ছাত্রেরই, তার বিশেষ দক্ষতার উন্নতি সাধন করার প্রভূত সুযোগ ছিল। এবং সেখানে পাভলভের প্রিয় খেলাধুলোও ছিল, আকারে ছোটখাটো হলেও তিনি প্রচণ্ড শক্তি ও সহ্যক্ষমতা রাখতেন। তিনি এক দুধর্ষ প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব এবং দুয়ের এক অদম্য ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি যখন তর্ক করতেন, তখন প্রায়ই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতেন, মনে হোত যে প্রচণ্ড রেগে গেছেন।

এমন কি তর্কের সময় তিনি এত জোরে ও এরকম বলিষ্ঠভঙ্গীতে কথা বলতেন যে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বাকশূন্য অবস্থায় অপ্রতিভ হয়ে বাকযুদ্ধে ক্ষান্ত দিত। তা সত্বেও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আলাপ আলোচনায় কিন্তু পাভলভ প্রতিপক্ষের সঠিক যুক্তির কাছে পরাজয় মেনে নিতেন।

সেমিনারীতে থাকা কালেই তাঁর হাতে ডারউইনের "অরিজিন অফ স্পেসিসের" একটা সংস্করণ আসে। এই নতুন "প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনবাদ" পড়ে তিনি উদ্দীপিত হন এবং একজন বিজ্ঞানী হবার জন্য মনস্থির করেন। ফলে একুশ বছর বয়সে সেমিনারী ছেড়ে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়তে সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মেণ্ডেলিভের রসায়ন-শাস্ত্রের ক্লাসে যোগদান করারও সুযোগ পান। কিন্তু তাঁর প্রিয় বিষয় ও প্রিয় শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে জীববিজ্ঞান ও ইলিয়া সাইঅন। এই পরীক্ষামূলক শরীরতত্ত্ববিদ্ সাইঅনের অধীনে তিনি অগ্ন্যাশয়ের স্নায়ু পরিবহণের অপর গবেষণা করেন এবং এইভাবে পরিপাকতন্ত্রের ওপর তাঁর গবেষণার শুরু হয়।

এরপর তিনি পরীক্ষামূলক শারীরতত্ত্ববিদ্যার দিকে ঝোঁকেন, এজন্য তিনি মেডিসিন নিয়ে পড়তে শুরু করেন। এই বিষয়ে এম, ডি, করার ফাঁকেই তিনি ভেটারিনারি শাখার গবেষণাগারের সহকারী পদে যোগ দেন যাতে করে পরিপাকতন্ত্রের ওপর গবেষণাও একইসঙ্গে করতে পারেন। ১৮৭৮ সালে শশকজাতীয় প্রাণীর অগ্ন্যাশয় নলির নিয়ন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার ওপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে তিনি মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করেন। থিসিসের জন্য তিনি হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়ার ওপর স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবেষণা করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ তিনি আবিষ্কার করেন যে, অগমেটার স্নায়ুর দ্বারা হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলো প্রভাবিত হয়। এছাড়া এই স্নায়ুগুলো হৃৎস্পন্দনের গতিশক্তিকেও প্রভাবিত করে এবং ভেণ্ট্রিকেল থেকে প্রত্যেক সংকোচনের জন্য নির্গত রক্তের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ১৮৮৬ সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গের শরীরতত্ত্ববিদ অধ্যক্ষের পদটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই তাঁর আবেদন মঞ্জুর না করে তাঁর থেকে অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ্য এক ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। কিন্তু এই পার্থিব প্রত্যাখ্যান দমে না গিয়ে তিনি অক্রিয় শুঁয়োপোকা থেকে পূর্ণ প্রজাপতির রূপান্তরের কালে শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। একবারের ঘটনায় গবেষণাগারে অপর্যাপ্ত আদ্রতার অভাবে তাঁর পরীক্ষার নিমিত্ত রাখা সমস্ত পতঙ্গ মারা যায়। ঠিক

সেই সময় তাঁর স্ত্রী, তাঁকে অধ্যাপকপদ না পাওয়ার জন্য ভৎর্সনা করেন, কারণ ওই অধ্যাপকপদ পেলে তাঁদের বাড়ন্ত পরিবারের সংস্থানের জন্য আয়ের পরিমাণ বাড়ত। এতে তখন তিনি রেগে বলেন : "Leave me alone. A real tragedy has occured. All my butterflies are dead and you worry over a silly trifle."

তবে তাঁর প্রতিভা খুব একটা বেশীদিন অস্বীকৃত থাকে না। ১৮৯০ সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গের নতুন এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের ইনস্টিটিউটের শারীরবৃত্তীয় শাখার পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। ফলে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্তি পান এবং মানসিক শান্তি লাভ করেন। এইখানে তিনি পরিপাক পদ্ধতির ওপর গবেষণা করেন। এই গবেষণা কালে তিনি আবিষ্কার করেন যে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুর উত্তেজনার ফলেই স্বাভাবিক পাচক রস ক্ষরণ হয়। এই ক্ষরণের জন্য পাকস্থলীতে জমা খাদ্যের কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। তাঁর এই আবিষ্কার ১৮৯৭ সালে তাঁর লেখা "দি ওয়ার্ক অফ দি ডাইজেসটিভ গ্ল্যাণ্ডস" নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য, প্রথম রাশিয়ান হিসেবে, পাভলভ ১৯০৪ সালে নোবেল প্রাইজ পান। তবে ১৯০২ সালে বেলিস এবং স্টারলিং নামে দুজন ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে অগ্ন্যাশয় থেকে জারকরস ক্ষরণ রাসায়নিক নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা দেখান যে, পাকস্থলী থেকে স্বাভাবিক নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সংস্পর্শে যদি অন্ত্রকে আনা যায় তাহলে অন্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে সিক্রেটিন নামে এক ধরণের বিশেষ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। গ্ল্যাণ্ডের প্রক্রিয়ার এই রাসায়নিক বা হরমোন-সংক্রান্ত মতবাদ পাভলভের কাছে এক নতুন বিষ্ময়কর তথ্য। বেলিস এবং স্টারলিং এর পরীক্ষা তাঁর নিজের গবেষণাগারে আবার পরীক্ষা করা হয়। এবং একই ফল পাওয়া যায়, তখন তিনি নিজেকে গবেষণায় নিমগ্ন রাখেন। কিছুকাল পরে অবশ্য তাঁকে ধীর, স্থির শান্ত কণ্ঠে বলতে শোনা যায় : "Of course They are right. We have no exelusive patent on the truth." কিন্তু তা সত্বেও এরপরে তিনি পরিপাক ক্রিয়া ত্যাগ করে জন্তুর মস্তিস্কের প্রকৃতি এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন। এরই ফলে "শর্তসপেক্ষ প্রতীবর্তী" ক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং এ সম্বন্ধে ১৯০৭ সালে তাঁর "কনডিশাণ্ড রিফ্লেক্সেস" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত কার্যাবলীতে তাঁর খ্যাতি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে যান। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের বন্ধুত্ব এবং অধ্যাবসায়ে মুগ্ধ হয়ে যান। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে গরীবদের পড়ার এবং বিজ্ঞানদের স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগ দেখে তিনি খুশী হন। দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর ছাত্রদের বলেনঃ "Nowhere are People under such poor condition as in the U. S. S. R., and in no other country is freedom of thought so restricted."

"কারণ তখন রাশিয়ায় স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ ছিল না, বিজ্ঞানীগণকে বাধ্য করা হোত যাতে করে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও শিক্ষা মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে খাপ খায় এবং এমন কি যারা তা করত না, তাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহীর মত আচরণ করা হোত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা সম্পর্কে চুপচাপ থেকেই তিনি তাঁর গবেষণা নিয়ে মগ্ন থাকেন। অবশেষে আটাত্তর বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে মৃত্যু তাঁকে তাঁর প্রিয় গবেষণা থেকে নিরস্ত করে।

..........অ্যান্টয়েন হেনরী বেকারেল..........

(খৃষ্টাব্দ ১৮৫২—১৯৪৭)

ঊনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশককে বিজ্ঞান ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। কারণ এই সময় এমন কিছু আবিষ্কার হয় যার ফলে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাপিত হয়। এর মধ্যে রনজেনের "এক্স-রশ্মি", ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের "কোয়ান্টাম থিওরী", আইনস্টাইনের "ফটো তড়িত ক্রিয়া" প্রভৃতি আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারও এই সময়ে হয় এবং তা হল ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেলের "স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা" আবিষ্কার। এই আবিষ্কার অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, এমন কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যারা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের থেকে কিছু রশ্মি নির্গত করে এবং পরিশেষে অন্য আর এক মৌল পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যেমন ইউরেনিয়াম—২৩৮ (অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা ২৩৮) রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় সীসা—২০৬।

তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কর্তা অ্যান্টয়েন হেনরী বেকারেল ১৮৫২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্যারিসের এক বিজ্ঞানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ অ্যান্টয়েন সিজার ছিলেন প্যারিসের "মিউজিয়াম ডি" সটয়ের ন্যাচারালের" পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তিনি তড়িত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণা করেন। তাঁর বাবা আলেকজাণ্ডার এডমণ্ড "মিউজিয়ামের" একাধারে ছাত্র, সহকারী-অধ্যাপক এবং অধ্যাপকের পদ ভূষিত করেন এবং তিনিও বিভিন্ন সালফাইড ও ইউরেনিয়াম যৌগে পরিলক্ষিত অনুপ্রভা সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গবেষণা করেন। এই রকম পরিবারের ছেলে হয়ে তিনি স্বভাবতই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। এজন্য তিনি "ফ্রেঞ্চ ইকলে পলিটেকনিক" স্কুল থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। আরও উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি সেতু ও রাস্তা সংক্রান্ত সরকারী সংস্থায় চাকরী নেন! এইখানে তিনি পরে মুখ্য ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হয়।

১৮৯২ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হলে, হেনরী রেকারেল "মিউজিয়ামের" সেই পদে, যে পদে আগে তাঁর বাবা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন, নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁর গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল ভৌত আলোক-বিজ্ঞান এখানে আগেই তিনি আলোকের সমবর্তনের ওপর চৌম্বক-বিক্রিয়া, আলোক শোষণ ও অনুপ্রভার ওপর গবেষণা করে। সুতরাং সেদিক থেকে বলতে গেলে তাঁর তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার মোটের ওপর একজন শখের বিজ্ঞানীর আবিষ্কার হয়; বরঞ্চ একজন সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ গবেষকের উদ্ভাবন বলা যায়। তিনি এরপর তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিয়ে আরো বিশদ গবেষণার পর আবিষ্কার করেন যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মিও অনেক দিক থেকে রনজেনের এক্স-রশ্মির সমধর্মী এবং বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম আরো বেশী বিকিরিত প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে .পারে। বেকারেলের তেজস্ক্রিয় রশ্মি অন্যান্য বিজ্ঞানীদেরও আকর্ষণ করে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ তাঁর সহকর্মী পিয়েরে এবং মেরী কুরি আরো দুটো বেশী শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌল পলোনিয়াম এবং রেডিয়াম আবিষ্কার করেন; জে. জে. থমসন বিটা রশ্মি, আর্নেস্ট রাদার ফোর্ড আলোক রশ্মি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ গামা রশ্মি আবিষ্কার করেন, এছাড়া বেকারেল দেখেন যে, ইউরেনিয়াম জাত বিকিরণ তাপমাত্রা পরিবর্তনে আবিষ্কৃত থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। ইউরেনিয়ামের এই ধর্ম ব্যবহার করে আজকের দিনে ভূতত্ত্ববিদরা সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব মাটি প্রভৃতির বয়স নির্ধারণ

করেন। কারণ ইউরেনিয়াম ২৩৮ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত করে সীসা ২৩৮ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরত করে সীসা—২০৬তে পরিণত হয় এবং ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর অর্ধ-জীবনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি বছর অর্থাৎ ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর ৫০% পরমাণু বিভাজিত হয়ে সীসা ২০৬ তে রূপান্তরের সময় কাল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি বছর। এইভাবে কোন জায়গার ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং সীসা—২০৬ এর অনুপাত নির্ধারণ করে তার বয়সকাল পরিমাপ করা যায়।

বেকারেলের এই আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে, যার জন্য তিনি ১৯০৩ সালে পিয়েরে এবং মেরী কুরির সঙ্গে একযোগে নোবেল প্রাইজ পান। এই মহান বিজ্ঞানী ১৯০৮ সালে মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। আজকের দিনে তাঁর পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত করা হয়, এবং শান্তির সময়ে শিল্প, কারখানায়, ওষুধে এবং মৌলিক গবেষণায় এই সমস্ত নানান কাজে ব্যবহৃত হয়।

..........অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫২—১৯৩১)

সমস্ত প্রাকৃতিক রাশি পরিমাপের মাধ্যমে তিনটে—সময়, ভর ও দৈর্ঘ্য, সঠিক পরিমাপের জন্য একটা মানদণ্ডের প্রয়োজন। সেজন্য দৈর্ঘ্যের পরিমাপের জন্য মানদণ্ড হিসেবে ফ্রান্সের প্যারিসের কাছে সেভ্রেসে আন্তর্জাতিক ভর ও দৈর্ঘ্য পরিমাপ সংস্থায় একটা প্ল্যাটিনাম—ইরিডিয়াম দণ্ড, কাচের আধারের ভেতর সযত্নে সংরক্ষিত আছে, যার দৈর্ঘ্য এক মিটার এবং এটাই আন্তর্জাতিক দৈর্ঘ্যের সঠিক পরিমাপ, কিন্তু দেখা গেল যে তাপমাত্রার পরিবর্তনে এই বিশেষ দণ্ডেরও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় অপর কোন মানদণ্ডের। এই সমস্যার সমাধান করে লাল আলোক, রশ্মি, এবং এই অকঠিন পরিমাপ ভিত্তির প্রবর্ত্তন করেন অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন।

অ্যালবার্ট মাইকেলসন ১৮৫২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর জার্মান-পোলিশ সীমান্তে প্রসিয়ার স্ট্রেলনোতে জন্মগ্রহণ করেন। জার্মানীর রাজনৈতিক

বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য ১৮৫৪ সালে তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ছোট বেলাতেই বিজ্ঞানের ওপর তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সতেরো বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল এ্যাকাডেমিতে সদস্য পদের জন্য আবেদন করেন। যদিও তিনি তাঁর সময়কার অন্যান্য নিযুক্ত সদস্যদের সমানই ফল করেন, তবুও তাঁকে প্রথমে নেওয়া হয় না। তখন তিনি এ ব্যাপারে তিন হাজার মাইল দূরে ওয়াশিংটন ডি. সিতে গিয়ে প্রেসিডেণ্টকে বলেন। যদিও তখন দশটা পদই পূরণ হয়ে যায়, তবুও প্রেসিডেণ্ট তাঁর জন্য বিশেষ এগারোতম পদ সৃষ্টি করে তাঁকে ওই পদে নিযুক্ত করেন।

এখানে নৌবাহিনীর সর্বনিম্নপদস্ত সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি আন্নাপোলিসে রসায়ন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান দুইই পড়াতেন। তাছাড়া এই কালেই তিনি আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ের জন্য তাঁর অনেক সূক্ষ যন্ত্রের প্রথমটা নির্মাণ করেন। যার দাম পড়ে মাত্র দশ ডলার, আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে এর পরেও তিনি আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ের জন্য আরও সূক্ষ যন্ত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা করেন; এবং তিনি ১৯০৭ সালে এই একই গবেষণার জন্য পদার্থ-বিদ্যার ওপর নোবেল প্রাইজ পান।

মাইকেলসন এরপর ন্যাভাল একাডেমী থেকে তিন বছরের ছুটি নেন এবং ইউরোপে বিখ্যাত হারম্যান হেলমোহৎসের গবেষণাগারে গবেষণা
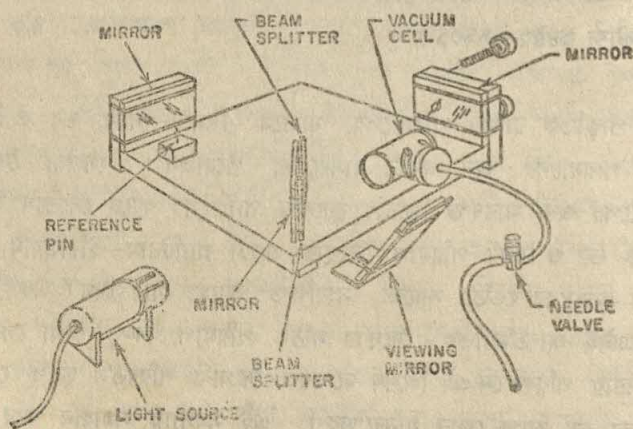
করতে যান। এই সময় তিনি "ইথারের" প্রতি আগ্রহান্বিত হন। ইথার হচ্ছে একপ্রকার কাল্পনিক মাধ্যম যা পৃথিবীর চারিদিকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে যে, কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কি ইথার মাধ্যমও ঘোরে, না এটা স্থির থাকে? এজন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত যন্ত্র

"ইনটারফেরোমিটার" উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব স্বল্প দূরত্ব, যেমন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যা পরিমাপ করা যায়; আবার বিশাল দূরত্ব, যেমন দূরের নক্ষত্র বিটেলগেসের দূরত্ব ২৪০,০০০,০০০ মাইল, তাও নির্ধারণ করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যেই ক্যাডমিয়াম মৌলের বর্ণালীতে উপস্থিত লাল আলোক রেখার মাধ্যমে মিটারের পরিমাপ দণ্ড নির্ণয় করা হয়—দেখা যায় যে, ০·০০০০৬৪৩৮৪৬৯৬ সে.মি. দৈর্ঘ্যে লাল আলোক রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ধ্রুবক। কিন্তু তাঁর প্রথম ইথার সরণ পরীক্ষার ফল খুব একটা সন্তোষজনক হয় না, কারণ তাঁর সংবেদী যন্ত্রগুলো শহরের যানবাহনে আন্দোলিত হয়। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং ক্লীভল্যাণ্ডের কেস স্কুলে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এইখানে এরপর ১৮৮৭ সালে অধ্যাপক এডওয়ার্ড মোরেলের সঙ্গে বিখ্যাত মাইকেলসন মোরেলে পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এই পরীক্ষায় তাঁর "ইনটারফেরোমিটার" যন্ত্রে, পরস্পরের প্রতি সমকোণে আনত দুটো রশ্মিগুচ্ছকে একই দূরত্ব অতিক্রম করান এবং দর্পণে প্রতিফলিত করানোর পর আবার তাদের একই বিন্দুতে নিয়ে আসা হয়। যদি রশ্মিদ্বয় একই সময়ে ঐ বিন্দুতে মিলিত না হয় তাহলে ব্যাভিচার সম্পন্ন আলোকের মত পরবর্তী উজ্জল এবং অন্ধকার ফ্রিন্জস উৎপন্ন হবে। আন্দোলন ও অন্যান্য অসুবিধে দূরীকরণের জন্য, তাঁর ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রটাকে পারদের ওপরে রাখা কতকগুলো পাথরের ওপর স্থাপন করেন, যাতে করে যেকোন দিকে ঘোরান যেতে পারে। বারবার পরীক্ষা করার পরও তাঁরা আলোক রশ্মিদ্বয়ের সময়ের কোনও পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না, ফলে প্রমাণিত হয় যে মহাকাশে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাপেক্ষে ইথারের কোন বেগ নেই। তবুও তিনি মনে প্রাণে ইথারের অস্তিত্বহীনতা অস্বীকার করেন। পরে আইনস্টাইন ইথারের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করেন।

কেস স্কুল থেকে মাইকেলসন ম্যাসাচুস্টেসে উরসেস্টরের ক্লার্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে একই সঙ্গে গবেষণা ও অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৯২ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়ারসন গবেষণা-গারে পরিচালক ও পদার্থবিজ্ঞান শাখার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তাঁর বিজ্ঞানী হিসেবে জগতজোড়া খ্যাতির সুবাদে অনেক স্নাতক ছাত্রই সেখানে গবেষণা করতে যান এবং তারা বিজ্ঞান জগতে অনেক অবদানও রেখে যান: যেমন, নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রবার্ট মিলিকান।

১৯০৫ সালে রবার্ট মিলিকান শিকাগোতে মাইকেলসনের সহকারী

হিসেবে আসেন এবং তখন থেকে স্নাতক গবেষণার এক বিশাল কর্মসূচী রূপায়িত হয়। কারণ মাইকেলসন নিজের গবেষণায়ই নিমগ্ন থাকতেন। অন্য কোন কিছু দেখতেন না, মিলিকান আসলে পরে তাঁর হাতেই সমস্ত ভার অর্পন করেন, মাইকেলসন তাঁর গবেষণাগারের সহকারীদের সঙ্গে খুব কম সময়ই কাটাতেন, প্রতিদিন ৪টে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যেত। এরপর তিনি কোয়াড্রোঙ্গেল ক্লা'ব টেনিস বা বিলিয়ার্ড খেলতে যেতেন অথবা বেহালা বাজিয়ে বা ছবি এঁকে চিত্ত বিনোদন করতেন। মাইকেলসন এ সমস্ত কাজে বেশ দক্ষ ছিলেন; তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞান একধরণের মহত্তম শিল্পকলা।

তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক দিকে তিনি সক্রিয় ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে তিনি আবার যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীতে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এই সময় তিনি নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হন। ফলস্বরূপ তিনি বন্দুকের রেঞ্জ পরিমাপক এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যা পরে আমেরিকান নৌবাহিনীর স্ট্যাডার্ড যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি আবার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় গবেষণায় ফিরে আসেন। ১৯৩১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এখানেই এক সক্রিয় গবেষকের পদে অতিবাহিত করেন।

জীবদ্দশায় তিনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ ছাড়াও, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কপলে পদকও লাভ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তিনটে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সোসাইটির প্রধান পদেও নির্বাচিত হন। উনিশ শতকের শেষার্ধে যে কয়জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মাইকেলসন।

............পল হেরলিখ...

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫৪—১৯১৫)

"The vast members of problems he set himself bear witness to the strength of his imagination. He opened new workd to the unkcown and the world at this hour is his debtor."—N. Y. Times.

কথাগুলো যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি হলেন ১৯০৮ সালের শারীরতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও ভেষজ-বিজ্ঞানের ওপর এলিয়ে মেটস্নিকফের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল প্রাইজ অধিকারী পল হেরলিখ। তিনি মজা করে প্রায়ই বলতেন যে, কাজের সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে "the four G's—Geduld, Geshick, Geld Gliick (অর্থাৎ ধৈর্য্য, দক্ষতা, অর্থ, ভাগ্য)। তবে ধৈর্য্য এবং দক্ষতাই যে কোন মানুষকে কোথায় পেঁছে দিতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ পল হেরলিখের জীবনকাহিনী।

পল হেরলিখ ১৮৫৪ সালে সাইলেসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। এমনিতে এক রসায়ন-শাস্ত্র ছাড়া স্কুলের পাঠ্যক্রমই ছিল যেন তরুণ পলের শত্রু। মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি তাঁর নিজের ফরমুলা অনুযায়ী কাশির ওষুধ তৈরী করেন। ব্রেসলৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রবার্ট কখের অ্যানথ্রাক্স রোগের ওপর বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির করেন যে এরপর তিনি রাসায়নিক গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। সেই অনুযায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি প্রথম জীবন্ত কোষকলার ওপর বিভিন্ন রঞ্জক ও রাসায়নিকের বিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন। এজন্য প্রথমে তিনি বেছে নেন অ্যানিলিন রঞ্জকসমূহ; কারণ এতে সুবিধা এই যে, পশুর দেহে এইগুলোকে ঢুকিয়ে দেবার পর এদের দেখা যায়। বহুদিন পরে এক উৎসবে হেরলিখের বাড়ীওয়ালার মেয়ে বলেন যে, পলের তোয়ালে চিনতে কোনই অসুবিধে হয় না; কারণ তাতে সব সময় লাল, নীল রঞ্জকের দাগ থাকে।

এইভাবে গবেষণা করতে করতে অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি দেখতে পান যে, বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের, বিশেষ কোষকলার প্রতি একটা আসক্তি আছে। প্রত্যেক সংক্রামক রোগের কারণ এক জীবাণু। সেজন্য প্রথমে সঠিক রাসায়নিক যৌগটা যদি নির্ধারণ করা যায় এবং তা যদি

রোগীর ভেতরে প্রবেশ করান যায়। তাহলেই রোগের কারণ জীবাণু মরে যাবে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করবে, এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত "পাশ্ব-শৃঙ্খল থিওরী" আবিষ্কার করেন এবং বলেন যে, রোগীর শরীরে যথাযথ রাসয়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে, তা শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে আক্রমণকারী জীবাণুর সংঘটিত বিষ নির্মূল করে ও ভবিষ্যতে একই রকমের সংক্রমণের বিরুদ্ধে অনাক্রম্য হয়ে ওঠে। তাঁর এই থিওরী পরে অ্যালার্জি ও ইমিউনোলজীর ক্ষেত্রে এবং সালফা ড্রাগস ও পেনিসিলিনের মত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিকাশের ক্ষেত্রেও এক ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে।

তবে এর মধ্যে একটা "কিন্তু" আছে। শুধুমাত্র রোগ হননকারী রাসায়নিক পদার্থ ঠিক করলেই হবে না ; উপরন্তু দেখতে হবে যে সেই পদার্থ যেন জীবন্ত কোষকলার কোনও রকম ক্ষতিসাধন না করে, এর জন্য দরকার প্রচণ্ড ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়।

১৮৮৬ সালে হেরলিখ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। সেজন্য দেড় বছর গবেষণা থেকে দূরে থাকেন। পরে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে আবার গবেষণায় ফিরে আসেন ও হিস্টোলজী (কোষকলা গঠনের আণুবীক্ষণীক পর্য্যবেক্ষণ) ও সাইটোলজি (কোষের কার্য্য, আকার ও প্যাথোলজি) নিয়ে গবেষণা করেন। এই সময় কখের ইনষ্টিটিউটে সংক্রামক রোগের সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোগীর থুথু পরীক্ষা করে কিভাবে রোগ নির্ধারণ করা যায় তা তিনি উদ্ভাবন করেন। ফলে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি প্রথমে বার্লিনের সিরাম গবেষণার ইনষ্টিটিউটের পরিচালক এবং পরে ফ্র্যাংকফুটের পরীক্ষামূলক থেরাপীর ইনষ্টিটিউটের প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

ফ্র্যাংকফুটে এরপর তিনি অ্যান্টিসিরামের পোটেন্সি স্ট্যাণ্ডার্ড করার এক পদ্ধতি বার করেন। বিশেষ ক্ষমতা নির্ধারণ কবার হেরলিখের একক পদ্ধতি আজও ব্যবহৃত হয়। ১৯০৭ সালে তিনি ট্রাইপ্যানোজোমস রোগের প্রতিষেধক "ট্রাইপ্যান রেড" নামে এক রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার করেন।

এরপর তিনি মানবজাতির রোগের আরোগ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। ফলে সিফিলিস রোগের প্রতিষেধক "সালভারসান" আবিষ্কার করেন। এই রোগাক্রান্ত রোগীর স্নায়ুতন্ত্র প্রথমে আক্রান্ত হয়, ফলে পক্ষাঘাত এবং মৃত্যু ঘটে। তিনি এই রোগের জীবাণু "ট্রেপোনেমা প্যালিডাম" মারবার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন। প্রথম প্রথম পরীক্ষায় যদিও এই জীবাণুকে মারতে সক্ষম হন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাভাবিক কোষকলাও ক্ষতি

গ্রস্থ হয়। পরে অনেক গবেষণার পর তিনি এই রোগের প্রতিষেধক হিসেবে এক কৃত্রিম আর্সেনিক যৌগ, ডাই-অ্যামাইনো-ডাই-হাইড্রক্সি-আর্সেনো-বেঞ্জিন, ব্যবসায়ীক নাম "সালভারসান" আবিষ্কার করেন।

অবশেষে মানবজাতির বন্ধু পল হেরলিখ ১৯১৫ সালে মারা যান। তাঁকে জার্মানীর ফ্র্যাংকফুটের ইহুদি সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করা হয়। কিছু বছর পরে হিটলারের নাৎসী বাহিনী তাঁর এই সমাধিস্থল ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু তাহলেও দেশবাসী তাঁর কথা স্মরণে রাখে। সেজন্য পরে আবার এই স্মৃতি তাঁর সাইলেসিয়ার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অবদান এবং তাঁর স্মৃতি কি শুধুমাত্র নাৎসী অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায়!

......স্যার জোসেফ জন থমসন..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫৬—১৯৪০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন ডালটন তাঁর বিখ্যাত "পরমাণুবাদ" আবিষ্কার করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রত্যেক মৌল কতকগুলো অদৃশ্য, অবিভক্ত, সূক্ষ্মতম কণার সমষ্টি। এই কণাগুলোর সৃষ্টিও হয় না বা ধ্বংসও হয় না। পরে বার্জেলিয়াস, গে-লুসাক, অ্যাভোগ্যাড্রো ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের পরিশোধন এবং উন্নতিবিধান করেন। তথাপি প্রায় এক শতক কাল অবধি, ডালটনের পরমাণু যে পদার্থের সূক্ষ্মতম ও অবিভাজ্য কণা তা নির্দ্ধিধায় স্বীকৃতি পেয়ে আসে। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ৩০শে এপ্রিল স্যার জোসেফ জন থমসনের "ঋণাত্মক তড়িৎ-বিশিষ্ট কণা, ইলেকট্রনের" আবিষ্কারে, পরমাণুর অবিভাজ্যতা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। পদার্থের গঠন এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাপিত হয়।

জোসেফ জন থমসন ১৮৫৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ম্যানচেস্টারের কাছে চীথাম হিলে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে, ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্য তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যানচেস্টারের ওয়েনস কলেজে ভর্তি হন। দু-বছর বাদেই তাঁর বাবা মারা যান। ফলে তাঁর পরিবার অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে। তখন তিনি জন ডালটনের স্মৃতিস্বরূপ, সম্প্রতি

ম্যানচেষ্টারবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক স্কলারশিপ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যে, তাঁর কলেজের পড়াশোনা করতে থাকেন। ১৮৭৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রম সমাপ্তে, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে স্কলারশিপ পান এবং সেখানেই গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। ১৮৮০ সালে "ম্যাথামেটিক্যাল ট্রাইপস" নামে এক প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায়, তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ম্যাক্সওয়েলের মত তিনিও অব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর তীক্ষ্ম গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করতেন, তবে পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রত্যেক গাণিতিক সমীকরণ এবং সিদ্ধান্তকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, তিনি পূর্ব প্রচলিত সূত্র, পরমাণু ইথারে আবর্তিত হয়, তার ভ্রান্ততা নির্দেশ করে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পেশ করেন। ফলে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধের জন্য তিনি "এ্যাডামস প্রাইজ" লাভ করেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর এই প্রবন্ধই আইনস্টাইনের জড় ও শক্তি সম্পর্কিত আবিষ্কারের অগ্রদূত ছিল, এবং তখনও পর্যন্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন, প্রোটন, এক্স-রশ্মি এবং স্বাভাবিক বিকিরণ আবিষ্কৃত হয়নি।

১৮৮৪ সালে লর্ড র‍্যালে যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে পরিচালক পদ থেকে অবসর নেন, তখন তিনি পরবর্তী পরিচালক পদের জন্য জোসেফ থমসনকে পছন্দ করেন। ফলে থমসন ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। থমসন এই পদে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর থাকেন এবং পরে তাঁর যোগ্যতম ছাত্র আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এই পদে আসীন হন।

থমসনের অধীনে এই গবেষণাগার জগতের একটা অন্যতম সেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এখানে গবেষণা করতে আসেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রায় আটজন ছাত্র পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ পান। এইখানে আরও একজন স্নাতক ছাত্রী, মিস রোজ প্যাগেট তাঁর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু মিস রোজ প্যাগেট গবেষণা করে পুরস্কার অর্জন করার বদলে, জোসেফ থমসনের স্ত্রী হিসেবে, ১৯৪৭ সালের পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ বিজয়ী সন্তান স্যার জর্জ প্যাগেট থমসনের জন্মদাত্রী হয়ে, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কৃতিত্ব অর্জন করেন।

থমসন এরপর ক্রুকের থিওরীর দিকে মনোনিবেশ করেন। ক্রুকের মতে, ক্যাথোড রশ্মি যেহেতু চুম্বক দ্বারা পথ পরিবর্তন করে সেজন্য এই রশ্মি ক্ষুদ্র, ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান যুক্ত কণার সমষ্টি। কিন্তু ক্যাথোড রশ্মি যদি ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান যুক্ত কণার সমষ্টি হয় তাহলে এই রশ্মি তড়িৎ ও চৌম্বক উভয় ক্ষেত্র দ্বারাই পরিবর্তিত হবে। এই সম্বন্ধে হার্টজ পরীক্ষা করেন, কিন্তু তড়িৎ ক্ষেত্রের বেলায় কোনও রকম পরিবর্তন নির্ধারণ করতে পারে না। থমসন এবার এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন। তিনি প্রথমে ক্রুকের ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে দুটো সমান্তরাল বিপরীত তড়িত ধর্মবিশিষ্ট ধাতব পাত দিয়ে পরীক্ষা করেন, কিন্তু হার্টজের মতো তিনিও ব্যর্থ হন। তবে প্রথমবার তড়িৎ ক্ষেত্রের মুখ ঘুরিয়ে তিনি স্বল্প মাত্রার এক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, কিন্তু তড়িৎক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি করেও তিনি স্থায়ী কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেন না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি ঠিক করেন যে, গ্যাসের কণাগুলো তড়িতাধান বিশিষ্ট আয়নে পরিণত হচ্ছে যখন সেই আয়নগুলো ক্যাথোড রশ্মির গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিপরীত ধর্মী ধাতব পাত্রের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। ফলে ধাতব পাতগুলোর তড়িৎ প্রকাশিত হয়ে, কোন ব্যবহারযোগ্য তড়িত-ক্ষেত্র উৎপাদন হচ্ছে না, এই প্রতিকারের জন্য তিনি ডিসচার্জ টিউব থেকে সমস্ত গ্যাস বার করে তাকে শূন্যস্থানে পরিণত করেন এবং এর পরেই তিনি ক্যাথোড রশ্মির পরিবর্তন করাতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি e/m অনুপাত নির্ধারণ করে ক্যাথোড রশ্মির বেগও নির্ণয় করেন, 'm' হচ্ছে কণার ভর এবং "e" হচ্ছে তার তড়িতাধান, তিনি দেখেন যে e/m অনুপাতের পরিমাণ প্রায় 10^7, যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে e/m অনুপাতের মান 10^4।

এই সমস্ত গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি আবিষ্কার করেন যে: (১) পরমাণু অবিভাজ্য নয়, এর মধ্যে ঋণাত্মক তড়িতাধান যুক্ত কণা থাকে, যেগুলো অতিবেগুনী রশ্মি বা তাপ, তড়িত শক্তি এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন পরমাণুর চাপে অভিমুখ পরিবর্তন করে; (২) এই তড়িৎক কণাগুলোর ভর এবং তড়িতাধান সমান এবং এরা পরমাণুর একটা উপাদান; (৩) এই কণাগুলোর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট ভরের প্রায় ১/১০০০ অংশ।

তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯০৬ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান, ১৯০৮ সালে তিনি তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়, তিনি এই ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে ১৯১৯ সাল অবধি ছিলেন। এই সময়

আরও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর এই সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম আর একটি হল পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত—সম তড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রে ধনাত্মক রশ্মির আবর্তন, পদার্থের পারমানবিক ভরের সমানুপাতিক। এরই ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কালে এফ. ডব্লিউ. অ্যাস্টন "মাস স্পেকটোগ্রাফ" উদ্ভাবন করেন।

ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগার থেকে ১৯১৯ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি ট্রিনিটি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার প্রধান পদে নিযুক্ত হন। এই পদেই, ১৯৪০ সালের ৩০শে আগষ্ট, তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি বহাল ছিলেন। মারা যাবার পর তাঁকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক, ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে, নিউটন, কেলভিন, ডারউইনের মত বিখ্যাত মনীষীর পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

..........ক্রিস্টিয়ান আইকম্যান..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫৮—১৯৩০)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধিও চিকিৎসকরা সকল রোগের মূলে কারণ হিসেবে ব্যাকিটরিয়া বা জীবাণুর কথা বলতেন, কিন্তু আজকে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আজকে আমরা জানি যে, কিছু কিছু রোগের কারণ জীবাণু নয় বরং অপুষ্টি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাব। সেজন্য আধুনিক যুগে সুস্বাস্থ্যর জন্য খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে ভিটামিন বড়ি গ্রহণ করা হয়; চিকিৎসকরা ভিটামিন ওষুধের বিধান দেন; শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও মজবুত রাখতে সরকারী সংস্থাগুলো ভিটামিন পূর্ণ সুষম খাদ্যের উপকারিতার কথা প্রচার করে, আজকের এই আধুনিক ভিটামিনগুলোর আবিষ্কার এবং তাদের উপকারিতায় সম্যক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যিনি এক অসামান্য অবদান রেখে যান, তিনি হলেন ডাচ চিকিৎসক ক্রিস্টিয়ান আইকম্যান।

ক্রিস্টিয়ান ১৮৫৮ সালে নেদারল্যান্ডে অন্তর্গত, জেলডারল্যান্ডের নাইকার্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন উটেখ্যেটের এক ফ্রেঞ্চ স্কুলের পরিচালক, সেজন্য এক শিক্ষিত পরিবেশে, বাবার অধীনে ক্রিস্টিয়ান

শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা। তবে আর্তের সেবার জন্য তিনি চিকিৎসাবৃত্তিই বেছে নেন। সেজন্য ১৮৭৫ সালে ভেষজবিজ্ঞান পড়ার জন্য তিনি আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ডাক্তারী পাশ করার পর তিনি কিছুদিন ফিজিওলজিকাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। এবং পরে সেনাবাহিনীর সার্জেন পদে যোগ দেন।

১৮৮৪ সালে কিশ্চিয়ান সেনাবাহিনীর সার্জেন হয়ে ডাচ অধিকৃত ইষ্ট ইনডিজ দ্বীপপুঞ্জে (ভারতবর্ষ বা তার নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে) আসেন। এখানে তিনি এখানকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন রোগের বিশেষ করে "বেরিবেরি" সম্পর্কে অবগত হন। কিন্তু এইসময় অসুস্থতার জন্য তাঁকে আমস্টারডামে ফিরে আসতে হয়। তবে রোগের কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবগতির জন্য তিনি বিখ্যাত "জীবাণু-শিকারী" রবার্ট কখের অধীনে গবেষণা করতে শুরু করেন, কখের সঙ্গে কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ব্যাক্টিরিয়ালজির ওপর গবেষণা শুরু করেন। একই বছর "বেরিবেরি" রোগের অনুসন্ধানে তিনি সরকারী এক অভিযানে মালয়ে দ্বীপপুঞ্জে যান। কিন্তু যখন সরকারী অভিযাত্রী সদস্যরা অভিযান-উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রেখেই নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসেন. তখন ডাঃ আইকম্যান বাটাভিয়ার প্যাথোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টার হয়ে সেখানেই থেকে যান।

ডাঃ আইকম্যান এখানে অতঃপর বেরিবেরি রোগের আরোগ্য পন্থা খুঁজতে শুরু করেন। বেরিবেরি, সিংহলী একটি কথা 'বেরি' থেকে এসেছে যার অর্থ "দুর্বলতা"। প্রকৃতপক্ষে এইরোগের লক্ষণ, পেশী দুর্বলতা এবং সারা শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা-(এমন কি গায়ে কোন কিছু পড়লে তাদের স্পর্শেই যন্ত্রণাবোধ হয়)। আস্তে আস্তে হাঁটা চলা কম হয়ে যায়, পক্ষাঘাত এবং পরিশেষে মৃত্যু। বেরিবেরি তখন প্রাচ্যে এক আতংক—যার কোন চিকিৎসাই নেই। ডাঃ আইকম্যান এ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা করেন। একদিন তিনি হঠাৎই আবিষ্কার করেন যে, গবেষণার জন্য যে মুরগীর বাচ্চাগুলো রাখা ছিল, তাদের মধ্যে বেরিবেরির মতোই আর এক ধরণের রোগ, পলিনিউরাইটিসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, মুরগীগুলোর খাওয়া দাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন যে তাদের শুধুমাত্র কলে ভানা চাল খাওয়ান হয়েছে। হঠাৎ তাঁর মাথায় বিদ্যুত চমকের মতো একটা পরিকল্পনা এল। তিনি আরও কয়েকটা মুরগীকে শুধুমাত্র কলে ভানা চাল খাওয়ালেন এবং তিনি দেখলেন যে পরীক্ষামূলক মুরগীগুলো সবই

পক্ষাঘাত সমেত, পলিনিউরাইটস রোগে আক্রান্ত হয়েছে—যার প্রায় সমস্ত লক্ষণ বেরিবেরি সদৃশ।

১৯০৭ সালে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি উটেৃঘটে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফিরে এসেই তাঁর গবেষণার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে কলে-ভানা চাল খেয়েই যেমন মুরগীরা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি মানুষও বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়, এবং এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে ঢেঁকিতে ভানা চাল খাওয়া। ১৯১১ সালে ক্যাসিমর ফ্যাংক অবশ্য ভিটামিন কথাটার ব্যবহার করেন এবং দেখান যে কলে ভানা চালে "থায়াসিন" (ভিটামিন বি) অনুপস্থিত থাকে, যা প্রায় প্রত্যেক কাঁচা খাদ্যে, সমস্ত শস্যে, শুওরের মাংসে, এবং অন্যান্য শাক-সব্জীতে থাকে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, বেরিবেরি গবেষণা করে ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান অপুষ্টিজনিত রোগ এবং ভিটামিন গবেষণার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯২৮ সালে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত তিনি নেদারল্যাণ্ডসের উট্রেখট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদেই ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ওপর নোবেল প্রাইজ পান। এর এক বছর বাদেই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর অবদান হিসেবে উপসংহারে শুধু বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বিজ্ঞান জগতে এক নতুন দ্বার, রোগের অপুষ্টি জনিত কারণের উন্মোচন করে গিয়েছেন। তাঁর গবেষণার ফলেই আজকে বিজ্ঞানীরা মানবজাতির সুস্বাস্থ্যর জন্য এক সুষম খাদ্য তালিকা বার করতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া ভিটামিন যে সমস্ত পরিপাক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের (কো-এনজাইম) ভূমিকা নেয়, সেই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও আজকে বিজ্ঞান জগতে তাঁরই অবদানের জন্য জানা গেছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস

(খৃষ্টাব্দ ১৮৫৮—১৯৩৭)

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আজকের বাংলাদেশের ঢাকা জেলার রাড়ীখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ-এ ও বি-এ পাশ করেন; পদার্থবিদ্যা তখন তাঁর বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। বি-এ পাশ করে তিনি লন্ডন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও এ্যানাটমী নিয়ে পড়তে থাকেন।

কিন্তু মেডিকেল কলেজের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সেখান থেকে ন্যাচারাল সায়েন্স বিষয়ে উচ্চ সম্মান ও বৃত্তি (বি-এস-সি) লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালেয়ের বি-এস-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ, এখানেই তাঁর বিজ্ঞান সাধনার সূত্রপাত।

এর অব্যবহিত পরেই ইওরোপে টেসলা, হার্টজ ও এক্স-রশ্মি বিষয়ক গবেষণার ফল প্রচারিত হয়। জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে বসেই ছাত্রদের এক্সপেরিমেণ্ট সহযোগে সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন যন্ত্রাদির অত্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের উদ্যম ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। সামান্য দ্রব্যাদির সাহায্যে বহুমূল্য যন্ত্রের অভাব দূর করবার চেষ্টাতেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ আরম্ভ হয়।

এই প্রাথমিক পরীক্ষার ফলস্বরূপ ১৮৯৫ সালের মে মাসে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে তাঁর বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ক প্রথম মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয় এবং ফলে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর প্রতিভার পরিচিতি হয়। পাশ্চাত্য বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর এই প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে আমন্ত্রিত হয়ে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে লিভারপুল সহরে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ক তাঁর স্বহস্ত নির্মিত যন্ত্র প্রদর্শন করেন। এই যন্ত্র সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক্তি ও গুণ নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালে যাবতীয় বেতার

সংবাদ প্রেরণে যে "কোহিয়ারার" পদ্ধতি প্রচারিত হয়, এই যন্ত্র থেকেই তার প্রথম সূত্রপাত।

১৮৯৯ সালের ৬ই মার্চ, বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে জগদীশচন্দ্রের "On a self-recovering coherer and the study of the cohering action of different metals." নামক গবেষণার সংবাদ ঘোষণা করেন।

এর আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতে "কোহিয়ারার" থিওরী প্রচলিত ছিল। বেতার তরঙ্গ ধরবার জন্য ধারকরূপে (রিসিভার) ধাতুচূর্ণ ব্যবহৃত হোত এবং বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করতেন যে, বেতার-তরঙ্গ আকর্ষণ করে এই ধাতু-চূর্ণগুলো সম্বদ্ধ হয় অর্থাৎ 'কোহিয়ার' করে। এই বিশ্বাসের দরুণ বেতার-টেলিগ্রামের গবেষণা মাঝপথে রুদ্ধ হয়েছিল—বিজ্ঞানীগণ এগুতে পারছিলেন না। জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেন যে, আসলে এর উল্টোটাই হয়ে থাকে। তাঁর এই অভাবনীয় আবিষ্কার বর্তমানে বেতার-বার্তা প্রসারের প্রথম ও প্রধান কারণ, ক্রিস্টাল রিসিভার ও গ্যালেনা রিসিভার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। ১৮৯৪ সালে তিনি "কোহিয়ার" সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং দেখান যে ধাতুচূর্ণগুলো পরস্পর "কোহিয়ার" করে অর্থাৎ সংলগ্ন হয়ে বাধা দূর করে। তিনি ধাতুচূর্ণের পরিবর্তে স্পাইরাল স্প্রিং ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে জি. মার্কনি এই দিকে আকৃষ্ট হয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে কোহিয়ারের সংস্কার করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধারক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি করেন এবং বেতার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। এই সাধনার ফল জগতবাসী আজকে সকলেই ভোগ করছে; কিন্তু এই উন্নতির মূলে সর্বতোভাবে একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর সাধনা লুকিয়ে আছে।

জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী সার জে, জে, থমসনের সম্পাদনায় ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় থমসন লেখেন: "বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ে হার্টজের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হবার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শক্তি ও পূর্ণ বিষয়ক গবেষণা প্রবলভাবে আরম্ভ হয়। বোস কর্তৃক হ্রস্বতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য-সম্বলিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে গবেষকদের সুবিধে হয়েছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি নিজে কোহিয়ারেন্স, পোলারিজেশন, ডবল রিফ্র্যাকসন ও পোলারিজেশনের ক্ষেত্রে রোটেশন সম্পর্কে কার্যকর ফল প্রাপ্ত হন।"

কোহিয়ারের সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে জগদীশচন্দ্র অনুভব করেন যে, চেতন বস্তুর মত জড়েরও অবসাদ আসে। সেই ক্ষেত্রে জড় ও জীবিতের ঐক্য সন্ধানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ছেড়ে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণী-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এইভাবেই তাঁর যাত্রা। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানের সবাক চলচ্চিত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরোক্ষ যোগ আছে। ১৮৯৯ সালে "কোহিয়ারার" বিষয়ে অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর মনে হয়ঃ "It would be interesting to investigate wheather the observed action of electric radiation on a potassium receiver, is in any way analogous to the Photo-electric action of visible light." এই কথাকে সূত্র ধরে বিভিন্ন ধাতুর ফটো-ইলেকট্রিক অ্যাকশন সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে সবাক চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়।

জড়জগত ও জীবজগতের ঐক্য অনুসন্ধানের ফল তিনি ১৯০১ সালের ১০ই মে রয়্যাল ইনষ্টিটিউস অফ গ্রেটব্রিটেনের সমক্ষে জ্ঞাপন করেন। ১৮০২ সালে লিননীয়ান সোসাইটির জার্নালে তাঁর "Electric Response in ordinary plants under mechanical Stimulation." নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। ঐ সালেই তাঁর সুবিখ্যাত বই "জীবিত ও জড়ের স্পন্দন"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পদার্থ বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাণী-বিজ্ঞানের আকর্ষণ অধিক হয়, বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়।

১৯১৭ সালে ৩০শে নভেম্বর তাঁর বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই তিনি দীর্ঘদিনের তপস্যার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন-রহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটিত করতে সক্ষম হন এবং গুরু আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তার ছাত্রদের গড়ে তুলবার কাজে ও তাঁদেরকে বৃহত্তম জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশে সহায়তা করেন। ১৯০২ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান বিষয়ে পনেরোখানি বিখ্যাত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন। জার্মান ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায় এগুলোর কয়েকটির অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে। এই সময়ে তাঁর বহু আবিষ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) রেজনেট রেকর্ডার; (২) ক্রেস্কোগ্রাফ; (৩) ইলেকট্রিক প্রোব।

তিনি এই সময় কয়েকবার পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করে বহু বিখ্যাত

বিজ্ঞান সভায় তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দু-একজন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী প্রথমতঃ তাঁর আবিষ্কারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে অবশ্য তাঁদেরকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের যথার্থতা মেনে নিতে হয়।

তিনি প্রধানত বিজ্ঞানী ছিলেন। বিজ্ঞানের একটা বিশেষ বিভাগে তাঁর অক্লান্ত সাধনা ও সিদ্ধির জন্যই তাঁর খ্যাতি। ১৯৮৭ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯২০ সালে লন্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে বিজ্ঞান জগতের গৌরবে গৌরবান্বিত করেন।

তাঁর জীবন বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দেশপ্রেম প্রভৃতি বহুদিকে বিকাশ লাভ করে। তিনি বৈজ্ঞানিক রূপে, গুরু এবং ঋষিরূপে, কবিরূপে এবং দেশমাতার দীর্ঘতম সেবকরূপে জ্ঞানে, কর্মে, ভক্তিতে নিজের সমগ্র জীবনকে শতদলরূপে বিকশিত করে তোলেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রীতি ছিল। ভারতকে ভারতীয় করবার স্বপ্ন তাঁর ব্রত ছিল। এই কাজে তিনি ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ এবং সাহায্য বরাবর পান এবং উভয়ে ভারতবর্ষের আত্মচেতনা উদ্বোধনের কাজকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র ছেড়ে বৃহত্তরের সন্ধান, বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য আনার প্রচেষ্টাকে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান সাধনার অঙ্গ করে নেন। এই সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষের এবং আজীবন তিনি এই ঐক্যের স্বপ্নই দেখে যান। অবশেষে ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর মৃত্যু এসে তাঁর এই সাধনাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রলাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য এবং এবং প্রাচ্য মনীষীরা নানাভাবে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেন। তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে মহামনীষী আইনস্টাইনের উক্তি: "জগদীশচন্দ্র যে সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন, তার যে কোনটির জন্য তাঁর নামে বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।"

টমাস হান্ট মরগ্যান

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৬—১৯৪৫)

মেণ্ডেলের মুক্ত সঞ্চারণ সূত্র অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো অর্থাৎ সঠিক বলতে গেলে জীনগুলো মায়োসিসের সময় গ্যামেটগুলোর মধ্যে মুক্ত বিন্যাসিত হয়। নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের সংখ্যার তুলনায় জীনের সংখ্যা অত্যাধিক। ড্রসফিলা নামে এক প্রকার মক্ষিকার ক্ষেত্রে চারটি যুগ্ম ক্রোমোজোমে শত শত জীনের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদি সব জীনগুলোই ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে অবস্থান করে তাহলে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম ঐ সমস্ত জীনের কতকগুলোর অধিকারী হবে এবং তারা মুক্ত সঞ্চারিত হবে না। অতএব বোঝা যায় যে, কতকগুলো জীন আদি ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে সর্বদাই অবস্থান করে। জীনের এই প্রচেষ্টাকে লিংকেজ বলে এবং এর দ্বারা সংঘটিত গুণাবলীকে লিংকেজ চরিত্র বলে। এই তথ্য ১৯১০ সালে জীববিজ্ঞানী মরগ্যান আবিষ্কার করেন।

মরগ্যান ১৮৬৬ সালে কেনটাকি প্রদেশের লেক্সিঙ্গটনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জীববিদ্যা সম্পর্কে অধ্যয়না শুরু করেন। ১৮৯০ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং ইটালীর নেপলসে গবেষণা করতে যান। এখানে ১৮৭২ সালে অ্যাণ্টন ডহর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেরিন বায়োলজিক্যাল স্টেসনসে তিনি বিখ্যাত পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ হ্যানস ড্রেইসথের সংস্পর্শে আসেন। যদিও তিনি হ্যানসের সঙ্গে গবেষণা করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তবুও জীবনধারণের জন্য অর্থোপার্জনের ফলে পরের বছরের শেষদিকে ফেলোশিপ পেয়ে আমেরিকাতে ফিরে আসেন।

আমেরিকাতে তিনি ব্রাইন মোরে জীববিদ্যার ফ্যাকালটিতে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এইখানে তিনি এক সুন্দরী ছাত্রী লিলিয়ান স্যাম্পসনের সংস্পর্শে আসেন এবং উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ হন ও পরিণতি স্বরূপ তাঁদের এক সুখী দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়।

এরপর তিনি ১৯০৪ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক প্রাণী-বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই পদ তাঁকে এক অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা এনে দেন এবং গবেষণার জন্য তাঁকে প্রভূত সময় ও সুযোগের ব্যবস্থাও

প্রদান করে। এইখানে তিনি অতঃপর বংশগতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা শুরু করেন। ১৯০৭ সালে ড্রসফিলা নামক একপ্রকার মক্ষিকা নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু হয়। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বংশগতির ক্রোমোজোম থিওরীর পরীক্ষামূলক প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, (১) প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোম অনেকগুলো জীনের জোড়ের লিংকেজ গ্রুপ দ্বারা গঠিত; (২) মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম অনুসারে, ক্রোমোজোম, বা জীনের ক্রসিং ওভার, ক্রোমোজোম জোড়ের একই লিংকেজ গ্রুপের মধ্যেও ঘটতে পারে; (৩) ক্রসিং ওভারের বৈশিষ্ট্য বা একই লিংকেজ গ্রুপের জীনের পুনর্মিলনের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে জীনের আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর আবিষ্কার সংক্ষেপে নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়।

	সাদা চোখ মা	লাল চোখ বাবা
যৌন ক্রোমোজোম :	$X^w X^w$	$X^+ Y$
শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু :	X^w	$X^+ Y$
	$X^w X^+$	$X^w Y$
বংশধর	(লাল চোখ মেয়ে)	(সাদা চোখ ছেলে)

১৯১৫ সালে মরগ্যান ও তাঁর কয়েকজন প্রতিভাবান সহযোগী, ব্রিজেস, স্টারটেভাণ্ট এবং মুলার এক সঙ্গে মিলে "দি মেকানিজম অফ মেণ্ডেলিয়ান হেরিডিটি" প্রকাশ করেন। এই বই জেনেটিকস বিজ্ঞানে এক মূল্যবান তথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এরপর ১৯২৬ সালে মরগ্যানের "দি থিওরী অফ দি জীন" প্রকাশিত হয়। এই বইদ্বয় জেনেটিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়। এই বইদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেন যে, কোষের নিউক্লিয়াসে দৃশ্যমান ক্রোমোজোমের মধ্যেই বংশগতির বাহক—অদৃশ্য কিন্তু জীবন্ত জীনগুলো অবস্থান করে।

বাষট্টি বছর বয়সে তিনি পাসাডেনার ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির আমন্ত্রণে সেখানে চলে যান এবং প্যাসিফিক মেরিন বায়োলজিক্যাল স্টেশন স্থাপিত করেন। অবশেষে এক দুর্ঘটনায় তাঁর এই বিজ্ঞানী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৫ সালে তিনি মারা যান।

মেরী কুরী

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭—১৯৩৪)

১৮৯১ সাল। ওয়ারস থেকে প্যারিসগামী একটা ট্রেনের একটা ফোর্থ ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। ট্রেনের যাত্রীরা সমস্ত কুলি-কামার এবং চাষাভুষোর দল। তাদের ঘাম এবং বিভিন্ন ধরণের খাবারের গন্ধে মিলেমিশে কামরায় এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও আছে চাষা-স্ত্রীলোকের কোলে ক্রন্দনরত শিশুদের বিশ্রী চিৎকার! কিন্তু এই কামরারই এক কোণে সম্পূর্ণ বেমানান পরিস্থিতিতে এক ছোটখাটো, ছিপছিপে, আয়তচক্ষু, সামান্য কোঁকড়ানো চুল সম্পন্না তরুণীকে বসে থাকতে দেখা যায়। অস্থিরভাবে সেই তরুণী বসে বসে একবার এদিক আর একবার ওদিক করছেন। দেখে মনে হবে যেন, ট্রেনের কামরার এই বিশ্রী আবহাওয়ার জন্যই তিনি বুঝি ওরকম করছেন। কিন্তু না! তাঁর এই ছটফটানির কারণ আলাদা। তিনি কতক্ষণে প্যারিসে এসে পৌঁছবেন, তার জন্যই এই অস্থিরতা! সুদীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশী অপেক্ষার পর, তিনি তাঁর লক্ষ্য অভিমুখে চলেছেন। সেজন্য তুচ্ছ এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি। হ্যাঁ। এখন কোন কিছুই তাঁকে তাঁর গন্তব্যপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না! তিনি চোখ বুজে তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। ঠিক এই ভাবেই প্যারিসে এসে মার্জা ক্লোদোৎসকার ভবিষ্যৎ জীবনের সূত্রপাত হয়।

মার্জা ক্লোদোৎসকা, যিনি পরে মেরী কুরি নামে পরিচিত হন, ওয়ারসতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হাইস্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মাও বেশ আকর্ষণীয়া ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং তিনি মেয়েদের একটা প্রাইভেট স্কুল পরিচালনা করতেন। তাঁরা পাঁচ ভাই বোন ছিলেন। সেকালে ওয়ারস জার শাসিত রাশিয়ার অধীনে। যেহেতু জারের অনুমোদনে উচ্চ শিক্ষা রাশিয়ান ভাষায় প্রচলিত ছিল, সেজন্য ক্লোদাৎসকাদের মত স্বদেশপ্রেমিক পোলিস শিক্ষকদের জীবনে বিপদের ঝুঁকিও থাকত, যদি না তারা এই আনুগত্য মেনে নিত। কিন্তু তবুও আপাতভাবে মার্জার বাবা জারের অসন্তোষের শিকার হন। ফলে তাঁদের পরিবারে এক ভীষণ দারিদ্র্যতা নেমে আসে, এই দারিদ্রতার বলি হিসেবে মার্জার মা যক্ষারোগে আক্রান্ত হন এবং মার্জার যখন এগার বছর বয়স, তখন তিনি মারা যান।

ছোটবেলাতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই তিনি পড়তে শেখেন। পড়াশোনার তাঁর এক উল্লেখযোগ্য মনসংযোগ ও দক্ষতার কথা জানতে পারা যায়; এবং তিনি পাঠ্যবই ছাড়া রোমাঞ্চকর গল্প ও টেকনিক্যাল বইপত্র পড়তে ভালোবাসতেন। অতিরিক্ত হিসেবে তিনি বাবা মায়ের কাছ থেকে ফরাসী এবং রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা-লাভ করেন। তিনি যখন হাইস্কুল থেকে পাশ করেন, তখন তাঁর দিদি ব্রোনিয়া ও দাদা যোজিওর মত গোল্ড মেডেল পুরস্কার পান। এই সময় তাঁর বয়স বড়জোর ষোল হবে। সেইকালে তাঁর বাবা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে ছুটিতে তাঁর এক আত্মীয়ের গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন।

এই সময়টা তাঁর জীবনে খুবই সুখের ছিল। তিনি এই সময়টা বনে বনে ঘুরে, ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কেটে এবং নাচগানের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড খুশীতে অতিবাহিত করেন। এই সম্বন্ধে তিনি এক বান্ধবীকে চিঠিতে লেখেন: "I can hardly believe there is any such thing in existence as geometry and algebra......All the young men from Cracow asked me to dance with them.........very handsome boy's.....It was eight o'clock of the morning when we danced the last dance—a white mazurka.

তবে এর অল্প কিছু দিন পরেই তাঁর বাবা যখন তাঁর ভবিষ্যত কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি চটপট করে বলেন যে তিনি প্যারিসে গিয়ে মেডিসিন নিয়ে পড়বেন। কিন্তু তাঁর বাবা এতে মর্মাহত কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিলনা যাতে তিনি কাউকে পড়তে পাঠাতে পারেন। এদিকে তাঁর দিদি ব্রোনিয়াও একই ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন ঠিক করেন যে, ব্রোনিয়া ডাক্তারী পড়তে যাবে এবং তিনি এখানে কাজ করে তাঁর দিদিকে সাহায্য করবেন; পরে দিদি ডাক্তার হয়ে গেলে, দিদি তাঁকে সাহায্য করবেন। সেইমত তাঁর দিদি প্যারিসে চলে যান। মেরী ওয়ারসতে থেকে গেলেন এবং গভর্ণেস হয়ে পড়াতে শুরু করেন। এইরকম পড়াতে পড়াতে একবার তিনি এক পরিবারের বড় ছেলের গভীর প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু সেই পরিবারের অভিভাবকগণ ছেলের গভর্ণেসের সঙ্গে বিয়েতে রাজী হন না। ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি বাবার কাছে ফিরে আসেন এবং পোলিস গুপ্ত কলেজের শিক্ষিকা হিসেবে গণিত, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান পড়াতে থাকেন। অবশেষে ১৮৯১ সালে দিদির আমন্ত্রণে প্যারিসের পথে পা বাড়ান।

প্যারিসে সরবোন কলেজে মেরী স্ক্লোদোৎসকা নামে তিনি ভর্তি হন। এইসময় তাঁর দিদি এক তরুণ ডাক্তারকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের এক সন্তানও হয়। সেজন্য মেরী তাঁদের ওপর বোঝা না বাড়িয়ে প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারের চিলে ঘরে থাকেন। ঘরে তাপ ও জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শীতের সময় ঘর গরম করার জন্য স্টোভ একমুঠো কয়লা জ্বালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এইভাবে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধাকে সর্বক্ষণের সঙ্গী করে কলেজের চার চারটি বছর কাটান। একবার অনাহারে মেরী অজ্ঞান হয়ে গেলে, তাঁর দিদিকে একথা জানান। তাঁর দিদি তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু দিদির ওপর তাঁর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাসস্থান পরিত্যাগ করেন না।

১৮৯৩ সালে মেডিসিনের বদলে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী হয়ে ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৮৯৪ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় গণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর একদিন তিনি তাঁর পোলিশ বন্ধু বিজ্ঞানী কোভালস্কির বাড়ীতে, এক তরুণ প্রতিভাবান পদার্থবিদ পিয়েরে কুরি এই সময় তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে পাইজো তড়িতের (এক ধরণের তড়িৎ যা বিশেষ ধরণের কেলাসের ওপর চাপ প্রয়োগে উৎপন্ন হয়) এবং স্বল্পমাত্রার তড়িৎ-প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য এক ধরণের নতুন যন্ত্র ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন করেছেন। পিয়েরে একজন আদর্শবাদী বিজ্ঞানী। তিনি কোনওরকম পদোন্নতি খুঁজে বেড়াতেন না। তিনি প্রচণ্ড অকৃত্রিম এবং আন্তরিক ছিলেন এবং কোন মহিলার প্রতি আগ্রহ ছিলেন না। তবুও তাঁকে যখন এই সুন্দরী তরুণী মেরীর সঙ্গে পরিচিত করান হয় তখন মেরীকে দেখে পিয়েরের ভাল লাগে। ফলস্বরূপ ১৮৯৫ সালে তিনি মেরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং মেরী তা সাগ্রহে স্বীকার করে নেন, কিন্তু এই বিয়েতেও মেরীর দারিদ্র্যতা দূর হল না, কারণ প্যারিস মিউনিসিপাল স্কুল অফ ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রির শিক্ষক হিসেবে পিয়েরে মাসে মাত্র ষাট ডলার মাইনে পেতেন। ১৮৯৭ সালে ভবিষ্যতের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী কন্যা আইরিন এবং কিছুকাল পরেই তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা ইভ জন্মগ্রহণ করেন।

মেরী গৃহস্থালীর কাজকর্ম ছাড়াও বিজ্ঞানের গবেষণায়ও নিযুক্ত থাকেন, এই সময় ১৮৯৫ সালে রনজেন এক্স-রশ্মি এবং ১৮৯৬ সালে বেকারল ইউরেনিয়াম লবণ থেকে অধুনা গামা রশ্মির মত নির্গত রশ্মি আবিষ্কার করেন। সমস্ত বিজ্ঞান জগত এই নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পিয়েরের সহযোগিতায় মেরীও এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে মনস্থির করেন। পিয়েরের

উদ্ভাবিত তড়িতমাপম যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখতে পান যে, অন্য কোষ মৌলের ওপর বিক্রিয়া বা নির্ভর না করেই, শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম থেকে এই বিকিরণ নির্গত হয়। তিনি এই ধর্মের নামকরণ করেন, "রেডিওঅ্যাকটিভিটি" (তেজস্ক্রিয়তা)। এইবার মেরী পরবর্তী গবেষণার দিকে অগ্রসর হন। তিনি খুঁজতে শুরু করেন যে আর অন্য কোন মৌলের অনুরূপ ধর্ম আছে কিনা।

পিয়েরের মিউনিসিপাল স্কুলে যাঁদের গবেষণার জন্য একটা ভাঙ্গাচোরা ওয়ার্কসপ মনোনীত করে। সেই ছোট, ফাটা-ছাদ বিশিষ্ট চালাঘরে, অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে পিয়েরে এবং মেরী প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে গবেষণায় রত হন। ইতিমধ্যেই মেরির মধ্যে অল্প অল্প যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা গেছে। মেরি এখানে সমস্ত জানা মৌল নিয়ে গবেষণা করে দেখেন, ইউরেনিয়াম ছাড়া থোরিয়ামের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে এই তেজস্ক্রিয়তা আছে। এরপর তিনি সমস্ত প্রাপ্য আকরিক নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। এবং এইভাবে কালো পিচব্লেণ্ডের বেলায় দেখেন যে, তার থেকে ইউরেনিয়ামের মত এক ধরণের উজ্জ্বল রশ্মি নির্গত হচ্ছে, কিন্তু এগুলোর শক্তি ইউরেনিয়ামের থেকেও বেশী। মেরীর কাছে এর অর্থ একটাই—তিনি নতুন এক মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। শুরু হল পিচব্লেণ্ড থেকে নতুন মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা। সুদীর্ঘ চার বছর পিয়েরে এবং মেরী অমানুষিক পরিশ্রম করে পিচব্লেণ্ড থেকে পলোনিয়াম এবং রেডিয়াম নামে দুটো মৌল আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। পলোনিয়াম তাঁর স্বদেশের নামানুকরণে করা হয়। রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা, ইউরেনিয়ামের থেকে প্রায় দেড়লক্ষ শতাংশ বেশী। এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ ১৯০৩ সালে কুরী-দম্পতি, হেনরী বেকারেলের সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পান। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে অসুস্থতার জন্য স্টকহোল্ম গিয়ে তাঁরা স্বশরীরে এই প্রাইজ নিতে পারেন না, খ্যাতি এবং সম্মানের শীর্ষে তাঁরা আরোহন করেন। কিন্তু এতেও তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় না। কথিত আছে যে পিয়েরেকে একবার সরকার "Legion of Honour" দিতে চাইলে তিনি গবেষণার জন্য একটা উপযুক্ত গবেষণারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল মেরীর জীবনে এক বিপর্যয় নেমে আসে। কারণ ওই দিনই অন্যমনস্কভাবে পিয়েরে যখন একটা মিটিং থেকে ফিরছিলেন, তখন এক বিরাট ঘোড়ার গাড়ী তাঁকে ধাক্কা মারে এবং ফলে

তিনি মারা যান। এই ঘটনা তাঁকে দারুণ ভাবে মর্মাহত করে। শোকে দুঃখে তিনি বেশ কয়েক বছর জগতের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

পরে তিনি সম্পূর্ণভাবে অধ্যাপনায় এবং তাঁর মেয়েদের দেখাশোনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন। ১৯১১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজ পান; এইবারে বিশুদ্ধ রেডিয়াম পৃথকীকরণ ও তার পারমাণবিক ভর নির্ধারণের জন্য। তিনিই একমাত্র যিনি দুবার নোবেল প্রাইজ পান। ১৯১২ সালে ফরাসী সরকার "কুরী ইনষ্টিটিউট অফ রেডিয়াম" নামে এক গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেরী সেখানকার প্রধান পদে অভিষিক্ত হন। প্রথম যুদ্ধের সময় তিনি গবেষণাকেন্দ্র ত্যাগ করে হাসপাতালগুলোতে রেডিওলজিক্যাল সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

যুদ্ধ শেষে তিনি আবার গবেষণা কেন্দ্রে ফিরে আসেন। ১৯২১ সালে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং আমেরিকার মহিলাদের দান হিসেবে এক গ্রাম রেডিয়াম তাঁকে উপহার দেন, তিনি কুরী ইনস্টিটিউটের পক্ষে এই উপহার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আর এক গ্রাম রেডিয়াম ১৯২৯ সালে তাঁকে উপহার দেওয়া হয় এবং তিনি তা সদ্য প্রতিষ্ঠিত ওয়ারস'র কুরী ইনস্টিটিউট দান করে দেন।

রেডিয়ামের সংস্পর্শে থাকার জন্য, তার তেজস্ক্রিয়তায় তাঁর শরীরের রক্ত কোষে এক দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মায় এবং ১৯৩৪ সালে ওই ব্যাধিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহামনীষি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যিনি মেরি কুরীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন: "Her strength, her purity of will, her austerity toward herself, her objectivity, her in corruptible judgement all these were of a wind seldom found joined in a single individual...her profound modesty never left any room for complacency..."

রবার্ট আন্ড্রুজ মিলিকান

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৮—১৯৫৩)

ওবার্লিন কলেজের এক দ্বিতীয় বার্ষিক তরুণ ছাত্রকে, তাঁর গ্রীক অধ্যাপক, ওবার্লিন কলেজের প্রিপারেটরী ডিপার্টমেন্টে পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াতে বললে সেই তরুণ ছাত্র বলেন যে তিনি মোটেই পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জানেন না। এর উত্তরে গ্রীক অধ্যাপক বলেন : "You have done excellent work all year in my Greek class ; I'll risk any one who can do what you have done in that subject to teach physics." এর ফলে গ্রীক স্কলার রবার্ট অ্যান্ড্রুজ মিলিকান পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াতে শুরু করেন এবং পরে ভবিষ্যতে তিনি বিজ্ঞান জগতে এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

রবার্ট মিলিকান ১৮৬৮ সালের ২২শে মার্চ, ইলিনয়েসের মরিসনে এক যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রথম জীবন থেকেই তাঁর শিক্ষা ও জীবনধারণের জন্য তাঁকে অর্থোপার্জন করতে হয়। ১৮৭৫ সালে তাঁর পরিবার আইওয়ার মাকুওকেটাতে চলে যান। এখানকার হাইস্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরে ওবারলিনের প্রিপারেটরী স্কুলে এবং ওবারলিনের কলেজে পড়াশোনা করেন। কিন্তু তাঁর এই পড়াশোনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের দিকে তাঁর খুবই কম আগ্রহ দেখা যায়। বস্তুত এই সময়ে গ্রীক ও গণিতেই তাঁর সর্বোত্তম ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রীক অধ্যাপকের কথামত এবং আর্থিক প্রয়োজনের জন্য তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াতে শুরু করেন।

তাঁর প্রথম পদার্থ-বিজ্ঞান ক্লাস নেওয়ার আগে তিনি সারা গ্রীষ্মকাল পদার্থবিদ্যার পাঠ্য বই সম্বন্ধে ভাল করে না বুঝছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। ফলে পরবর্তীকালে তিনি এত ভাল শিক্ষকরূপে পরিগণিত হন যে তিনি বছরে প্রায় দুশো ডলার মাইনেতে নিযুক্ত হন। এর আগে ১৮৯১ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া কলেজ জিমনাসিয়ামের কার্যকরী ডাইরেক্টর পদেও কাজ করেন এবং এইভাবে তাঁর নিজের জীবনধারণ ও তাঁর পাঁচ ভাইবোনের শিক্ষালাভে সহায়তাও করার সুযোগ লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি কলম্বিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিশেষ ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হন। তাঁর অজান্তেই, ওবার্লিনের অধ্যাপকগণ তাঁর সম্বন্ধে এক উচ্চধারণা সম্বলিত সুপারিশ পাঠান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অধীনে গবেষণা করেন। এইখানে তিনি সত্যিকারের পদার্থবিজ্ঞানের ওপর আগ্রহী প্রফেসর মাইকেল পাপিনের সংস্পর্শে আসেন। কলম্বিয়াতে তাঁর ফেলোশিপ যখন আর পুনর্নবীকরণ হল না, তখন তিনি অধ্যাপক পাপিনের পরামর্শমতো তিন হাজার ডলার ঋণ করে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভের জন্য যান। ১৮৯৫ এবং ১৮৯৬ সালে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। ফলতঃ পদার্থবিজ্ঞান বেকারেল, কুরীদম্পতি, রনজেন এবং জে. জে. থমসনের আবিষ্কার সম্পর্কে অবগত হন। এর মধ্যে ১৮৯৪ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় আমেরিকার বিখ্যাত পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ অধ্যাপক অ্যালবার্ট. এ. মাইকেলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিলিকান মাইকেলসনের জ্ঞানের পরিধিতে মুগ্ধ হয়ে যান। ফলে ১৮৯৬ সালে মাইকেলসন তাঁর সহকারী হিসেবে যখন মিলিকানকে আমন্ত্রণ জানান, তখন মিলিকান নির্দ্বিধায় এই আমন্ত্রনে সাড়া দেন। এমনকি এই কাজের জন্য তিনি দ্বিগুণ বেতনের অপর একটা অধ্যাপনার কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দেন।

এই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর জীবনের সর্বোত্তম সাফল্যপূর্ণ পঁচিশটা বছর অতিবাহিত করেন। ১৯১০ সালে তিনি এখানে পুরোপুরি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। শিকাগোতে প্রথম বারোটা বছর তিনি শিক্ষা প্রসার সংক্রান্ত কর্মসূচীতে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তার ফলেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তখনকার সময়ের এক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় শিক্ষামূলক নানান কর্মসূচীতে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি তাঁর গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন না। পরিশেষে, প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি এসে তিনি গবেষণার প্রতি কেন্দ্রীভূত হন। তিনি প্রথম ইলেকট্রনের তড়িতাধান পরিমাপের দিকে নিবদ্ধ হন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত "অয়েল ড্রপ মেথড" দ্বারা প্রায় চার বছর ধরে গবেষণা করে ১৯১২ সালে ইলেকট্রনের তড়িতাধান নির্ণয় করেন। তাঁর নির্ধারিত মান হল—$4{\cdot}807 \times 10^{-10}$ ই, এস, ইউ, (স্থির তড়িৎ একক) $\pm{\cdot}005 \times 10^{-10}$ ই, এস, ইউ তাঁর এই নির্ধারিত সর্বোচ্চ সঠিক মানকে জার্মানীর বিজ্ঞানীগণও পদার্থের পারমানবিক থিওরীর শেষ পরীক্ষামূলক প্রমাণ বলে মেনে নেন।

এরপর ১৯১২ সালে তিনি আইষ্টাইনের ফটোতড়িত সমীকরণের যথার্থতা পরীক্ষামূলক প্রমাণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে অগ্রসর হন। এই পরীক্ষার ফলে তিনি যে শুধু আইনস্টাইনের ফটোতড়িত সমীকরণের যথার্থতা প্রমাণ করেন তা নয়, সেই সঙ্গে এই সমীকরণের ভিত প্ল্যাংকের ধ্রুবক (h) এরও মান নির্ণয়। তাঁর নির্ধারিত মান, $6·57+10^{-21}$ আর্গস, ১৯০০ সালে "কালোবস্তু বিকিরণের" ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্ল্যাংকের মানের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ইলেকট্রনের তড়িতাধানের ওপর গবেষণার জন্য ১৯২৩ সালে তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়।

তবে রবার্ট মিলিকান সম্ভবত বেশী বিখ্যাত তাঁর "কসমিক রশ্মির" গবেষণার জন্য। এই গবেষণা তিনি ১৯১৫ সালে শুরু করেন; মাঝে কিছুদিন বন্ধ করেন, পরে ১৯২৩ সালে যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউটে অফ টেকনোলজির, নরম্যান ব্রিজ ল্যাবরেটরী অফ ফিজিক্সের ডিরেক্টর পদে আসীন হন, তখন আবার শুরু করেন। তিনি বিশেষ বিশেষ ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রও নির্মাণ করেন, যাতে করে পর্বতশীর্ষে এবং তুষারাবৃত লেকের জলেও এই সমস্ত রহস্যময় শক্তিশালী রশ্মির ক্ষমতার পরিমাপ করা যায়; তাঁর মতে, সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলে মৌলের জন্মের ফলে যে বিকিরণ নির্গত হয়, তারই ফলশ্রুতি এই সমস্ত মহাজাগতিক রশ্মিগুলো।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আমেরিকান বিজ্ঞান যে সমসাময়িক পর্যায়ে উন্নীত হয় তার পেছনে মিলিকানের মান অনন্যসাধারণ। তাঁর গবেষণা সমস্ত ছিল প্রথম সারির। শিকাগোর অধ্যাপক হিসেবে তিনি অনেক স্নাতক ছাত্রকে উৎসাহিত ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত করে তোলেন। এছাড়া Cal Tech—এর পরিচালক হয়েও তিনি পরবর্তী বিজ্ঞানীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে যান, যাতে তাঁরা পরবর্তীকালে আমেরিকার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পতাকা সর্বদা ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে পারে।

..........লর্ড অ্যার্নেস্ট রাদারফোর্ড..................................

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭১—১৯৩৭)

১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডে, "The Newer Alchemy" বলে একটা অদ্ভুত নামের বই প্রকাশিত হয়। নামটা শুনে মনে হবে যে, বইটা হয়তো মধ্যযুগের কোন অ্যালকেমিবিদের লেখা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। বইটা সেসময়কার একজন অন্যতম সেরা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানবিদের লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। যদিও প্রবন্ধটার মধ্যে "অ্যালকেমি" নামটা থাকে, তবুও প্রাচীন অ্যালকেমিবিদের সঙ্গে প্রবন্ধকারের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রবন্ধকার কিন্তু প্রাচীন অ্যালকেমিবিদগণের মত লোহা, সীসা এবং অন্যান্য ক্ষার ধাতুকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে সোনায় পরিবর্তিত করতে চান নি। তিনি বরঞ্চ উল্টে প্রকৃতির এক অজানা রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখান যে, প্রকৃতি নিজেই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যালকেমিবিদ্; সৃষ্টির শুরু থেকেই ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম যৌগগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকিরণ নির্গত করে আপনা আপনিই তাদের থেকে লঘু; নতুন মৌল, রেডিয়াম ও পোলোনিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। আবার এই নতুন মৌলগুলো একই প্রক্রিয়ায় পরিশেষে আরো লঘু মৌল সীসায় পরিণত হয়। প্রকৃতির রহস্যের সঠিক সমাধানকারী এই প্রবন্ধকার হচ্ছেন, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ১৮৭১ সালের ৩০শে আগস্ট নিউজিল্যান্ডের, সাউথ আইল্যান্ডের নেলসনে, এক স্কটিশ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার ১৮৪২ সালের প্রথম নিউজিল্যান্ডে আসে এবং আর্নেস্ট তাঁর বাবা মায়ের বারোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। তবে বিজ্ঞান জগতের এটা সৌভাগ্য যে, তাঁর পরিবার শিক্ষার কদর বুঝতেন এবং তারই ফলে বিভিন্ন প্রাইজ ও স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরাজী, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৮৯ সালে নেলসন কলেজের ডিগ্রি পেয়ে, তিনি নিউজিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পান। এখানে দ্বিতীয় বছর থেকেই তাঁর পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দু বছর তিনি, বিদ্যুৎ-চুম্বক বা রেডিও তরঙ্গের ওপর হার্টজের পরীক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে উচ্চ কম্পাঙ্ক সম্পন্ন তাড়িৎ ক্ষরণের দ্বারা লোহার চৌম্বকত্বের ওপরে মৌলিক কিছু গবেষণা করেন। তারই ফলস্বরূপ রেডিও তরঙ্গের, চৌম্বক নির্ধারক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। এই সময় ভাগ্য তাঁর প্রতি সহায় হয়। কারণ সুদূর ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনস্থ কলেজগুলোর শিক্ষানীতির এক তাৎপর্য পূর্ণ পরিবর্তন হয়। আগে নিয়ম ছিল যে, ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীর লাভের তহবিল থেকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান করা হোত। কিন্তু পরে ১৮৯৫ সালে, ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীর কমিশনাররা এই নিয়ম পরিবর্তন করেন। নতুন নিয়মানুযায়ী, স্কলারশিপ প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে দুবছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে হবে। ফলে সেই প্রথমবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য স্নাতক ছাত্ররা প্রবেশ করতে শুরু করল এবং অনুমোদিত গবেষণার সন্তোষজনক সমাপ্তির পর তারা তাদের ডিগ্রি লাভ করতে লাগল। ফলে নতুন নিয়মানুযায়ী ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে প্রথম গবেষক ছাত্রদের মধ্যে রাদারফোর্ডের নামও অনুপ্রবেশ করল।

ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে রাদারফোর্ডের প্রথম কাজ হল, তাঁর বেতার-তরঙ্গ-নির্ধারক যন্ত্রের রেঞ্জ বাড়ানো। তিনি এর মধ্যেই মনে মনে ঠিক করেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে তাঁর নিউজিল্যাণ্ড বাসী প্রেমিকা মেরী নিউটনকে বিয়ে করবেন। কিন্তু ১৮৯৫ সালের শেষ দিকে যখন এক্স-রশ্মির আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর মন থেকে অর্থ উপার্জনের চিন্তা অন্তর্হিত হয় এবং তিনি আরো বেশী করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিজেকে ডুবিয়ে ফেলেন। ফলে জে. জে. থমসন যখন তাঁকে গ্যাসের ওপর এক্স-রশ্মির প্রতিক্রিয়ার গবেষণায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান, রাদারফোর্ড সঙ্গে সঙ্গে সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেন। পরীক্ষাদি হিসেবে রাদারফোর্ডের অক্লান্ত, স্বাভাবিক দক্ষতা এবং থমসনের অসাধারণ চিন্তাধারা ও প্রতিভার ফলস্বরূপ ১৮৯৭ সালে থমসনের "পদার্থের তাড়িৎ প্রকৃতির" আবিষ্কার হয়। এই সময় তিনি রাদারফোর্ডও পৃথক ভাবে বেকারেলের "বিকিরণ" নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার ফলে তিনি দেখতে পান যে, ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত বিকিরণ, এক্স-রশ্মির মতোই, গ্যাসকে আয়োনাইজ করে। এছাড়াও তিনি প্রমাণ করেন যে, ইউরেনিয়াম থেকে বিকিরিত রশ্মির গ্যাসের ক্ষেত্রে ভেদ ক্ষমতা, গ্যাসের ঘনত্বের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।

এরপর ১৮৯৮ সালে, জে. জে. থমসনের কথা মতো তিনি কানাডার মন্ট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের রিসার্চ অধ্যাপকের সদ্য প্রতিষ্ঠিত পদে যোগ দেন। এইখানেই তিনি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। তিনি বেকারেলের বিকিরিত রশ্মির তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে, রশ্মির সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিকিরণের কালে তিন ধরণের রশ্মি নির্গত হয়, (১) উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন কণা যুক্ত বিটা রশ্মি, যা কিনা পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ফলক দ্বারা রোধ করা যায়; (২) ইলেকট্রন বর্জিত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হিলিয়াম পরমাণু যুক্ত আলফা রশ্মি, যা কিনা মোটা কাগজ দ্বারা রোধ করা যায়; (৩) তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন কালে, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এক্স-রশ্মির সমধর্মী গামা রশ্মি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়, এবং থোরিয়াম যৌগের বিকিরণের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। থোরিয়াম যৌগের ওপর দিয়ে এক স্বল্প মাত্রার বায়ুস্রোত যদি প্রবাহিত হয়, তাহলে এর কার্যক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। বেশ কিছুদিন পরে অবশ্য এর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে আসে। রাদারফোর্ড, তাঁর ম্যাকগিলের ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার সহকর্মী আর, বি, ওয়েনসনের সহযোগীতায় এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেন এবং দেখান যে থোরিয়াম থেকে র‍্যাডন নামে এক ধরণের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তেজস্ক্রিয়, কিন্তু রাসায়নগত নিস্ক্রিয় গ্যাস নির্গত হয়।

এরপর তিনি এক প্রতিভাবান রসায়ন-ছাত্র ফ্রেডরিক সডির সহযোগিতায় তেজস্ক্রিয়তার এক সম্পূর্ণ নতুন বৈপ্লবাত্মক মতবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে তিনি ঘোষণা করেন, যে, তেজস্ক্রিয়তা, এক মৌলের থেকে অপর লঘু মৌলে স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর পদ্ধতি। অর্থাৎ, কোন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলফা বা বিটা রে নির্গত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন অপর কোন মৌলে পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে তাঁর এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলেই রাদারফোর্ড রসায়নবিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ পান।

১৯০৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯০৮ সালে তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী হ্যানস গাইগার উভয়ে মিলে, উপ-

পারমাণবিক কণাগুলোর পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারণ ও পরিমাপের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই সময় হ্যানস গাইগার ও রাদারফোর্ডের আর এক সহকারী মার্সডেন পাতলা সোনার পাতের ওপর আলফা কণা নিক্ষেপ করে। তাদের অভিমুখ পরিবর্তনের সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এর আগেই জে, জে, থমসনের এক বিখ্যাত ছাত্র, বিজ্ঞানী সি, টি, আর, উইলসন "Cloud Chamber" উদ্ভাবন করেন ; যার সাহায্যে তড়িতাধানযুক্ত উপ-পারমানবিক কণাগুলোর গতিপথের আলোকচিত্র পাওয়া যায়। গাইগার ও মার্সডেন. এই যন্ত্রের সাহায্যে সোনার পাতের ওপর আলফা কণা নিক্ষেপ করে দেখেন যে, প্রায় সমস্ত কণাগুলোই পাত ভেদ করে বরাবর চলে যাচ্ছে। কিন্তু দু-একটা কণার গতিপথের অভিমুখ একটা বিরাট কোণপরিমাণে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ঘটনা পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত পূর্বের কোন থিওরী দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। এই ঘটনার একমাত্র সম্ভবপর ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, আলফা কণাগুলো ক্ষুদ্র, শক্ত কিছুতে প্রতিহত হচ্ছে। তখন রাদারফোর্ড এই ঘটনার এক সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেন। ১৯১১ সালে তিনি তাঁর "পরমাণু-কেন্দ্রকের" মতবাদ প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন যে, পরমাণুর প্রায় ৯৯% ভর পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত। এই পরমাণুকেন্দ্র ধনাত্মক তড়িতাধান যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু (বর্তমানে যার নাম প্রোটন) দ্বারা গঠিত। এই কেন্দ্রকের চারদিকে সমান ও বিপরীত আধানের (অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িতাধান) এক গোলক রয়েছে। এই সম্বন্ধে তিনি এক গাণিতিক হিসাবও দেন, যার ফলে অদৃশ্য পরমাণু কেন্দ্রক এবং তার চতুর্দিকের বেষ্টনকারী অংশের পরিমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি এক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে "বোর-রাদারফোর্ড" চিত্র পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, রাদারফোর্ড পারমানবিক গবেষণা সাময়িক ভাবে বন্ধ করে ডুবোজাহাজ নির্ধারণ যন্ত্রের নির্মাণের দিকে তাঁর বিশাল প্রতিভাকে চালনা করেন। ফলস্বরূপ নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ খাদ্য জাহাজগুলোর জলের তলায় নিমজ্জ হওয়া থেকে রক্ষা পায় ও গ্রেট ব্রিটেন অনাহার ও আত্মসমর্থন থেকে পরিত্রাণ পায়। যুদ্ধ বন্ধ হবার পর তিনি আবার আলফা কণা ও গ্যাসীয় মৌলের পরমাণু কেন্দ্রকের গবেষণায় ফিরে আসেন। তিনি আলফা কণা দ্বারা হাইড্রোজেন গ্যাসে বিস্ফোরণ করে, জিঙ্ক সালফাইড পর্দার ওপরে এক বিশেষ ধরণের

স্ফুলিঙ্গের অস্তিত্ব দেখতে পান। যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাস বা আলফা কণা কেউই এ ধরণের স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করতে পারে না, অতএব এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন। আলফা কণা ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংঘর্ষের ফলে, ধনাত্মক তড়িতাধান যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টির ফলেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে, তিনি এর নাম দেন প্রোটন। তিনি আলফা কণার দ্বারা আরো অন্যান্য গ্যাসেও বিস্ফোরণ ঘটান। নাইট্রোজেন ছাড়া অন্য কোন গ্যাসে কোন চমকপ্রদ কিছু দেখা যায় না। নাইট্রোজেন গ্যাসেই আগের ধারের মত স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। এছাড়া বিস্ফোরণের পর হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা ক্ষীণ অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কোথা থেকে এই নবজাত পরমাণুগুলো এল? এর একটাই সম্ভবপর উত্তর এবং তা হল নাইট্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রক থেকে। এছাড়া রাদারফোর্ড শুধুমাত্র বিস্ফোরণের পরেই নাইট্রোজেনের মধ্যে অক্সিজেনেরও সন্ধান পান। সুতরাং এর থেকে তিনি সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে, দ্রুতগতি সম্পন্ন আলফা কণা এবং নাইট্রোজেনের পরমাণু কেন্দ্রকের সংঘর্ষের পরিণামে, নাইট্রোজেন পরমাণুগুলো বিভাজ্য হয়ে গেছে। অতএব উৎপন্ন প্রোটন সুনিশ্চিত ভাবে নাইট্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রকের একটা উপাদান। এই ভাবেই প্রথম রাদারফোর্ড সাফল্যের সঙ্গে এক মৌলিক, অন্য মৌলে রূপান্তরিত করেন এবং আধুনিক কালের অ্যালকেমিবিদ হিসেবে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন।

১৯১৯ সালে, স্যার জে, জে, থমসন অবসর গ্রহণ করলে, তিনি ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারের সুযোগ্য পরিচালক পদে মনোনীত হন। বেশ কয়েক বছর এই পদে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন।

বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর স্বদেশ ও বিজ্ঞান জগৎ থেকে, তিনি প্রভূত খ্যাতি ও সুনাম লাভ করেন, স্বদেশে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অবশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেষট্টি বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে তিনি মারা যান। মারা যাবার পর তাঁকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ডারউইন, কেলভিন ও জে, জে, থমসনের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

অ্যালেক্সিস ক্যারেল

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৩—১৯৪৪)

আজকের দিনে মানুষের শরীরে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড, কৃত্রিম কিডনী ইত্যাদি বসানো হচ্ছে। আজ মানুষের শরীরে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতি স্থাপন কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু এর মূলে রয়েছে ১৯৩৫ সালের একটা ঘটনা। সেদিনের সেই ঘটনায় দেখা যায় দুজন বিজ্ঞানী নিবিষ্ট মনে কাচের পাত্র এক বিশেষ দ্রবণে রাখা, তারও কিন্টার বাল্ব দ্বারা তৈরী একটা অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। যন্ত্রটা একটা কৃত্রিম হৃৎপিন্ড এবং সেটা এক কুকুরের অসুস্থ কিডনীকে আস্তে আস্তে আবার তার স্বাভাবিক কর্ম-ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে। এই দুই বিজ্ঞানীর লক্ষ্যই হল, অপারেশান বা মৃত্যুর পরে মানুষের শরীর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করা এবং সেগুলোকে তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্র "যান্ত্রিক হৃৎপিন্ডের" সাহায্যে পুনরায় সক্রিয় করা ও তারপর সেগুলোকে রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা। এই দুই বিজ্ঞানী হলেন—সখের বিজ্ঞানী আমেরিকার রূপকথার বিমান চালক চার্লস লিন্ডবার্গ ও অন্যজন হলেন তাঁর গুরু, পেশাদার বিজ্ঞানী, শল্য-চিকিৎসাবিদ, জীববিদ ও সমাজবিদ অ্যালেক্সিস ক্যারেল।

অ্যালেক্সিস ক্যারেল ১৮৭৩ সালে ফ্রান্স-লেস-লাইয়নের, স্টে শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন রেশম-ব্যবসায়ী। তিনি ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখতেন। ফলে তরুণ ক্যারেল ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে লাইয়নস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করে, সেখানকার ফ্যাকালটিতেই যোগ দেন। কিন্তু লাইয়নসের প্রাদেশিকতা, তাঁর নতুন চিন্তাধারার ওপর ফ্রান্সের জ্ঞানী বৃদ্ধদের সন্দেহ-প্রবণতা এবং সর্বোপরি তাঁর পথে তাঁদের বাধাদান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে, ১৯০৪ সালে তিনি সাগরপাড়ি দিয়ে শিকাগোর হাল ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রবেশ করেন। এখানেই তিনি ধমনীর প্রান্তদ্বয় সেলাই করে একত্রে জুড়ে দিয়ে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ ও প্রতিস্থাপন করে মানবদেহের থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারণের ওপরও এক নতুন আলোকপাত করেন।

এই সময় মেডিকেল রিসার্চের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত রকফেলার ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর সাইমন ফ্লেক্সনার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিভাবান ডাক্তারদের সেখানে আমন্ত্রণ জানান। ইনষ্টিটিউটে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রাচুর্য, সর্বক্ষণের সহকর্মী, প্রাসাদোপম গবেষণাগার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ফলে ১৯০৬ সালে ক্যারেল রকফেলার ইনষ্টিটিউটে যোগ দেন। এখানে তিনি ব্লাড-ভেসেলগুলো সেলাই করে একত্রীকরণের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন; যার ফলে নিরাপদে রক্ত পরিব্যাপ্ত করান এবং শিরা, ধমনী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণস্থাপন করা সম্ভবপর হয়। এই সাফল্যের জন্য ডাঃ ক্যারেল ১৯১২ সালে শরীরবৃত্ত ও ভেষজ বিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

এরপর ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্বদেশ ফ্রান্সে ফিরে আসেন ও সেনাদলে যোগ দেন। এই সময় তাঁর স্ত্রীও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ফরাসী রেড ক্রসের প্রধান নার্সের পদে সেবা করেন। যুদ্ধকালে কোন সেনার যদি সংক্রমণ ক্ষত দেখা যেত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যনোপায় হয়ে তার সেই অঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হোত। এই ঘটনা ক্যারেলকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। ফলে প্রতিকারের জন্য ক্যারেলও তাঁর এক সঙ্গী হেনরী ডাকিন উভয়ে মিলে ক্যারেল ডাকিন অ্যান্টিসেপটিক দ্রবণ নামে এক ধরণে ওষুধ আবিষ্কার করেন; যার ফলে ক্ষতের সংক্রমন নিরাস্ত হয় এবং সম্পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপসারণের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অনেক সেনাই তাদের জীবন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

যুদ্ধ শেষে তিনি আবার রকফেলার ইনষ্টিটিউটে ফিরে আসেন। কিছুকাল পরেই এক সামাজিক ভোজ-সভায় তাঁর সঙ্গে লিণ্ডবার্গের পরিচয় ঘটে। লিণ্ডবার্গ তখন তাঁকে তাঁর বিজ্ঞানের ওপর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। লিণ্ডবার্গের অসামান্য আগ্রহে ক্যারেল মুগ্ধ হয়ে তাঁর গবেষণাগারে লিন্ডবার্গকে আমন্ত্রণ জানান এবং গবেষণাগারের একটা অংশও লিণ্ডবার্গের কাজের জন্য ছেড়ে দেন। ফলে লিণ্ডবার্গ তাঁর ব্যস্ত কর্ম-জীবনে অবসর পেলেই, সোজা এই গবেষণাগারে চলে আসতেন। তাঁদের দুজনের উদ্যোগে অবশেষে ১৯৩৮ সালে, "ulture of organs" নামে বই প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে তাঁরা তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত "কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের" কার্যপ্রণালী বর্ণনা করেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর সমাজবিদ্যার ওপর বেস্ট-সেলার বই, "Man the unkown" প্রকাশিত হয়।

কিছু বিত্তবান লোকের সাহায্যে মানুষের শরীরের বিভিন্ন সমস্যার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি ফ্রান্সে এক গবেষণাগার নির্মাণ করেন। তাঁর অধীনে এখানে মানব-সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হোত, যাতে করে বাস্তব মূল্য সম্মত প্রতিকার নির্ধারণ করা যায়। তিনি ১৯৪৪ সালে প্যারিসে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এই আদর্শ গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

লী ডি ফারেস্ট

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৩—১৯৬১)

১৯৫৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মিলভ্রেড নর্টন "স্যাটারডে রিভিউ" পত্রিকা লেখেন : "Future historians, reflecting on the genesis of the electronic age, may without undue levity conclude that the fortunes of the twentieth century hung by a slender thread of wire. The man who twisted this into a shape that changed the world was a penniless young inventor named Lee De Forest". মন্তব্যটা পড়ে হয়তো মনে হবে যে, অত্যুক্তি করে কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, ডি ফরেস্টের "অডিঅন টিউব" উদ্ভাবনের ফলে,—রেডিও টেলিভিসন ট্রান্সমিসন, আন্তর্জাতিক দূরাভাষ, র‍্যাডার, কম্পিউটার, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, এলিভেটর ও এস্কালেটর, পারমাণবিক সাবমেরিণ, নিয়ন্ত্রিত মিসাইল, মহাকাশ-যান এবং আরো হাজার হাজার ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে। তখন নিশ্চয়ই উপরের উক্তিটার সম্যক উপলব্ধি করা যায়। লী ডি ফরেস্টের আবিষ্কৃত "অডিঅন টিউব", মানব-ইতিহাসে শ্রেষ্ট কুড়িটা আবিষ্কারের অন্যতম আবিষ্কার হিসেবে পরিগণিত। অতএব সন্দেহাতীতভাবে লী ডি ফরেস্টকে আজকের ইলেকট্রনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৃত জনক বলে উল্লেখ করা যায়।

লী ডি ফরেস্ট ১৮৭৩ সালে আইওয়া প্রদেশের কাউন্সিল ব্লাফসে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বড় হন আলবামা প্রদেশের তালাদেগাতে, কারণ তাঁর যাজক-পিতাকে এক নিগ্রো কলেজের পুণর্সংগঠনের জন্য সেখানে পাঠান হয়। এখানে এসে তাঁকে একাকী জীবন যাপন করতে হয়। কারণ

দক্ষিণীয় সাদা চামড়ার লোকেরা ছিল বিরোধীভাবাপন্ন এবং নিগ্রোরাও ইহ্রাংকি পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। ফলে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। কিন্তু এই ঘটনা তাঁকে এক সুফল এনে দেয়। তিনি তাঁর একাকীত্ব দূর করার জন্য বেশীর ভাগ সময়েই বইয়ের প্রতি নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি ইয়েলের শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৮৯৯ সালে সেখানেই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা লাভের পর শিকাগোতে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীতে ডাইনামো ফ্যাক্টরীতে ঢোকেন। এরপরে তিনি নানান ধরণের চাকরী করেন। যেমন টেলিফোন ল্যাবের চাকরী, ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কাজ এবং পরে আরমার ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার চাকরী।

তাঁর প্রথম আবিষ্কার হল মানুষের স্বর প্রেরণের জন্য এক উন্নত মানের "রেসপণ্ডার" উদ্ভাবন। এই প্রেরক যন্ত্র দিয়েই তিনি আমেরিকান ডি ফরেস্ট ওয়ারলেস টেলিগ্রাফী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৪ সালে প্রথম রুশ-জার্মান যুদ্ধের বেতার প্রেস-রিপোর্ট তৈরি করে এক ইতিহাস সূচনা করেন। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সাফল্যের প্রথম সূচনা।

১৯১০ সালে তিনি বিখ্যাত এনরিকো ক্যারুসোর মধুর সুর অবিকল প্রথম রেডিও ব্রডকাস্টের মাধ্যমে শ্রোতাদের মধ্যে প্রচার করেন। এতে ক্যারুসো এই ঐতিহাসিক ঘটনায় অভিভূত হয়ে তাঁকে মদ্যপানের এক প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু ডি ফরেস্ট না ধূমপান করতেন না মদ্যপান করতেন। ফলে তিনি ক্যারুসোর এই আহ্বান বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯০৮ সালে তিনি বিয়ে করেন, মধুচন্দ্রিমা যাপনের উদ্দেশ্য তিনি স্ত্রী নিয়ে প্যারিসে যান। সেখানেও কাজ তাঁর পেছু ছাড়ে না। সেখানেও তিনি আইফেল টাওয়ারের শীর্ষে এক টেলিফোন প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে এরপর জনগণের অনুরোধ গগনচুম্বী অট্টালিকার ছাদে এরিয়েল এবং প্রেক্ষাগৃহে তাঁর ইলেকট্রনিক শব্দ বিবর্ধিত যন্ত্র (মাইক্রোফোন) স্থাপন করেন, এমনকি এই সময় তিনি তাঁর মাইক্রোফোন যন্ত্র মেট্রোপোলিটান অপেরা হাউসেও স্থাপন করেন।

এরপর একের পর এক তাঁর উদ্ভাবনা প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে সার্জিকাল ছুরি, হাই-ফ্রেকোয়েন্সি অকসিলেটর সারকিট, রেডিওটেলিফোন, লাউডস্পীকার, ফটোইলেকট্রিক সেল, সাউন্ডপ্রুফ পিকচার ক্যামেরা, টেলিভিসন ও কালার টেলিভিসনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট লাভ করেন। তাঁর অপর একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল ১৯২৩ সালে

সাউন্ড-অন-ফিল্ম মোশান পিকচার্সের জন্য তাঁর "ফোনোফিল্ম প্রসেস," যা তিনি নিউ ইয়র্কের রিভোলি থিয়েটারে বর্ণনা করেন।

তবে তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল ১৯০৬ সালে "অডিসন টিউব" আবিষ্কার। এই যন্ত্রে একটা পাতলা প্ল্যাটিনাম তারকে (তিনি একে গ্রিড বলে সম্বোধন করেন) বেঁকিয়ে সর্পিল আকারে পরিণত করে তিনি এটাকে ফিলামেন্ট ও প্লেটের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন, এবং তারপরে সমস্ত যন্ত্রটা একটা কাচের বাল্বের মধ্যে আবদ্ধ করা হল।
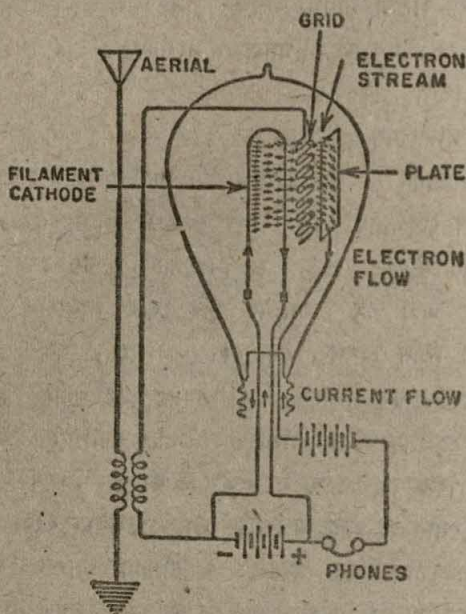
যখন তড়িত প্রবাহ কাথোড ফিলামেন্টের মধ্যে পাঠান হয়, তখন ক্যাথোড ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন নির্গত করে। এই ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণা বিপরীত আধানযুক্ত ধনাত্মক প্লেটের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু মাঝখানে গ্রিডে তড়িতবিভবের পরিবর্তন করে এই ইলেকট্রিক স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কারণ যেহেতু গ্রিড ক্যাথোডের নিকটে অবস্থান করে, সেইহেতু গ্রিডে ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ইলেকট্রন নির্গমন হ্রাস পায় এবং বিপরীতভাবে গ্রিডে ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ইলেকট্রন নির্গমন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে গ্রিডে সামান্য তড়িত বিভবের পরিবর্তন করে, প্লেটে এক বর্ধিত তড়িত বিভব পাওয়া যায় এবং তা লাউডস্পীকার এবং ইয়ারফোনের শব্দ বিবর্ধনের

ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটা নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্ক সম্পন্ন তড়িৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তিনি তাঁর এই বিখ্যাত আবিষ্কারের পেটেন্টস্বরূপ আমেরিকান টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন কোম্পানীর থেকে সে যুগে তিনশ নব্বই হাজার ডলার লাভ করেন। তাঁর এই টিউবের কার্যক্ষমতা এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞান জগতকে তিনি এক অসামান্য সম্পদে পরিপূর্ণ করে যান; বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স জগতে তিনি এক অসাধারণ অবদান রেখে যান। হয়তো তিনি বিজ্ঞান-জগতকে আরো কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে ৮৮ বছর বয়সে, ১৯৬১ সালে, ইহজগত থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করে।

স্যার জেমস হপউড জীনস

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৭=১৯৪৬)

পৃথিবীর বয়স কত? এই তত্ত্ব সঠিক বুঝতে গেলে একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে একটা ডাকটিকিট, একটা পেনির (ব্রিটিশমুদ্রা) সঙ্গে আঠা লাগান হোল। এরপরে Cleopatra's Needle (এক প্রাচীন মিশরীয় স্তম্ভ; উচ্চতা 69½ ফুট) এর ওপর পেনিমুদ্রা আঠা লাগান ডাকটিকিটটা স্থাপন করে, ডাকটিকিটের দিকটা ওপর দিকে রাখা হল। এইবার যদি পুরো স্তম্ভটার উচ্চতা পৃথিবীর বয়স নির্দেশ করে, তাহলে পেনিশুদ্ধ ডাকটিকিটটার বেধ পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাবের সময়কাল সূচিত করে, এবং শুধুমাত্র ডাকটিকিটের বেধই মানব জাতির সভ্যতার কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক এই রকমভাবে, সুস্পষ্ট, পরিষ্কার ছবির মতো করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান অজ্ঞ লোকদের বোঝাতেন, স্যার জেমস জীনস।

জেমস জীনস ১৮৭৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে সেরা সেরা বিদ্যালয়ে ভর্তি করান হয়। সেই সমস্ত বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক ডিগ্রির জন্য কেম্ব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন, ট্রিনিটি কলেজ থেকে ১৮৯৮ সালে গণিতশাস্ত্র নিয়ে এক অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে গণিতের ওপর তিনি স্মিথ প্রাইজ পান। কিন্তু এইসময় যক্ষারোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ সাময়িকভাবে তাঁর উচ্চতর পড়াশোনা বন্ধ থাকে। অবশ্য স্যানিটোরিয়ামে দু'বছরের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন।

• ১৯০৪ সালে জীনস কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকশাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হন। এই বছরেই তিনি গ্যাসের গতিতত্ত্বের ওপর তাঁর "A Dynamical Theory of Gases" প্রকাশিত করেন এবং এর মাধ্যমে আনবিক বেগ সম্পর্কিত ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন।

১৯০৫ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে বহাল থাকেন। এই সময়ের মধ্যেই ১৯০৮ সালে তাঁর "The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism" প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পূর্ব অবদানের জন্য ১৯০৬ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন। এই পদে তিনি পরবর্তী দশ বছর অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ে তিনি বিজ্ঞান জগতের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

১৯১০ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদালয়ের ব্যবহারিক গণিতের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি "বিকিরণ" সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলস্বরূপ তাঁর "Radiation and the Quantum Theory" নামক বই ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়; যার পরবর্তী এক নতুন সংস্করণ আবার ১৯২৪ সালে বের হয়।

১৯১৪ থেকে ১৯২৮ সাল অবধি সুদীর্ঘ চৌদ্দটা বছর তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় অতিবাহিত করেন। এই গবেষণার প্রথমদিকে তিনি সৃষ্টি রহস্যের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর গাণিতিক বিশ্লেষণের দিকে মনোনিবেশ করেন, গবেষণালব্ধ ফল দ্বারা তাঁর ন্যাশপাতি আকারের গঠনের স্থিরতা জানা যায় এবং এছাড়াও তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই সমস্ত বস্তুগুলো এক অসংনম্য ফ্লুইডের মধ্যে ঘুরছে। এই একই গাণিতিক বিশ্লেষণ তিনি নক্ষত্র গতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তিনি গ্রহের সৃষ্টি সম্পর্কে "Tidal Theory"-র প্রচলন করেন এই থিওরী অনুযায়ী, কোনও গতিশীল নক্ষত্র সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময়, অত্যাধিক উত্তপ্ত সূর্য্য থেকে কিছু

অংশ মাধ্যাকর্ষণ টানে বেরিয়ে আসে এবং ঐ অংশই কালক্রমে সৌরজগতের গ্রহগুলোতে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া তিনি বাইনারী ও মাল্টিপল্ নক্ষত্রদের জন্ম সম্বন্ধে বলেন যে, এরা একই বস্তু থেকে "ফিসন" প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইভাবে সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি তাঁর "Tidal Theory" প্রচলন করে, ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ ল্যাপলাসের "নীহারিকা-সংকোচন" ব্যাখা বাতিল বলে প্রমাণিত করেন।

এছাড়া তিনি নক্ষত্রের গতিবেগের ওপর অভিকর্ষজ বলের প্রভাব এবং সর্পিলাকার নীহারিকার ও বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রকৃতি ও সৃষ্টির সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করে। তিনি প্রমাণ করেন যে, সমস্ত নক্ষত্রের গতিশক্তি সমান; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্ররা দ্রুত গতিতে চলে আর বিশাল বিশাল নক্ষত্ররা তাদের তুলনায় আস্তে আস্তে চলে। এ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বই "Cosmogony and Stellar Dynamics" ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি রয়াল ইনস্টিটিউসনের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে এবং ১৯২৩ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট পদে বহাল থাকেন।

১৯২৫ সালের পরে জীনস তাঁর মৌলিক গবেষণা ছেড়ে আপেক্ষিকবাদ, কণা ও তরঙ্গ গতিবিদ্যা, সৃষ্টি-রহস্যের আরো অন্যান্য মতবাদ ও তাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা এবং জনপ্রিয় করার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ কার্য্য তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও অর্থ প্রদান করে। এই সময় তাঁর লেখা "Universe Around us (১৯২৯)," "The Mysterious Universe (১৯৩০)" এবং "The Stars in their Courses (১৯৩১) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং "The New Background of Science (১৯৩৩), Science and Husic (১৯৩৮) ও "Physics an Philosophy (১৯৪২) বইগুলো লেখেন।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, রয়াল ইনস্টিটিউসনের জ্যোতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে থাকা অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক জীনস শুধুমাত্র গণিতবিদ্, জ্যোতিবিদ ও পদার্থবিদ হিসেবেই সুনাম অর্জন করেন নি। এছাড়া তিনি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন, যাঁরা নাকি লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ জগতবাসীর কাছে, বিজ্ঞানের জটিল সমাধানগুলো, সহজ, সরল, প্রাঞ্জল করে পেঁছে দেন যাতে তারা সহজে বুঝতে পারে।

..........লিস মেইটনার..........

(খ্রীষ্টাব্দ (১৮৭৮—   )

ক্ষমতায় আসার পর প্রথম প্রথম জার্মানের নাজী সরকার ইহুদী-বিদ্বেষী আইন খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করত। ফলে অনেক ইহুদীই জার্মানের গবেষণাগারে বিজ্ঞান তথা জার্মানীর অগ্রগতির জন্য গবেষণা করতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সরকারের এই ইহুদী-বিদ্বেষ দাবানলের ন্যায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল। জার্মান সরকার উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট, প্রতিভাবান অপ্রতিভাবান এসব কোন কিছুই বাদ-বিচার না করে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালাতে শুরু করেন। ঠিক এই সময় বার্লিনের কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের নিউক্লীয়ার ফিজিক্সের প্রধান, এক অষ্ট্রিয়াবাসী ইহুদী মহিলা-বিজ্ঞানী, তাঁকে জোর করে গ্রেপ্তার করতে আসার কথা শুনলেন। ফলে কোনওক্রমে একটা ছোট্ট স্যুটকেসে সামান্য কিছু নিয়ে, এক সপ্তাহের ছুটি কাটাবার নাম করে হল্যাণ্ডের ট্রেনে টিকিট কেটে উঠে পড়েন। হল্যাণ্ডে কিছু গুপ্ত এজেণ্টদের সাহায্যে সুইডিস ভিসা নিয়ে স্টকহোল্মে পালিয়ে যান। এইভাবে প্রায় এক চুলের জন্য গেস্টাপো বাহিনীর হাত থেকে গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে যান। গ্রেপ্তারের অর্থ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীজীবন এবং পরিশেষে গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু। তবে তাঁর এই পলায়ন যেমন পশ্চিমী দুনিয়ার পক্ষে একদিকে লাভজনক হল, অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়েরও কারণ হয়। তার চেয়েও বড় কথা অ্যাটম বোমা আবিষ্কার। জগতের কাছে পারমাণবিক শক্তির এক রহস্যের সমাধান হয়। সেদিনের সেই বিজ্ঞানীই হলেন বিখ্যাত লিস মেটনার।

মিস মেইটণার ১৮৭৮ সালে ভিয়েনাবাসী এক আইনবিদের মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একজন উন্নত রুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ফলে তাঁর বাবার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট মানের বই ছিল। মিস মেইটনার স্বাভাবিকভাবেই এই লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়েন। কিন্তু বিজ্ঞানের বইগুলোই তাঁর বেশী ভাল লাগে। তাঁর আদর্শ ছিলেন মেরী কুরি। তিনি মাঝে মধ্যেই নিজেকে গবেষণারত অবস্থায় মেরী কুরির পাশে কল্পনা করতেন।

তখনকার দিনে সমস্ত ছাত্রই বিজ্ঞানীদের অধীনে গবেষণা করতে চাইত। একই মতাবলম্বী মিস মেইটনার বাবাকে রাজী করিয়ে বার্লিনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংকের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। ম্যাক্স প্ল্যাংক এই লাজুক তরুণীর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণ করেন এবং ম্যাক্স প্ল্যাংকের অধীনে তাঁর সৃজনমূলক প্রতিভার দ্রুত বিকাশলাভ ঘটে। এখানে তিনি তাঁর সহকর্মী অটো হানের সঙ্গে মিলে পরমাণুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং একটা নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল "প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম" আবিষ্কার করেন, যা তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের পর "অ্যাক্টিনিয়াম" মৌলে রূপান্তরিত হয়। এরপর তিনি রেডিয়াম ও থোরিয়ামের প্রতি মনোনিবেশ করেন। শীঘ্রই তাঁর গবেষণা গবেষকদের প্রেরণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে ১৯৩০ সালের মধ্যেই সমস্ত বিজ্ঞান-জগত ইউরেনিয়াসের ওপর তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। ১৯৩৪ সালে এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়ামের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি নেপচুনিয়াম নামে নতুন মৌল আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দেয়। জার্মান বিজ্ঞানী আইভা নোভাক বলেন যে ফার্মির সংঘর্ষের ফলে যদি ইউরেনিয়াম মৌল বিভাজ্য হয়, কিন্তু কোন নতুন মৌল উৎপন্ন হয় না। মিস মেইটনারের আদর্শ মেরী কুরির মেয়ে আইরিন জুলিয়েট কুরিও বলেন যে নিউট্রন সংঘর্ষের ফলে নতুন কোন মৌল উৎপন্ন হয় না, বরং জানা কোন মৌলই উৎপন্ন হয়। যাইহোক ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন চলতে থাকে। এই সময় আবার আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র গবেষকদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে কারণ এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পরমাণুর বিভাজনের ফলে এক অবিশ্বাস্য শক্তি ভাণ্ডার উৎপন্ন হতে পারে। জার্মানীতে লিস মেইটনারও একই সমস্যায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মেইটনারের কাছে এই কাজের প্রচণ্ড তাড়া ছিল। কারণ প্রত্যেকদিনই তাঁর প্রিয়, জানা লোকেরা অন্তর্হিত হচ্ছে। এজেণ্টরা গবেষণাগারের আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করছে। তারা কাজ শেষ করার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপে তাঁকে হয়রানি হতে হচ্ছে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে তাঁর অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। এরই মধ্যে তিনি এবং তাঁর দুই সহযোগী হান এবং ফ্রেডরিক স্ট্রাসম্যান মিলে এক অত্যন্ত সংবেদী যন্ত্র "atomic microscope" উদ্ভাবন করেন, যার মধ্যে দিয়ে অত্যধিক সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিক্রিয়াও পর্যবেক্ষণ করা যায় তারপর স্বল্প গতি সম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে

সম্পূর্ণ নতুন মৌল বেরিয়ামের সন্ধান পান। গবেষণার ঠিক এইখানে লিস মেইটনার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্টকহোমে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে কোপেন হেগেনে তাঁর ভাগ্নে অটো ফ্রিসথের কাছে। অটো ফ্রিসথ তখন নীলস বোরের সঙ্গে কাজ করছেন। হানস এবং স্ট্রাসম্যান তাঁর অসমাপ্ত কাজের ওপর আর একটু অগ্রসর হন। তাঁরা এরপর ইউরেনিয়াম ২৩৮কে বিভাজন করে দুটো আইস-টোপ পান। যাদের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রায় ১৪০ ও ৯০। যদিও পরমাণু বিভাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা এর সম্পূর্ণ কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। এই খবর লিস মেইটনারও পেলেন। তিনি এই পরীক্ষাটা আবার করলেন। কিন্তু তিনি যা দেখলেন তা এক ইতিহাস! তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। লেখক উইলিয়াম লরেন্সের কথায়ঃ "She was experiencing Sensation that must have been akin to those of Columbus." ইউরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রক ভেঙ্গে দুটো নিউক্লিয়াসে (বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন) পরিণত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এক প্রচণ্ড নিউক্লিয় শক্তি দুশো হাজার ইলেকট্রন ভোল্টসের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ আইনস্টাইনের থিওরী অনুযায়ী কিছু ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মিস মেইটনারের "নেচার" নামে এক ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জার্নালে, নিউট্রন বিস্ফোরণের ফলে এই পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করেন এবং এই প্রক্রিয়ার নাম দেন 'Fission. সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া জোর কদমে বইছে। সমস্ত জাতির জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন এসে পড়েছে। অত্যাধুনিক এক অস্ত্রের প্রয়োজন। নীলস বোর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থা সম্পর্কে আইনস্টাইন ও ফার্মির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ফলস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে জানান হল এবং অ্যাটম বোমা তৈরির জন্য "Manhattan Project" দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল।

অবশেষে জগতকে স্তম্ভিত করে একদিন হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়ল। লোকে এর আবিষ্কারের পেছনে মেইটনারের অবদানের কথা অবগত হল। ইলিয়ানের রুজভেল্ট ট্রানস আটলাণ্টিক দূরভাষে ১৯৪৫ সালে মিস মেইটনারের সঙ্গে কথা বললেন এবং মেরী কুরির সমপর্যায়ে তাঁকে বিবেচিত করলেন। মিস মেইটনার বিনীত ভাবে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিও বোধ করলেন।

শেষের প্রায় দুশো বছরে কেবলমাত্র দুজন মহিলা সুইস অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সে ফরেন মেম্বারশিপ পদে সম্মানিত হন। এঁদের একজন মেরী কুরি এবং অপরজন মেরী কুরিরই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানী লিস মেইটনার।

............অ্যালবার্ট আইনস্টাইন...... ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৯—১৯৫৫)

১৯১২ সাল। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখের পলিটেকনিক অ্যাকাডেমির বাইরের অফিসে এক তরুণ বিজ্ঞানী শান্তভাবে অপেক্ষা করছেন। শীঘ্রই ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল। অ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট সমেত সমস্ত সদস্য-বৃন্দ তরুণ বিজ্ঞানীকে এক উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। প্রেসিডেণ্ট বিজ্ঞানীকে সম্বোধন করে বললেন যে, যদি তিনি অ্যাকাডেমির অধ্যাপকপদ স্বীকার করেন তাহলে এই পলিটেকনিক অ্যাকাডেমি ধন্য হয়ে যাবে। প্রস্তাবটা আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু এই তরুণ বিজ্ঞানীর মন যদি হঠাৎই অতীতের স্মৃতিতে ফিরে যায় তাহলে তাঁকে দোষারোপ করা উচিৎ হবে না। কারণ এই অ্যাকাডেমিতেই দু' দুবার তাঁর প্রবেশ করার আবেদন না মঞ্জুর হয়ে যায়। যখন ছাত্র হিসেবে ঢোকবার জন্য আবেদন করেন, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার জন্য তাঁর এই আবেদ নামঞ্জুর হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার তিনি যখন গ্র্যাজুয়েট হবার পরে পার্ট-টাইম লেকচারার হবার জন্য আবেদন করেন, তখনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে সেদিন অবস্থা অন্যরকম ছিল। আর এখন তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ; জগৎজোড়া তাঁর খ্যাতি, এবং সম্ভবত সেইজন্যই এই অধ্যাপক পদ! তবে প্রকৃতপক্ষে এই বিজ্ঞানীর এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে চিন্তা করে সময় অপচয় করবার আদৌ কোন অভিপ্রায় নেই। কারণ তুলনামূলক ক্ষুদ্র জীবনে, অনন্ত বিশ্ব রহস্যের সমাধানের চিন্তা করার জন্য প্রভূত সময়ের প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে, ইনিই হচ্ছেন সেই সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন, যাঁরা বিশ্বের গঠনের সঠিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান জগতকে এক অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে মানব-জাতিকে এক অসামান্য অবদান দিয়ে যান। বিজ্ঞান জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তিনজন বিজ্ঞানী হলেন, গ্যালিলিও, স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং সেদিনের সেই তরুণ—মহা মনীষি, জগদ্বিখ্যাত অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জার্মানীর আল্মে, এক জার্মান-ইহুদী শিল্প-পতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিন্দুমাত্র পরিচয়, তাঁর ছোটবেলাতে পাওয়া যায় না। এমনিতে লাজুক আইনস্টাইন ছোট-

বেলায় তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে খুব একটা খেলাধুলো করতেন না। স্কুলেও তিনি খারাপ রেজাল্ট করেন। ভাষা ও অন্যান্য প্রায় সব বিষয় তাঁর পড়তে আদৌ ভাল লাগত না। এছাড়া তো গতানুগতিক পদ্ধতিতে পড়া মুখস্থ করা এবং স্কুলে শিক্ষকের সামনে তা বলা, এতো আছেই, তবে ছোটবেলায় তাঁর মধ্যে একটা জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় এবং তা হল যে, যে জিনিষ তাঁর পছন্দ হোত, তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানার এক প্রবল অনুসন্ধিৎসা। এই রকম মাত্র পাঁচ বছর বয়সে একবার তাঁর বাবার এক কম্পাস তাঁর হাতে আসে এবং যথারীতি এই সম্বন্ধে তিনি, তাঁর বাবা ও কাকাকে নানান ধরণের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। প্রশ্নের উত্তরও তিনি পান। কিন্তু সমস্তই চুম্বকত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কীয়। তবে ওই বয়সেও তিনি উত্তরগুলোর সঠিক অনুধাবনের জন্য অনেক বিনিদ্র রাত্রি কাটান।

এরপর ম্যাক্স ট্যালমি নামে এক মেডিকেল ছাত্র তাঁদের বাড়ীতে আসেন। পৃথিবীর বিজ্ঞান ইতিহাস ম্যাক্স ট্যালমির কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনিই অ্যালবার্টকে ন্যাচারাল সায়েন্স ও গণিতের কিছু বই পড়তে দেন। ফলে অ্যালবার্ট তাঁর সত্যিকারের প্রিয় বিষয় খুঁজে পান। এরপর থেকেই তিনি জ্যামিতি ও গণিতের অন্যান্য ক্ষেত্রের নানান বই কিনে, চেয়ে চিন্তে পড়েন। ফলে গণিত শাস্ত্রের ওপর তিনি এক অপরিসীম জ্ঞানলাভ করেন। এতে ভবিষ্যতে জগতের প্রভূত উপকার হয় কিন্তু সাময়িক ভাবে তাঁর ক্ষতি হয়। কেননা স্কুলের পড়াশোনার ওপর তিনি এক অনাসক্তি বোধ করেন এবং পরিশেষে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। এরপর তিনি চেষ্টা করে দ্বিতীয় বারে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখের পলিটেকনিক অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে ভায়োলিন বাজাতেন এবং কখনো সখনো অপেরাতেও হাজির হতেন।

এর কিছুকাল পরে তাঁর বাবার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়তে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ের দিকে না গিয়ে তিনি অধ্যাপনা করে জীবন ধারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানেও তিনি ব্যর্থ হন; কারণ তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ অধ্যাপনার থেকে গবেষণার দিকেই বেশী নিহিত ছিল। ইতিমধ্যেই তিনি বিয়ে করেন এবং দুই সন্তানের বাবাও হয়ে যান। ফলে পরিবারের দায়-দায়িত্ব বহন করবার জন্য অর্থোপার্জন জরুরী হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি সুইস পেটেণ্ট অফিসে ক্লার্কের একটা চাকরী পেয়ে যান। এই চাকরী যদিও অনেকাংশে ক্লান্তিকর, তবুও ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে, তাঁর নিজস্ব গবেষণা

করতে ও কতিপয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে। এই পেটেণ্ট অফিসে কাজ করতে করতেই ১৯০৫ সালে তাঁর বিখ্যাত "আপেক্ষিক-বাদের" প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সমস্ত জগৎ আইনস্টাইনের প্রতি তার মনঃসংযোগ কেন্দ্রীভূত করে।

আইনস্টাইনের "আপেক্ষিকবাদের" প্রেরণা হচ্ছে, দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইকেলসন ও মোরলের এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তাঁরা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ বরাবর আলোক রশ্মির ভ্রমণকালে, আলোকের বেগ বৃদ্ধির পরিমাপ করেন। কিন্তু তাঁরা বেগের কোনরকম বৃদ্ধি পরিমাপ করতে ব্যর্থ হন। আইনস্টাইন এই পরীক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁদের ব্যর্থতার কারণ, আলোকের বেগের কোন রকম বৃদ্ধি হয় না; আলোকের বেগই হচ্ছে একমাত্র রাশি যা সর্বদা সমান থাকে। তিনি বলেন যে, আলোকের বেগ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক; বিশ্বের সমস্ত কিছুই অনবরত গতিশীল অবস্থায় আছে, সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনই হোক, বা বিশাল বিশাল গ্রহ, নক্ষত্রই হোক। আপেক্ষিকতার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক—একটা পাঁচ ফুট উঁচু লোক বেশ লম্বা; আবার একই লোক, আধুনিক এক পেশাদারী বাস্কেটবল খেলোয়াড় দলের কাছে বেঁটে। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার এই ধারণাকেই বিজ্ঞান জগতের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে প্রয়োগ করেন। যেমন, রেলওয়ে ক্রসিং পার হবার সময়ে, কারোর দিকে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে আসা ট্রেন যথার্থই এক ভীষণ গতিতে ছুটছে। কিন্তু ঐ একই ব্যক্তি যদি চাঁদের থেকে দূরবীণ দিয়ে পৃথিবীর বুকে একই ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যাওয়া ট্রেনকে দেখে, তাহলে তার কাছে তখন মনে হবে যে ট্রেনটা খুবই আস্তে যাচ্ছে। এর কারণ পৃথিবী ও চাঁদের গতিবেগের তুলনায় ট্রেনের গতিবেগ নিতান্তই নগণ্য। নিউটনের কাছে, সময় একটা ধ্রুবক রাশি যার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু আইনস্টাইন প্রমাণ করেন যে, সময়ও এক পরিবর্তনশীল রাশি। ফলে তিনটে ডাইমেনসনের সঙ্গে, একটা চতুর্থ ডাইমেনসন যুক্ত হয়। তিনি বলেন, সময়ও গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল। আলোকের গতিবেগের যত কাছে যাওয়া যায়, ততই সময় ধীর গতিতে চলে। সাধারণ ভাবে কারোর কাছে সময় পরিবর্তিত হয়, তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। যেমনঃ বৃহস্পতি গ্রহের একটা বছর, পৃথিবীর একটা বছরের থেকে অনেক বেশী দীর্ঘ; কারণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর থেকে বৃহস্পতির সময় লাগে বেশী। আইনস্টাইনের থিওরীর আর এক অংশ, গতিশীল

বস্তুর দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন হয়। বিস্তৃত ভাবে কোনও বস্তু যত আলোকের বেগের নিকটতর হবে, ততই তার দৈর্ঘ্য হ্রস্বতর হতে থাকবে। আর এর ঠিক উল্টোটা হবে বস্তুর ভরের বেলায়। অর্থাৎ কোনও বস্তুর বেগ যত আলোকের বেগের কাছাকাছি পেঁছিবে, তত তার ভর বৃহত থেকে বৃহত্তর হতে থাকবে।

আইনস্টাইনের এই থিওরীর সমস্ত উপাদানই, যুক্তি ও জটিল গাণিতিক ফরমুলার সমষ্টি; যার ভিত হচ্ছে শুধুমাত্র অব্যবহারিক গণিত। তবুও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি সকলের প্রভূত বিকাশ সাধনের পর তাঁর থিওরী যখন ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষামূলক যাচাই করা হয়, তখন জগৎ মুগ্ধ হয়ে তাঁর থিওরীর যথার্থতা পর্যবেক্ষণ করে।

প্রথম অনুবাদের দশ বছর বাদে ১৯১৫ সালে "আপেক্ষিকবাদের" ওপর তাঁর দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি মাধ্যাকর্ষণ বলের এক নতুন ধারণার উপস্থাপন করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তার ভরের সমানুপাতিক এক বল অন্তর্নিহিত থাকে এবং এই বলই অপর সমস্ত বস্তুকে তার দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুর এই আকর্ষণ বলের জন্যই বিশ্বে বক্রতার সৃষ্টি হয়েছে এবং মহাজাগতিক বস্তুগুলোর কক্ষপথের পরিবর্তন হয়। এই থিওরীর মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেন যে, দুটো বিন্দুর মধ্যেকার ন্যূনতম দূরত্ব একটা বক্র রেখা। এছাড়া তাঁর এই দ্বিতীয় অনুবাদে, তাঁর বিখ্যাত "পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক আভ্যান্তরীণ সম্পর্ক"ও প্রকাশিত হয়। তিনি দেখান যে, জড়ও শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। জড় ও শক্তির সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি হল, $E=mc^2$; যেখানে "E" মানে বস্তুর কোন কণার শক্তি, "m" অর্থ কণার ভর এবং "c^2" হল আলোকের গতিবেগের (c=1,86,000 মাইল/সেকেণ্ড) বর্গ, এইভাবে ক্ষুদ্র এক কণার থেকে কি বিশাল শক্তি পাওয়া সম্ভব! ফলে সূর্য্যের অপরমিত শক্তিভাণ্ডারের রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে আইনস্টাইন তাঁর "আপেক্ষিকবাদ ও শক্তিতত্বের" যাচাই-করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এইসময় তিনি আরও একটি বিখ্যাত আবিষ্কার—"ফটো তড়িৎ বিক্রিয়া," সম্পন্ন করেন, আধুনিক ইলেকট্রনিকসের ভিত, "ফটোতড়িত বিক্রিয়া" আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেন যে, কিভাবে এবং কেন কোন বিশেষ ধাতুর ওপরে আলোক পতিত হলে, তার

থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যই ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানের ওপর তিনি নোবেল প্রাইজ পান।

এই সমস্ত অপরিমিত সাফল্যের মধ্যে তাঁর কর্মজীবনেও নানান পরিবর্তন আসে। ১৯১০ সালে তিনি প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে যোগ দেন। এরপর ১৯১২ সালে জুরিখের পলিটেকনিক অ্যাকাডেমির অধ্যাপক পদে এবং ১৯১৪ সালে "প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে-র অধ্যাপক পদে যোগ দেন। শেষোক্ত অ্যাকাডেমিতে প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি গবেষণায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থা বেশ অসুবিধেজনক হয়ে পড়ে। কলেজ জীবনে সুইস নাগরিক এবং সর্বোপরি যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী হওয়ার জন্য, তিনি জার্মান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরকম সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। ফলে বেশ কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন জার্মানীর শত্রু বলে পরিগণিত হন। তিনি তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে বলেন: "This war is a vicious and savage crime. I would be hacked to pieces than take part in such an abominable business". যুদ্ধকালে তিনি ইহুদীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং প্যালেস্টাইনে তাদের হোমল্যাণ্ডের আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

ক্রমে ক্রমে জার্মানীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ১৯৩২ সালে, যখন আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে রত, তখন হিটলার জার্মানীর ক্ষমতা হস্তগত করেন। আইস্টাইন জার্মান বিজ্ঞানীগণের সাহায্যে পৃথিবী জয় করবার এক অশুভ জাতিগত ও রাজনৈতিকগত নীতি আঁচ করলেন। ফলে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদে ইস্তফা দিলেন। কথিত আছে যে এতে নাকি হিটলার তাঁর মাথার জন্য মূল্য ধার্য্য করেন। আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রেই, নিউ জার্সীর প্রিন্সটনের উচ্চতর গবেষণার ইনস্টিটিউটে ফ্যাকালটি পদে যোগ দেন।

১৯৩৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে, বহুবিখ্যাত বিজ্ঞানীর অনুরোধে, শান্তিকামি হওয়া সত্বেও, তিনি অ্যাটম বোমার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা নির্দেশ করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ফলস্বরূপ, বিধ্বংসী অ্যাটম বোমার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তে, তাঁকে বিশ্ব-শান্তির এক ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ সমর্থক রূপে পাওয়া যায়। বিশ্ব-শান্তির জন্য তিনি নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-সরকার গঠনের কথা বলেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মানুষ হিসেবেও একজন খাঁটি লোকে ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড মানবদরদী ছিলেন। মানুষের দুঃখ দুর্দশায় তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠত। পৃথিবী ভ্রমণ কালে তিনি বিভিন্ন দেশের জনগণের দারিদ্র্যতা এবং অবনতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি মানুষেকে প্রচণ্ড মর্যাদা করতেন। এমন কি, মানুষের দ্বারা চালিত রিক্সাগাড়ীতে উঠতে পর্যন্ত তিনি অস্বীকার করতেন। এইরকম একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। বেলজিয়ামের রানী আইনস্টাইনকে একবার আমন্ত্রণ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে গাড়ী নিয়ে সমস্ত কর্মচারীর দল অপেক্ষা করতে থাকে। আর এদিকে তিনি ট্রেন থেকে নেমে, একটা ছোট ব্যাগ ও তাঁর ভায়োলিন নিয়ে সোজা পায়ে হেঁটে প্রাসাদের দিকে রওনা হন। মোটামুটি, সাধারণ পোশাকে তাঁকে রাজপ্রাসাদের কেউই চিনতে পারে না। পরে রানী স্বয়ং এসে তাঁকে বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি দেন। তখন রানী তাঁকে গাড়ী করে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি জবাবে বলেন ঃ "It was a very pleasant walk, Majesty".

অতবড় একজন বিজ্ঞানী হলেও তাঁর চালচলন, আচার ব্যবহার নিতান্তই সাধারণের মত। তিনি অবসর সময়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খোশ গল্প করে, তাদের শিশুদের সম্পর্কে নানান খবরাখবর নিতেন। তাঁর পোশাক বলতে (একত্র সংলগ্ন জামা ও হাঁটু পর্যন্ত ইজের) ও একটা পুরোনো সোয়েটার আর মুখে একটা স্মোকিং পাইপ।

এই মানবদরদী প্রতিভাবান, বিজ্ঞানী, মহামনীষি, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯৫৫ সালে দেহরক্ষা করেন। তিনি যে বিশাল অবদান রেখে গেছেন এবং তাঁর প্রতিভা যে কত সুদূরে প্রসারিত তা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, আইনস্টাইনকে উপলব্ধি করার জন্য, দ্বিতীয় এক আইনস্টাইনের প্রয়োজন।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১—১৯৫৫)

বিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগেই চিকিৎসা জগত জানতে পারে যে, অনেক রোগেরই মূলে রয়েছে জীবন্ত মাইক্রোব। জেনার, পাস্তুর, কখ, হেরলিখ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কল্যাণে তখনকার ডাক্তাররা এই সমস্ত জীবাণু ঘটিত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে-টীকা ব্যবস্থার কথা অবগত হন। পরে ডাঃ লিস্টারের প্রচলিত অ্যান্টিসেপ্টিকের সঙ্গেও পরিচিত হন। কিন্তু তবুও একটা বাধা থেকে যায়। দেখা যায় যে প্রতিষেধক রূপে ব্যবহৃত অ্যান্টি-সেপ্টিক, যেমন কার্বলিক অ্যাসিড, যদিও জীবাণু বিনাশ করে, সেই সঙ্গে কোষকলারও ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং প্রয়োজন হল এমন প্রতিষেধকের, যা জীবাণু ধ্বংস করবে কিন্তু কোষকলার কোনওরূপ ক্ষতিসাধন করবে না। স্বভাবতই এই কাজে পৃথিবীর চিকিৎসা জগতের প্রতিভাবানের দল কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। বিজ্ঞান জগতে কষ্টকল্পিত ঘটনা হামেশাই ঘটে। তা নাহলে, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, ১৯০০ সালে যিনি ইংল্যাণ্ডে এক শিপিং ক্লার্কের পদে চাকুরীরত, যাঁর কাছে বিজ্ঞানী হওয়া সুদূরের এক স্বপ্ন, তিনিই এই সমস্যার সমাধান করেন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ "পেনিসিলিন" আবিষ্কার করেন।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, আয়ারশায়ারে, ১৮৮১ সালের ৬ই আগষ্ট, এক স্কটিশ কৃষক পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। হাইস্কুল পাশ করবার পরে তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য ষোল বছর বয়সে তিনি লণ্ডনে এক শিপিং ক্লার্কের চাকরী নেন। এরপর ১৯০১ সালে উত্তরাধিকার সূত্রে যখন কিছু সম্পত্তি লাভ করেন, তখন চাকরী ছেড়ে দিয়ে, তাঁর এক ডাক্তার দাদার উপদেশ মতো মেডিসিন নিয়ে পড়তে শুরু করেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে, রাইফেল চালান, সাঁতার, ওয়াটারপোলো খেলায়ও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি ছবি আঁকাতেও তার বেশ ভাল হাত ছিল। ১৯০৬ সালে তিনি মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করেন। পড়াশোনায় তাঁর ভালো রেকর্ডের জন্য, অধ্যাপক আল্মরথ রাইট এই সময় তাঁকে তাঁর সঙ্গে ব্যাক্টিরিওলজিকাল গবেষণার জন্য আহ্বান জানান।

ফলে রাইট এবং ফ্লেমিং দুজনে মিলে সেণ্ট মেরী হাসপাতালে তাঁদের গবেষণা শুরু করেন। তখনকার দিনে এটা জানা ছিল যে, রক্তের একটা উপাদান হচ্ছে শ্বেতকণিকা এবং রক্তে অনুপ্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু এই সমস্ত শ্বেতকণিকাগুলোর দ্বারা ভক্ষিত হয় ও রক্ত জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া শ্বেতকণিকা এ্যাণ্টিবডি উৎপন্ন করতেও সাহায্য করে। সেজন্য তাঁরা জীবাণুদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক সংগ্রামকারী এই সমস্ত শ্বেত কণাগুলোর শক্তি-বৃদ্ধি-সহায়ক রাসয়নিকের সন্ধান শুরু করেন।

আট বছর ধরে গবেষণা করেও তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন না। এর পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এসে যায়। রাইট এবং ফ্লেমিং উভয়েই সেনাবাহিনীর সেবায় নিযুক্ত হন। এখানে এসেও তিনি দেখতে পান যে, সেনাবাহিনীর ডাক্তাররা সংক্রমণের প্রতিষেধক হিসেবে রাসায়নিক, যথা, কার্বলিক অ্যাসিড ও আয়োডিন ব্যবহার করছে। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রোগের প্রতিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে রোগের বিরুদ্ধে শরীরে স্বাভাবিক সংগ্রামী, শ্বেতকণিকাগুলোর সাহায্য করা এবং তাদের শক্তিশালী করা।

১৯২২ সালে তিনি প্রথম আংশিক সাফল্যের মুখোমুখি হন। কারণ এই সময় তিনি আবিষ্কার করেন যে, স্বাভাবিক দেহনিঃসৃত রসের, যেমনঃ লালা, চোখের জল প্রভৃতির অপকারী জীবাণু বিনাশের ক্ষমতা আছে। তিনি এই সমস্ত নিঃসৃত রসের মধ্যে উপস্থিত বীজাণু-নাশক পদার্থের নাম দেন "লাইসোজাইম" এবং তার এই আবিষ্কার, "On a Remarkable Bacteriolytic Element Found in Tissues and secretions" নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কাছে পেশ করেন। তাঁর এই আবিষ্কার যদিও তাঁর জীবাণু-সম্পর্কিত মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তবুও জীবাণু-বিনাশে তাঁকে আংশিক সাফল্য দান করে; কেননা তিনি এইসব "এনজাইমকে" বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথকও করতে পারেন না বা শক্তিশালী প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণ তৈরিও করতে পারেন না।

১৯২৮ সাল তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাক্টিরিয়লজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। একই সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পেনিসিলিয়াম নোটেটাম প্রজাতি নিঃসৃত বীজঘ্ন ঔষধ, পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। একদিন লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হাসপাতালের গবেষণাগারে ব্রণ ও ফোড়ার বীজাণু (ব্যাকটিরিয়া—স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস) নিয়ে গবেষণাকালে দেখেন যে কতকগুলো সবুজ ছত্রাক জন্মানোতে অনুশীলন পাত্রের বীজাণু ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি ছত্রাক-

নিঃসৃত রসেরও বীজাণু ধ্বংসের ক্ষমতা বর্তমান। তিনি ঐ ছত্রাককে পেনিসিলিয়াম বলে চিহ্নিত করেন এবং বীজাণু-বিধ্বংসী রসের নাম দেন পেনিসিলিন। ১৯৪১ সালে এইচ. ডব্লু. ফ্লোরি এবং ই. বি. চিন নামে দুজন ব্রিটিশ রসায়নবিদ্ তাঁর আবিষ্কারের পথ অনুসরণ করে পেনিসিলিন ছত্রাকের বিশুদ্ধ রস মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে এর বীজঘ্ন বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন। ফলে ১৯৪৫ সালে এই তিন বিজ্ঞানী, এই বিখ্যাত আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

ব্যবহারিক জীবনে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক স্থানেই তিনি তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও নম্রতা দিয়ে মানুষের মন জয় করে নেন। দেশে ফিরে এসে তিনি আবার সেণ্ট মেরী হাসপাতালে তাঁর ব্যাকটেরিও-লজিক্যাল গবেষণায় মন দেন এবং অবশেষে ১৯৫৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

তবে তিনি যে রোগ প্রতিকারের জন্য বীজাণু নাশক অ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রবর্তন করেন তা তাঁকে মানব-ইতিহাসে অমর করে রাখে।

ইরভিং ল্যাঙ্গমুর

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১—১৯৫৭)

মহান বিজ্ঞানীগণের সাফল্যের অন্তরালে প্রায়শই কারোর না কারোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান নিহিত থাকে। যেমন. মাইকেল ফ্যারাডের বেলায় স্যার হামফ্রি ডেভির নাম উল্লেখযোগ্য ; ঠিক তেমনই নিউইয়র্কের, ব্রুকলিনবাসী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইরভিং ল্যাঙ্গমুরের ক্ষেত্রে, তাঁর দাদা আর্থারের প্রেরণা ও সাহায্য সমান ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এগারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ব্রুকলিনের পাবলিক স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর বাবার এক ব্যবসায়ীক কাজের জন্যে তাঁদের পরিবার প্যারিসে চলে যান। ফলে ইরভিংও ব্রুকলিন ছেড়ে প্যারিসের ফ্রেঞ্চ বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হন। প্রায় তিন বছর পর আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে প্রথমে ফিলাডেলফিয়ার স্কুলে এবং পরে ব্রুকলিনের প্রাতঃ ইনস্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। প্রাতে শিক্ষাকালীন সময়ে, তিনি তাঁর দাদা আর্থারের

সঙ্গেই সেখানে থাকতেন। তাঁর রসায়নবিদ্ দাদা তখন সেই ইনস্টিটিউটের একজন ইনস্ট্রাক্টর। ফলে সেই পরিবেশে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের ওপর এক অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। এছাড়া মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই তিনি ক্যালকুলাসও করায়ত্ত করেন। এরপর ১৮৯৯ সালে তিনি কলম্বিয়া কলেজেস স্কুল অফ মাইনসে, ধাতুবিদ্যা নিয়ে পড়াতে শুরু করেন এবং এই সম্বন্ধে পরে আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মানীর গটিঞ্জেনেও যান। গটিঞ্জেন থেকে সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এসে স্বদেশে তিনি চাকরীর অনেক লোভনীয় প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি নিউ জার্সির স্টিভেন্স টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন যাতে স্বাধীন ভাবে গবেষণার জন্য সময় ব্যয় করতে পারেন।

বিজ্ঞান জগতে তাঁর অবদান বা তাঁর সৃজনমূলক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রথম কীর্তি স্থাপিত হয় ১৯০৯ সালে। এই বছরেই গরমের ছুটিতে তিনি নিউ ইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর সদ্য প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ ল্যাবরেটারীতে ছুটি কাটানোর এক প্রস্তাব আগ্রহে স্বীকার করেন। এখানে তিনি ইনক্যান্ডেসেন্ট বাল্বের ফিলামেন্ট রূপে ব্যবহৃত টাংস্টেন তারের প্রতি মনোযোগী হন। এই সময় দেখা যেত যে, বাল্বের মধ্যে এক অজানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে টাংস্টেন তারগুলো খুব অল্পকালের ভেতরেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। গবেষণার পর এর কারণ হিসেবে জানা গেল যে, বাল্বের মধ্যে যে অবিশুদ্ধ পদার্থ থাকে তারাই টাংস্টেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার আয়ু কমিয়ে দেয়। সেজন্য বাল্বের মধ্যে আরো বেশী সূক্ষ্ম বায়ুশূন্যতা করার প্রয়োজন হয়। ইতিমধ্যেই ল্যাঙ্গমুর এক বিশেষ ধরণের মার্কারী-ভেপার ল্যাম্পের উদ্ভাবন করেন, যাতে বাল্বের মধ্যেকার বায়ুকে আগের থেকে আরো তাড়াতাড়ি এবং আরো বেশী দক্ষতার সঙ্গে শূন্য করা যায়। তবে টাংস্টেন বাল্বের উন্নতির কারণ হিরেবে তিনি দেখেন যে আর্গনের মত কিছু কিছু গ্যাস উত্তপ্ত টাংস্টেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। ফলে ঠিক মতো যদি আর্গন বা নাইট্রোজেন গ্যাস বাল্বের মধ্যে পূর্ণ করা যায়, তাহলে টাংস্টেন ফিলামেন্ট দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এইভাবে ল্যাঙ্গমুর তাঁর প্রমথ উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে, তড়িৎ-শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় রোধ করেন। তাঁর এই গবেষণা, আরও একটা যন্ত্রের উদ্ভাবন এনে দেয়। এই গবেষণ কালে তিনি দেখেন যে; উজ্জ্বল টাংস্টেনের অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রা হাইড্রোজেন অণুগুলিকে পরমাণুতে বিয়োজিত করে দেয় এবং যখন এই পরমাণুগুলো পুনরায় সংযোজিত হয় তখন এই পরমাণুগুলো থেকে প্রচন্ড পরিমাণ তাপ

উৎপন্ন হয়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ১৯২৭ সালে, ধাতু ওয়েল্ডিংয়ের জন্য পারমাণবিক হাইড্রোজেন টর্চের উদ্ভাবন হল। এই যন্ত্রে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাড্রোজেন গ্যাসকে প্রবাহিত করে হাইড্রোজেন পরমাণুতে বিয়োজিত করা হয়। ফলে পরমাণুগুলো পুর্ণসংযোজনের ফলে প্রায় সাত হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা এই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত হয়।

তবে ল্যাঙ্গমুর কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না। তাঁর সৃজনমূলক প্রতিভা রসায়ন শাস্ত্রের আরো গভীরে প্রবেশ করে। সেই যবে থেকে ল্যাভোসিয়ার প্রথম রাসায়নিক মৌলের স্বরূপ নির্ধারণ করেন। তখন থেকেই রসায়ন-বিদগণ জানতে চেষ্টা করেন যে, কেন ক্লোরিণ, ক্লোরিণের মত মৌল অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়; আর কেনই বা আর্গন হিলিয়ামের মত মৌল রাসায়নিকগত নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে ল্যাঙ্গমুর এবার এই অনাবিষ্কৃত সমস্যার প্রতি মনো-যোগী হন। তখন বিজ্ঞান জগৎ, পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত নীলস বোর, গিলবার্ট লিউইস, মোসলের আবিষ্কারে সমৃদ্ধশালী, ল্যাঙ্গমুর এই সমস্ত অমূল্য তথ্যকে ভিত্তি করে, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেন যে, হাই-ড্রোজেন, যার পারমাণবিক সংখ্যা এক, তার নিউক্লিয়াসের বাইরের সেলে একটা ইলেকট্রন থাকে। ল্যাঙ্গমুরের মতে এটা একটা অসম্পূর্ণ গঠন, কারণ স্থায়ী গঠনের জন্য বাইরের প্রথম সেলটাতে ইলেকট্রনের সংখ্যা হওয়া উচিত দুই। সুতরাং স্থায়ী গঠনের জন্য হাইড্রোজেন পরমাণু হয় একটা ইলেকট্রন অন্য কারো থেকে নেবে বা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। আবার হিলিয়াম, যার পারমাণবিক সংখ্যা দুই, তার বাইরের সেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা দুই। সুতরাং স্থায়ী গঠনের জন্য, সে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এইরকম দশ পারমানবিক সংখ্যা যার, সেই নিয়ন মৌলের, প্রথম বাইরের সেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা দুই এবং পরের দ্বিতীয় সেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা আট। সুতরাং সেও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ক্লোরিণের (যার পারমাণবিক সংখ্যা সাত) সুতরাং সে স্থায়ী গঠনের জন্য একটা ইলেকট্রন অপরের থেকে নেবে বা অপরকে সাতটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুবিধেজনক একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করা বলে, সে অপরের থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে, এবং এইভাবে হাইড্রোজেন থেকে একটা ইলেকট্রন নিয়ে হাইড্রোজেনর সঙ্গে যুক্ত হয় ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড যৌগ গঠন করে। রাসায়নিক আসক্তির এই পারমানবিক ভিত্তিসম্মত তাঁর ব্যাখ্যা স্বীকৃত হয়। এছাড়া একই মৌলের বিভিন্ন রূপের আইসোটোপের (যাদেরা ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন) ওপরও তাঁর

মতবাদ স্বীকৃত হয়। তাঁর এই সমস্ত মতবাদের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩২ সালে তিনি রসায়নের ওপর নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।
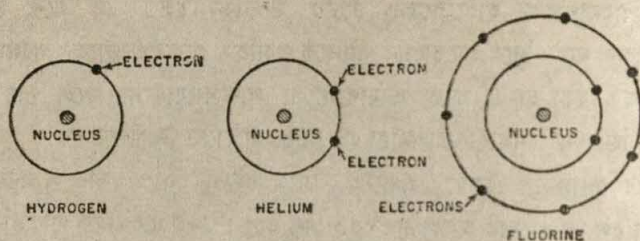
এছাড়া তাঁর আরও একটা আবিষ্কার হল, পদার্থের দ্রাব্যতা ও তরলের পৃষ্ঠের ওপর তার বিক্রিয়া সম্পর্কিত। তিনি প্রমাণ করেন যে, কোন পদার্থের দ্রাব্যতা ও কোন তরল পৃষ্ঠের ওপর তার ব্যবহার, সেই পদার্থের আনবিক ও পারমানবিক গঠনের ওপর নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু পদার্থের আনবিক গঠনের পার্থক্যও দেখাতে সমর্থ হন।

নিউইয়র্কে তাঁর অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হয়। পরে তিনি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর রিসার্চের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। এই পদে থাকাকালীয় অবস্থায় শেষের দিকে তিনি আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণায় আগ্রহী হন এবং মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডিন কেলাসের বীজ নিক্ষিপ্ত করে কৃত্রিম বৃষ্টি উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেন। তবে এই সমস্ত পরীক্ষার সাফল্য লাভ খুব একটা ব্যাপক হারে হয় না।

১৯৫৯ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে, তিনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনপূর্ণ তরুণ বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত ট্রেনিং এবং সুযোগ প্রদানের ওপর জোর দেন, যাতে তাঁরা মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রসারিত করতে পারে।

............নীলস হেনরিক ডেভিড বোর..

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৫—১৯৬২)

বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো তাঁর "বায়োগ্রাফি অফ ফিজিক্স" বইতে তাঁর প্রিয় শিক্ষক, অধ্যাপক নীলস বোর সম্পর্কে লেখেন—"a most remarkable man in many non-Scientific ways."

নীলস হেনরিক ডেভিড বোর, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসিওলজি শাখার অধ্যাপক ক্রিষ্টিয়ান বোর ও এলেন অ্যাডলারের প্রথম সন্তান হিসেবে ১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। কোপেনহেগেনের পাবলিক স্কুলে এবং পরে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এরপর তাঁর গবেষণা-জীবন শুরু হয়। এ সম্বন্ধে ফ্লুইড ও পৃষ্ঠ-টানের ওপর তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯০৭ সালে তিনি বিজ্ঞানের রয়্যাল ড্যানিস একাডেমির স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর তিনি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য "Investigations of the Electronic Theory of metals"-এর ওপর তাঁর রিসার্চ পেশ করেন। ১৯০৭ সাল সাফেল্যর সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের সঙ্গে সঙ্গে, প্রথমে ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে স্যার জে, জে, থমসনের অধীনে এবং পরে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের অধীনে আরো উচ্চতর গবেষণার শুরু করেন। যে সময় রাদারফোর্ড তাঁর পরমাণুর কেন্দ্রক গবেষণার শেষাংশে। বোর রাদার-ফোর্ডের ধ্যান-ধারণা এবং গবেষণায় প্রচণ্ডভাবে মুগ্ধ হন এবং এবং একই সঙ্গে রাদারফোর্ডও এই তরুণ সহকর্মীর প্রতি সন্তুষ্ট হন।

এরপর কোপেনহেগেনে ফিরে এসে তিনি ইলেকট্রনের কক্ষপথে ঘূর্ণবেগের যথাযথ রূপায়ণের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি কোন পরমাণু দ্বারা, অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রায় বা তার মধ্যে তড়িতক্ষরণ প্রবাহের কালে, উৎপাদিত বৈশিষ্ট্যমূলক স্পেকটাল বর্ণের সিরিজের সাহায্য নেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত পারমাণবিক স্পেকট্রা যেন পরমাণুর ফিঙ্গার প্রিণ্ট—এদের সাহায্যেই কোন অজানা পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের উপস্থিতি নির্ধারণ করা যায়। বস্তুতঃ স্পেকট্রাল বিশ্লেষণের সাহায্যেই, পৃথিবীতে পাওয়ার অনেক আগেই, সূর্যের মধ্যে হিলিয়ামের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়।

বোর এই ভাবেই রাদারফোর্ডের পারমাণবিক নিউক্লিয়াস ও প্ল্যাংকের কোয়াণ্টাম থিওরী সংযুক্ত করে প্রথম পারমাণবিক গঠনের গাণিতিক রূপ নির্ণয় করেন। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্রের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হয়। এই কক্ষপথগুলোকে স্টেশনারী স্টেটস বলা হয়। এই কক্ষপথগুলোর প্রত্যেকটার একটা সুনির্দিষ্ট কিন্তু আলাদা শক্তি মাত্রা থাকে। এই সমস্ত স্থায়ী কক্ষপথগুলো থেকে যখন ইলেকট্রন অন্য এক অপেক্ষাকৃত কম শক্তি বিশিষ্ট কক্ষপথে গিয়ে পড়ে, তখন এই ইলেকট্রন স্পেকট্রাল রেখারূপে শক্তি বিকিরিত করে এবং এই রেখাগুলোই নির্দিষ্ট পরমাণুর বৈশিষ্ট্য। বোরের যুক্তি এবং গাণিতিক সূত্র এতই সঠিক ছিল যে, তিনি এর সাহায্যেই দৃশ্যমান হাইড্রোজেন পরমাণুর স্পেকট্রাল রেখার মান নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তাছাড়া ইলেকট্রনের কক্ষ পরিবর্তন সম্বলিত রাদারফোর্ড-বোরের পারমাণবিক চিত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর বিকিরণের অতিবেগুনী ও অবলোহিত বর্ণালীরও সঠিক নির্ধারণ সম্ভবপর হয়।
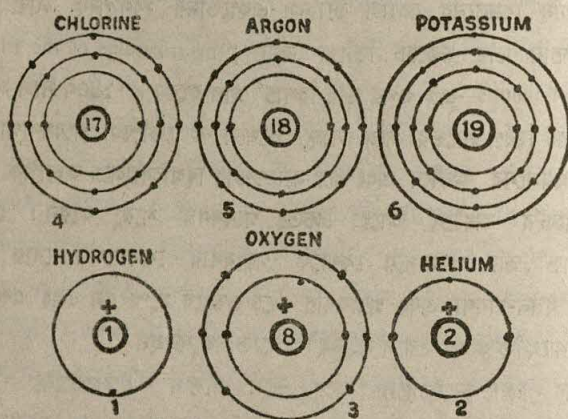
১৯১৬ সালে বোর কোপেনহেগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২০ সালে অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোপেনহেগেন ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর পদে মনোনীত হন। স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই ইনস্টিটিউট পৃথিবীর এক সেরা গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং হাইসেনবার্গ, ডিরাক, মেইটনার, বর্ণ, জর্ডান, ফ্রিসথ এবং গ্যামো প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ এখানে গবেষণার নিমিত্ত আসেন]। ১৯২২ সালে পরমাণু গঠনের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য, তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

ঊনিশ শতকের তিন দশকের শেষ ভাগে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে। স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের জন্য ইউরোপের অধিকাংশ পারমাণবিক বিজ্ঞানীগণ তাঁদের স্বদেশ ত্যাগ করেন। যেমনঃ ইটালীর এনরিকো ফার্মি, জার্মানীর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এই সময় জার্মান বিজ্ঞানী লিস মেইটনারও জার্মানী ছেড়ে কোপেনহেগেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এক অমূল্য তথ্য—ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা বিস্ফোরণের ফলে, ইউরেনিয়াম, বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন বিয়োজিত হয়ে যায় এবং বিয়োজন কালে এক প্রচণ্ড শক্তির উৎপন্ন হয়। বোর এই তত্ত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রে, আইনস্টাইন এবং এনরিকো ফার্মির সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ফলস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুমোদনে অ্যাটম-বোমা প্রস্তুতের এক প্রজেক্টও গঠিত হয়। ১৯৪০ সালে নাৎসীরা ডেনমার্ক অধিকার করলেও তিনি তখনও সেখানেই থাকেন। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বোর ডেনমার্কে অধ্যাপক ও নাৎসী বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করেন; কিন্তু এই সময় নাৎসী দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তিনি লুকিয়ে নৌকো করে সুইডেনে পালিয়ে আসেন। এটা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটম-বোম প্রজেক্টে পরামর্শদাতা রূপে বোরের যোগদানের যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার প্রথম ধাপ। কিন্তু এখানে এসে তিনি জার্মান এজেণ্টদের দ্বারা নিহত বা অপহরণের বিপদ-সংকুল ঝুঁকি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া পরিত্যাগ করে সুইডেনে অবস্থান করেন। কারণ কি? না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিগত ভাবে রাজা গুস্তাভের কাছ থেকে আশ্বাস পাচ্ছেন যে, রাজা সুইডেনের নিরপেক্ষতার ঝুঁকি নিয়েও, নাৎসী অত্যাচারীদের থেকে লুকিয়ে থাকা আট হাজার ডেনমার্কবাসী ইহুদীদের সুইডেনে থাকার অনুমতি দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না। যাইহোক অ্যাটম বোমা প্রজেক্টে বোরের দান অসাধারণ এবং যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর এক ত্বরিত যবনিকা নেমে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নীলস বোর আবার কোপেনহেগেন ইনস্টিটিউটে ফিরে আসেন। ১৯৪৭ সালে ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিখ তাঁকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি "ড্যানিশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে এবং পারমাণবিক শক্তির শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হন। ১৯৫৭ সালে তিনিই প্রথম "Atoms for Peace" পুরস্কার লাভ করেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর, মহাকাশ যুগের এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নীলস বোরের মৃত্যু হলে সমস্ত সভ্য জগৎ তাঁর প্রতি শোকশ্রদ্ধা নিবেদন করে।

............হেনরী গোয়িন জেফ্রেস মোসলে............................ ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭—১৯১৫)

১৯১৫ সালের আগষ্ট, ব্রিটেনের ফার্স্ট আর্মির এক তরুণ সিগন্যাল অফিসার, দার্দানেলেস যুদ্ধশিবিরে যোগদানের জন্য তুর্কীতে আসার দু-মাসের মধ্যেই নিহত হন। এই তরুণ অফিসার, হেনরী মোসলে, মাত্র চার বছরের এক অতি সংক্ষিপ্ত নিবদ্ধ গবেষণায় উপপারমানবিক এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

হেনরী মোসলে ১৮৮৭ সালের ২৩শে নভেম্বর এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের পরিবারে বংশানুক্রমিক এক শিক্ষাগত অভিজাত্যের পরিচয় পাওয়ার যায়। তাঁর বাবা তখনকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক। এছাড়া তাঁর পিতামহ হেনরী মোসলে ছিলেন লণ্ডনের কিংস কলেজের এক প্রখ্যাত পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ এবং মাতামহ জন গোয়িন জেফ্রেসও একজন বিশিষ্ট প্রাণীবিদ্ ছিলেন। এমনকি তাঁর বড়দিদি মিসেস লাডলো হিউইটও পরে জীববিদ্যার একজন বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হন।

১৮৯১ সালে তাঁর বাবার অকালমৃত্যু হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর মা পরিবারের এস্টেটের থেকে প্রাপ্ত যথেষ্ট আয়ের সাহায্যে তাঁর তিন ছেলে-মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেন এবং বড় ছেলে হেনরীর জন্য একটা সাধারণ ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরীও তৈরি করে দেন। এইভাবে ছোটবেলায় হেনরী নানান ধরণের পাখী এবং পাখীর বাসা সম্পর্কে পরিচিত হতে থাকেন। এছাড়া হেনরী তাঁর ছুটির অবকাশে এবং সপ্তাহান্ত ছুটিতে, মা এবং বোন-দের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলারও অন্বেষণ করতেন। এইরকম একবার তিনি একটা তীরফলক, শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে পরিদর্শনকালে খুঁজে পান। এই অন্বেষণে তিনি এতই গর্ব বোধ করেন যে, তিনি তাঁর এই সংগ্রহ, দুই বন্ধু জুলিয়ান হাক্সলি ও চার্লস গ্যালটন ডারউইনকে দেখান।

এটনে পাঁচ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে ন্যাচারাল সায়েন্সের ওপর স্কলারশিপ নিয়ে প্রবেশ করেন। ন্যাচারাল সায়েন্স অনার্স নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে লেকচারারের পদে যোগ দেন। এখানেই তিনি বিখ্যাত রাদার-

ফোর্ডের সংস্পর্শে আসেন। রাদারফোর্ড তরুণ মোসলের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তেজস্ক্রিয়তার ওপর তাঁকে গবেষণা করতে সম্মতি দেন। ফলে মোসলে গবেষণার প্রতি বেশী সময় দিতে না পারার কারণে অধ্যাপনা পদ ত্যাগ করে গবেষণার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ সরেগ। গবেষণা ফলে তিনি আবিষ্কার করেন যে, পরমাণু কেন্দ্রে ধনাত্মক আধান সম্বলিত কণার (প্রোটন) পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে, ৩৩ মৌলের পারমানবিক ভরও বৃদ্ধি পাবে ; এছাড়া পারমানবিক সংখ্যা, পারমাণবিক ভরের প্রায় অর্ধেক।

এরপর মোসলে, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাক্স ভন লিউএর এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রতি নিবদ্ধ হন। এই আবিষ্কার লিউ দেখান যে, লবণের বিশুদ্ধ কেলাস প্রিজমের মত ব্যবহার করে, এক্স-রশ্মিকে বিভক্ত করে, এক্স-রশ্মি বর্ণালী পাওয়া যায় ; এই বর্ণালী যদিও খালি চোখে দেখা যায় না, তবুও এর আলোকচিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিউএর এই এক্স রশ্মি বর্ণালীর সাহায্যে বিভিন্ন মৌলের সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অবশেষে ১৯১২ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে, পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে, পরমাণু কেন্দ্রেতে অবস্থিত ধনাত্মক তড়িত আধান-যুক্ত কণার মোট সংখ্যার সমান। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, মৌলের পর্যায় সারণীতে অর্থাৎ মৌলের ভৌতিক এবং রাসায়নিক ধর্মের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভরের থেকে, পারমাণবিক সংখ্যাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হাইড্রোজনের পারমাণবিক সংখ্যা এক ধরে মৌলের এক আধুনিক পর্যায়-সারণী প্রস্তুত করেন। মেণ্ডেলিভের পর্যায়সারণীতে যে তিনটে ত্রুটি ছিল তার সর্বসম্মত ব্যাখ্যা মোসলের সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে যথার্থ নিরূপিত হয়। মোসলের পর্যায় সারণীতে তদানীন্তন অনাবিষ্কৃত সাতটা মৌলের উপস্থিতি ছিল ; যাদের পারমানাবিক সংখ্যা যথাক্রমে ঃ ৪৩, ৬১, ৭২, ৭৫, ৮৫, ৮৭, ৯১। তাঁর আবিষ্কার এতই সঠিক ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৫ সালের মধ্যেই এই সমস্ত মৌল আবিষ্কৃত হয় এবং সবিস্ময়ে দেখা যায় যে, এই সমস্ত মৌলের ধর্ম, তিনি বহুপূর্বেই যা ভবিষ্যৎবাণী করেন তার সঙ্গে হুবহু এক।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ (সি. ভি. রমণ)

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৮—১৯৭০)

আজ পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় যিনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান, তিনি হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সি, ভি, রমণ। সৃজন মূলক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান জগতের দরবারে তিনি ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতবর্ষের গর্ব এই প্রদার্থবিদ, চন্দ্রশেখর ভেংকটরমণ ১৮৮৮ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতবর্ষের এক প্রদেশ মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) ত্রিচিনোপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে স্নাতক উপাধি এবং তার দুবছর পরেই স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের চাকরীতে ঢোকেন। চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও করতে থাকেন। কিন্তু গবেষণায় যথেষ্ট সময় দিতে না পারার জন্য ১৯১৪ সালে রাজস্ব বিভাগের চাকরী পরিত্যাগ করে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানের একজন প্রতিভাবান হিসেবে, আস্তে আস্তে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হতে থাকে। এই সময় তাঁর প্রতিভায় স্যার আশুতোষ মুখার্জী মুগ্ধ হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে আহ্বান জানান। তিনি এই আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দেন। ফলে ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় তিনি ধ্বনিতত্ত্ব, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও আলোকের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। ইতিমধ্যেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী র‍্যালে, আকাশ ও সমুদ্রের জল নীল কেন এ সম্বন্ধে বিকিরণ সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা বিজ্ঞান জগতে উপস্থাপন করেন। রমণ, র‍্যালের এই আবিষ্কারের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৪ সালে তিনি র‍্যালের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে ঐ একই বছরে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির বিদেশী সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু সৃজনধর্মী রমণের প্রতিভা এখানেই থেমে থাকল না। তাঁর মন প্রকৃতির অজানাকে আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠল। ফলে সামান্য যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগারে প্রস্তুত উপকরণের সাহায্যে তিনি আলোকের

বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন এ সম্বন্ধে বেশ কয়েক নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, ১৯২৮ সালে তিনি এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এই আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে "রামন এফেক্ট" বলে পরিচিত। তাঁর এই মৌলিক আবিষ্কারের জন্য, ১৯৩০ সালে বিজ্ঞানীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "নোবেল প্রাইজ" লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি বাঙ্গালোর চলে যান এবং বিজ্ঞান সাধনার স্থান হিসেবে "রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা নিযুক্ত হন; কিন্তু চার বছর পর স্বেচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করে তিনি একই প্রতিষ্ঠানে পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষরূপে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু সম্মান ও উপাধি লাভ করেন। অবশেষে ১৯৭০ সালের ২১শে নভেম্বর ভারত-বর্ষের এই কৃতি সন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট" আজও বিজ্ঞান গবেষণার তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

..........স্যার ফ্রেডরিক গ্র্যান্ট ব্যান্টিং..

(খৃষ্টাব্দ ১৮৯১—১৯৪১)

১৮৯১ সালে যখন ব্যান্টিং জন্মগ্রহণ করেন, তখনও চিকিৎসা জগৎ দুরারোগ্য অনেক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে রত। এদের মধ্যে একটা হল "ডায়াবেটিস"।

ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির শরীরে, আভ্যন্তরীণ নিঃসৃত রস বা হরমোন, যা কিনা টিসুগুলোকে গ্লুকোজ ব্যবহার করতে সাহায্য করে, তার অভাব হয়। ফলে রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত শর্করা বৃক্কের মধ্যে দিয়ে মূত্রতে প্রবাহিত হয়। ডায়াবেটিস রোগে, ব্যক্তির শক্তির হ্রাস হয়; রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়; ফলে রোগীর শরীরে নানান কষ্ট, জড়তা ভাব, ঘা এবং পরিশেষে মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে। ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত এই রোগের তেমন কোন প্রতিষেধক ছিল না। ১৯২১ সালে বান্টিং এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মানবজাতিকে শয়তানের এক অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন।

ফ্রেডরিখ গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং কানাডার অণ্টারিও প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করার পর টরোণ্টোর এক হাসপাতালের প্রধান সার্জেন,

ডাঃ ক্ল্যারেন্স স্টারের অধীনে বিশেষ বিষয় হিসেবে বোন সার্জারী নিয়ে পড়তে থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় "কানাডিয়ান আর্মি মেডিকেল কোরে" ব্যান্টিং স্বেচ্ছাকৃত ভাবে যোগদান করেন। এই সময় এক ঘটনায় তাঁর ডান হাত গুরুতররূপে জখম হন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ডাক্তাররা আরোগ্যের জন্য তাঁর হাত কেটে বাদ দেবার কথা বললে তিনি ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ করেন। কারণ ডান হাত বাদ গেলে সার্জেন হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ শেষ। তার চেয়ে বরং মৃত্যুই ভাল! কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাত ভাল হয়ে ওঠে। তিনি যুদ্ধশেষে সাহসিকতার জন্য "military Cross" পুরস্কৃত হন। যুদ্ধ শেষে তিনি আবার টরোণ্টো হাসপাতালে, তাঁর পুরনো সার্জিক্যাল কাজে ফিরে আসেন।

১৯২০ সালে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন। কিন্তু পসার খুব একটা জমে ওঠে না; প্রথম মাসে তাঁর রোজগার হয় মাত্র চার ডলার। ফলে বাড়তি রোজগারের জন্য পশ্চিম টরোণ্টোর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজে পার্ট-টাইম লেকচারারের পদে যোগ দেন। এই সময় একদিন অগ্ন্যাশয়ের ওপর বক্তৃতার একটা খসড়া তৈরি করতে গিয়ে, ব্যান্টিং "Relation of the Islets of Langerhans to Diabetes" নামে একটা প্রবন্ধ পড়েন। বস্তুতঃ ব্যান্টিং-এর ডায়াবেটিস রোগের প্রতিকারের অন্বেষণ এখান থেকেই শুরু হয়। প্রবন্ধের বর্ণনানুযায়ী, অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসরণকারী কোষ ছাড়া ভিন্ন প্রকারের কোষগুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়। এই কোষগুচ্ছকে ল্যাঙ্গার-হানস বর্ণিত কোষদ্বীপ বলে। এই কোষদ্বীপের মধ্যে কয়েক প্রকার কোষ আছে। এদের মধ্যেই এক প্রকার কোষ থেকে এক ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হয়, যা রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে যেহেতু থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ জনিত অপ্রাচুর্য্যতায়, সুস্থ লোকের থাইরয়েড গ্রন্থির থেকে হর্মোন সংগ্রহ করে ইঞ্জেকসন দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, সেজন্য বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, একইরকম ভাবে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির থেকে হর্মোন পৃথক করে ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু এরকম বহু প্রচেষ্টা, ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত পশুর ওপর করা হয়। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়।

ব্যান্টিং এই সমস্ত তথ্য পড়েন, তাঁর মনে এই সমস্যা প্রচণ্ডভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মনে পূর্বকৃত পরীক্ষাগুলোর ব্যর্থতা সম্বন্ধে নানা কারণ উদয় হতে থাকে। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে একটা উপায় খেলে যায়। তিনি ঠিক করেন যে, যদি অগ্ন্যাশয়

থেকে নির্গত, অন্ত্রের সঙ্গে যোগসূত্রকারী নালীগুলো বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কোষদ্বীপগুলো থেকে প্রয়োজনীয় হর্মোন সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই কথা মনে হতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে সেই রাত্রেই অর্থাৎ ১৯২০ সালের ৩০শে অক্টোবরের রাত্রিতে তাঁর নোট বইতে লেখেন ঃ "Tie off pancreatic ducts of dogs. Wait six or eight weeks. Remove and extract".

ব্যান্টিং তাঁর এই ধারণার কথা টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসিওলজি শাখার প্রধান অধ্যাপক ম্যাকলিওডকে বলেন। কিন্তু ম্যাকলিওডের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে সেরা সেরা শারীরবৃত্তবিদগণ এই নিয়ে চেষ্টা করেছেন এবং সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যান্টিং কি আর সাফল্য লাভ করতে পারবে? ব্যান্টিং নাছোড়বান্দা হয়ে ম্যাকলিওডের পেছনে লেগে থাকলেন। অবশেষে অনিচ্ছাভরে ডাঃ ম্যাকলিওড তাঁকে গবেষণার অনুমতি দিলেন। ম্যাকলিওডের অনুমোদনে তিনি সহকর্মী হিসেবে এক তরুণ ফিজিওলজিষ্ট ও বায়োকেমিস্ট, চার্লস বেস্টকে ও গবেষণার নিমিত্ত দশটা কুকুর পান। এই নিয়ে একটা ছোট্ট গবেষণাগারে তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অবশেষে পরের বছরের জুলাই মাস নাগাদ তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাফল্য লাভ করেন। তিনি ডায়াবেটিস রোগের প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করেন। ব্যান্টিং এই হর্মোনের নাম দেন "islets" এর অনুকরণে "isletin." পরে ডাঃ ম্যাকলিউডে-এর পরিচিত "ইনসুলিন" নামকরণ করেন। তবে একটা ব্যাপার হল যে, ইনসুলিন, ডায়াবেটিসের কোন প্রতিকার নয়। ইনসুলিন, লিভার ও শরীরের অন্যান্য পেশীর মধ্যে, গ্লাইকোজেন রূপে শর্করার সঞ্চয়কে ত্বরান্বিত করে এবং মূত্রের মধ্য দিয়ে শর্করার অপব্যয়কে রোধ করে। ইনসুলিন ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের জন্য নিয়মিত ইনসুলিন ইঞ্জেকসনের প্রয়োজন হয়।

এই ইনসুলিন ইঞ্জেকসন এরপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়েও অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ পরিলক্ষিত হয়। আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিও সেরে উঠতে লাগল। ফলে অগণিত ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইঞ্জেকসনের প্রয়োজন হয়। ফলস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিনের জন্য কসাইখানার নিহত গবাদি পশুদের অগ্ন্যাশয় থেকে দ্রুতহারে ইনসুলিন নিষ্কাশন করা হতে লাগল।

ডাঃ ব্যাণ্টিং ত'ার এই আবিষ্কার থেকে প্রচুর লাভ করতেন। কিন্তু তা না করে, ত'ার এই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার্থে উৎসর্গ করেন। ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে, এইচ. জি. ওয়েলস, ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ এবং অ্যানিমিয়া রোগের আরোগ্যের আবিষ্কর্তা জর্জ মিনোট প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ছিলেন, যারা পরে ব্যাণ্টিং-এর এই আবিষ্কারে ফলপ্রদ হয়ে ভবিষ্যতে এক স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন।

• ব্যাটিং তার এই আবিষ্কারের জন্য ১৯২৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর মহানুভবতার ফলস্বরূপ, তিনি এই প্রাইজ তাঁর সহকর্মী ডাঃ বেস্টের সঙ্গে যুগ্মভাবে গ্রহণ করেন। ব্যাণ্টিং এরপর টরোণ্টো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিকেল রিসার্চ শাখার অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে রাজা জর্জ ত'াকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আবার কানাডিয়ান আর্মি মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। এবং কানাডা ও ইংল্যাণ্ডে কাজ করতে থাকেন। এইরকম ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে যাবার কালে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্লেনে যান্ত্রিক গণ্ডগোল দেখা যায়। ফলে প্লেনের পাখা একটা বিরাট গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং প্লেনটা ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে এক আকস্মিক প্লেন দুর্ঘটনায়, পঞ্চাশ বছর বয়সে, ডাঃ মেজর ব্যাণ্টিং তাঁর প্রাণ হারান।

স্যার জেমস চ্যাডউইক

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯১—)

জে, জে, চ্যাডউইকের বড় ছেলে জেমস চ্যাডউইক ১৮৯১ সালের ২০শে অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারে জন্মগ্রহণ করেন। সেকেণ্ডারী স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের ভিক্টোরিয়া কলেজে অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেন। এই সময় রাদারফোর্ড আলফা-কণা নিয়ে তাঁর গবেষণায় লিপ্ত। চ্যাডউইক গবেষণাগারে রাদারফোর্ডের একজন সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এই আলফা-কণা সম্পর্কিত গবেষণায় নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯১১ সালে তিনি স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ

করার পরে ঐ গবেষণাগারেই থেকে যান। এরপর ১৯১৩ সালে এক স্কলারশিপ লাভ করে তিনি জার্মানীর, চ্যারলটেনবার্গের "Physikalische Technische Reichsanstalt"-তে হ্যানস গাইগারের সঙ্গে গবেষণার নিমিত্ত চলে যান। এক বছর বাদে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, তাঁকে এক কনসেনটেসন ক্যাম্পে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। এরপর ছাড়া পেয়ে ১৯১৯ সালে তিনি আবার ম্যাঞ্চেষ্টারে ফিরে আসেন। যখন রাদারফোর্ড, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে, স্যার জে, জে, থমসনের জায়গায় অভিষিক্ত হন, তখন রাদারফোর্ড, চ্যাডউইককে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। চ্যাডউইক এই প্রস্তাব সাগ্রহে স্বীকার করে নেন এবং ফলস্বরূপ রাদার ফোর্ডের সঙ্গে এক দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ সংগঠনের সূত্রপাত ঘটে।

১৯২১ সালে কেম্ব্রিজ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর তিনি কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারের তেজস্ক্রিয় গবেষণার সহকারী পরিচালক ও লেকচারারের পদে যোগ দেন। এছাড়া এখানে রাদারফোর্ডের সঙ্গে আলফা কণার সংঘর্ষে মৌলের রূপান্তরের গবেষণাতেও নিযুক্ত থাকেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯২২ সালে আর এক উপপারমানবিক পদার্থ প্রোটনের আবিস্কার হয়।

এই সময় বিজ্ঞান জগতে আলফা-কণার সঙ্গে বিভিন্ন মৌলের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে জোরকদমে গবেষণা চলতে থাকে। ফলস্বরূপ বিজ্ঞানীরা এক নতুন ঘটনার মুখোমুখি হন। তাঁরা দেখেন যে, আলফা-কণার সঙ্গে যদি হাল্কা মৌলের, বিশেষ করে বেরিলিয়ামের সংঘর্ষ ঘটানো যায়, তাহলে বেরিলিয়ামের থেকে এক উচ্চ ভেদশক্তি সম্পন্ন বিকিরিত রশ্মি নির্গত হয়। বিজ্ঞানী জুলিয়ট ও কুরী এই নির্গত রশ্মিকে প্যারাফিনের (হাইড্রো-কার্বন) মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে দেখেন যে, প্যারাফিন থেকে অতি শক্তি সম্পন্ন প্রোটন কণা নির্গত হয়। কিন্তু এই ঘটনার ব্যাখ্যা কেউই দিতে পারেন না। চ্যাডউইক এই ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তখন বাল্টিমোরের হাওয়ার্ড কেলী হাসপাতাল থেকে প্রেরিত এক টিউব রেডিয়ামের সঙ্গে, নির্দিষ্ট বিভবের আলফা কণার সংঘর্ষ করিয়ে পূর্বের পরীক্ষাগুলো পুনরায় সম্পন্ন করেন। নিউক্লীয়ের ভর এবং গতির বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণ এবং হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তিনি দেখেন যে এই বিকিরণ গামা রশ্মি হতে পারে না ; বরং এই বিকিরণ হচ্ছে কণার সমষ্টি কারণ যেহেতু সেগুলো শোষিত হয়।

তিনি যুক্তি দ্বারা দেখান যে, এই বিকিরিত কণাগুলোর ভর প্রোটনের সমান এবং সেহেতু এদের গতি পথের কোন পরিবর্তন হয় না, যেহেতু এরা তড়িৎ-নিরপেক্ষ। ফলে, ১৯৩২ সালে আর এক উপ-পারমাণবিক কণা "নিউট্রনের" আবিষ্কার হয়; যা বারো বছর আগেই ১৯২০ সালে উইলিয়াম ডি, হারকিনস নির্ধারণ ও নামকরণ করেন; এমন কি রাদারফোর্ডও অল্পকাল আগে এর সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। তবে ১৯৫৭ সালে প্রথম নিউইয়র্ক সিটি কলেজের স্নাতক ও নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রিচার্ড হপস্টাডটার, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউট্রন পরিমাপ করেন। নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আলফা কণার সংঘর্ষে ফলাফলকে চিত্রায়িত করা যায়ঃ ${}_4BE^9 + {}_2He^4 - {}_6C^{12} + {}_0n^1$

$$\frac{4+}{5n} + \frac{2+}{2n} - \frac{6+}{6n} \cdots 1n \quad O \text{ nucleus}$$
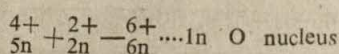
$$\left.\begin{matrix} + = \text{Protons} \\ n = \text{neutrons} \end{matrix}\right\} \text{atomic weight}$$

নিউট্রন তড়িত নিরপেক্ষ এক ভারী কণা। ফলে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রনের বিস্ফোরণ, নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন নির্গত হয়। এছাড়া মৌলের আইসোটোপেরও কারণ হিসাবে নিউট্রটের ভূমিকা দেখা যায়। কারণ নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যের জন্য মৌলের রাসায়নিক ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র ভৌত ধর্মের সামান্য পরিবর্তন হয়। এই নিউট্রন আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে চ্যাডউইড পদার্থ-বিজ্ঞানের উপর নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। সেই বছরেই তিনি কেম্ব্রিজ ছেড়ে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইয়ন জোনসের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি "আমেরিকান ম্যানহাট্টান প্রজেক্টের" অনুরূপ বিটিশ পারমাণবিক বোমার প্রতিষ্ঠান "টিউব অ্যালয়েসের" সঙ্গে সংযুক্ত হন। দুবছর বাদে চ্যাডউইক, আমেরিকান-ব্রিটিশ, কানাডিয়ান পারমাণবিক যৌথ কমিশনের ব্রিটিশ সংস্থার মুখ্য বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা-রূপে নির্বাচিত হন।

১৯৪৫ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া ঐ একই বছরে "United Nations Security Council"-এর পরিবর্তী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রসংঘের "Atomic Eenergy commission"-এর ব্রিটিশ দূত হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি কেম্ব্রিজের কর্নভিলে ও কেইয়াস কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

নোবেল প্রাইজ ছাড়াও তিনি আরো অনেক বিশিষ্ট পদক লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "medal of merit", ১৯৫০ সালে রয়াল সোসাইটির "copley medal' এবং ১৯৫১ সালে ফিলাডেলফিয়ার ফ্র্যাংকলিন ইনষ্টিটিউটের "Franklin medal" লাভ করেন।

..........আর্থার হোলি কম্পটন..........

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯২—১৯৬২)

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে চুয়াত্তর বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, মিসেস ওটেলিয়া কম্পটন মাতৃত্বের জন্য অক্সফোর্ডের ওয়েষ্টার্ন কলেজ থেকে অনারারি "ডক্টর অফ ল'স" ডিগ্রি পুরস্কৃত হলেন। এই সমাবেশে মিসেস কম্পটনের স্বামী, উষ্টার কলেজের অধ্যাপক এলিয়াস কম্পটন, ও তাঁর তিন কৃতি পুত্রও হাজির ছিলেন; শুধুমাত্র যোগ দেননি তাঁর মেয়ে মেরী, কারণ তিনি ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ। কার্ল, ফটোতড়িত ও কেলাস গঠনের ক্ষেত্রে মূল্যবান কিছু আবিষ্কার সমাপ্তে তখন ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি প্রেসিডেন্ট। মেজ ছেলে উইলসন একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, আর ছোট ছেলে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার হোলি কম্পটন। আর্থার ইতিমধ্যেই উপ-পারমাণবিক কণার গঠন ও ধর্মের ওপর তাঁর অমূল্য আবিষ্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান "নোবেল প্রাইজ" লাভ করেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার হোলি কম্পটন ১৮৯২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ওহিওর উষ্টারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্য দুই দাদাদের মতো তিনিও উষ্টার কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে প্রিনস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর এক বছরের জন্য মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ইনস্ট্রাক্টরের চাকরী নেন। পরে "ওয়েস্টিং-হাউস ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে", রিসার্চ ইঞ্জিনীয়ারের পদে চাকুরী নেন। দু বছর এখানে কাজ করার পর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে, তিনি আবার অ্যাকাডেমিক জীবনে ফিরে আসেন এই সময় তিনি রিসার্চ ফেলোসিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস

গবেষণাগারে গমন করেন। এখানে তিনি বিখ্যাত জে, জে, থমসন ও রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা করেন।

১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে তিনি সেট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক ও প্রধান পদে নির্বাচিত হন। এরপর ১৯২৩ সালে সেণ্ট-লুইস থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী অ্যালবার্ট-এ মাইকেলসনের অধীনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখানে তিনি এক্স-রশ্মির সম্বন্ধে গবেষণা করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ, এক্স-রশ্মি ও ইলেকট্রনের সংঘাত সম্বন্ধীয় নিখুঁত পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, এক্স-রশ্মির ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতের ফলে, এক্স-রশ্মির কিছু শক্তি সংস্পর্শে থাকা ইলেকট্রনের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং ফলে রশ্মিগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া অধুনা "কম্পটন প্রক্রিয়া" নামে পরিচিতঃ এই আবিষ্কার প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের কোয়াণ্টাম ও ফটোতড়িৎ থিওরীকে পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করে। এছাড়া প্রত্যক্ষভাবে তাঁর এই আবিষ্কার আলোক এবং এক্স-রশ্মির তরঙ্গ ও কণাবাদ উভয়কেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর এই অমূল্য আবিষ্কারের জন্য ১৯২৭ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানের ওপর সি, টি, আর, উইলসনের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি "নোবেল প্রাইজ" লাভ করেন। বস্তুতঃ, উইলসনের "ক্লাউড চেম্বারের" সাহায্যেই কম্পটন, এক্স-রশ্মি-ইলেকট্রন সংঘাতের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন !

এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পরে রবার্ট মিলিকানের অধীনে "মহাজাগতিক রশ্মি" সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। এই সময় মিলিকানের অধীনে আটটা গবেষক দল পৃথিবীর নানান প্রান্তে, যেমন মেরু প্রদেশ, বিষুব অঞ্চল, এশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চ পর্বতাঞ্চলে, এই মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় ঘুরে বেড়ান। এই রকম এক দলের হয়ে কম্পটনও প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল জরিপ করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর এই সমস্ত গবেষণার ফলস্বরূপ জানা যায় যে, উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন এই সমস্ত রশ্মি কতকগুলো অবধানযুক্ত কণা যেমন প্রোটন বা পজিট্রনের সমষ্টি, এরা বাহিরের মহাকাশ থেকে আসে। এছাড়া স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (আন্তর আকাশ) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে আরও এক ধরণের সম্ভবত তড়িৎ নিরপেক্ষ মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সমস্ত রশ্মিগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পেঁছোয় না।

এরপর আস্তে আস্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে

পড়ে! জার্মান অত্যাচারে ইওরোপ থেকে আইনস্টাইন, ফার্মি প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে আসতে লাগলেন। ১৯৪১ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অনুমোদনে S-1 কমিটি নামে, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা গঠিত হয়। পরে প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৯৪২ সালে এর মধ্যে প্রবেশ করলে এই সংস্থার নতুন নামকরণ হয়—"ম্যানহাটান প্রজেক্ট"। আর্থার কম্পটন এই প্রজেক্টের "মেটালারজিক্যাল গবেষণাগারের" প্রধান পদে মনোনীত হন। এই শাখার কাজ ছিল ফিসনযোগ্য পদার্থ সকল (ইউরেনিয়াম—২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম—২৩৯ অণু) উৎপাদনের প্রতি তদারক করা। আর্থারের এই গবেষণাগার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ছিল। কম্পটনের পরিকল্পনা মতো, এনরিকো ফার্মির "নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর" তৈরী ও পরীক্ষার স্থান নির্ধারিত হয় শিকাগোর প্রায় বিশ মাইল দূরে আরগোনে ল্যাবরেটারীতে। কিন্তু কোন কারণে এই ল্যাবরেটারী নির্মাণে দেরী হবার জন্য কম্পটন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে একারিকো ফার্মির গবেষণার জন্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল স্টেডিয়ামের দর্শকাসনের নীচের এক বাড়ী ঠিক করেন। অবশ্য যদিও এনরিকো ফার্মি উপলব্ধি করেন যে, বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিরাপদেই সম্পন্ন হবে। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর এনরিকো ফার্মি নিরাপদে তাঁর বিখ্যাত শৃংখল ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

এরপর ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে এক অতি-মানবিক কর্মসূচীতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। একদিকে টেনিসীর ওক রিজের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ইউরেনিয়াম পৃথকীকরণ গবেষণাগারে, অন্যদিকে ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ডের নতুন প্লুটোনিয়াম প্রস্তুতাগারে এবং সর্বোপরি শিকাগোর মেটালারজিকাল ল্যাবরেটারীতে তাঁকে সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত অবস্থায় কাটাতে হয়। প্রথম শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার সাফল্যের ঠিক আড়াই বছর পর নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফল প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানীদের বিবেকে প্রশ্ন জাগে যে এই জঘন্য যুদ্ধের শীঘ্র এক ইতি টানার জন্য অ্যাটম বোমা ব্যবহার করে মানুষের প্রাণ হরণ করার কি তাদের কোন নৈতিক অধিকার আছে। কম্পটনও মন্ত্রক পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে একথা চিন্তা করেন। তবে সমগ্রের জন্য অংশ। সমগ্রকে রক্ষার স্বার্থে অংশকে ত বলি দিতেই হবে। কিছু জাপানী ও আমেরিকান জীবনের বদলে যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শীঘ্রই ইতি হয়ে যায়, তাহলে সেটাই ভাল এবং কম্পটনও একই সিদ্ধান্ত

নেন। বস্তুত নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বোম পড়ার পরেই, জাপান মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেহারাই যায় সম্পূর্ণ পাল্টে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে কম্পটন পদার্থ-বিজ্ঞানের কল্যাণমূলক কাজে মন দেন। তাঁর উদ্যোগেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনটে ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়—নিউক্লিয়ার গবেষণাকেন্দ্র, ধাতু গবেষণাকেন্দ্র ও রেডিওবায়োলজির গবেষণাকেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটেই হচ্ছে যুদ্ধ-কালীন "মেটালারজিকাল ল্যাবরেটারীর" শান্তিকালীন ফলশ্রুতি। ১৯৪৫ সালে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদে নির্বাচিত হন।

মেঘনাদ সাহা

(খৃষ্টাব্দ ১৮৯৩—১৯৫৬)

ভারতবর্ষের অন্যতম কৃতী সুসন্তান হিসেবে ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্রনাথ সাহার পুত্র মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ সালে বাংলা-দেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সেওরাতলী গ্রামে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। এরপর প্রথমে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ও পরে জুবিলী স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯০৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই, এস-সি এবং ১৯১৩ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি, এস-সি পাশ করেন। এই সময়ে অন্যতম কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর অদম্য আকর্ষণের জন্য ১৯১৫ সালে বিজ্ঞান কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম, এস, সি পাশ করেন। ঐ সময় সত্যেন্দ্রনাথ বোস তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এম, এস, সি পাশ করার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন ও অবসর সময়ে গবেষণা করতে থাকেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ১৯১২ সালে তিনি কলিকাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডি, এস, সি, উপাধি পান। ১৯২০ সালে তিনি বিদেশে গিয়ে

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেন ও তাপ-বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণার জন্য উভয় দেশেই খ্যাতিলাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯২৩ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে নিয়মিতভাবে গবেষণা করে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাঁর নতুন মতবাদ খুবই মূল্যবান। এই সমস্ত গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯২৯ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্যোগেই ভারতে অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তিনি ভারতবর্ষের বিজ্ঞান বিভাগে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কলিকাতার "Institute of Nucleur Physics" তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানেও গবেষণা করেন। দেশের দৈন্য দূরীকরণে তিনি সর্বদাই উন্মুখ থাকতেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ভারতের বহু পরিকল্পনা সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ১৯৫২ সালে তিনি ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই পদে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তিনি কাজ করেন। পরিশেষে ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতের অন্যতম সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা পরলোক গমন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

(খৃষ্টাব্দ ১৮৯৪—১৯৭৪)

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, ভারতবর্ষের অন্যতম গণিতবিদ্ সত্যেন্দ্রনাথ বোস উত্তর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ বোস ও মায়ের নাম আমোদিনী দেবী। নর্ম্যাল স্কুলে সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রগাঢ় জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৯ সালে হিন্দু স্কুলে থেকে তিনি পঞ্চম স্থান পেয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর প্রত্যেক বারই প্রথম হয়ে, ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই, এস, সি,

১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স নিয়ে বি, এস, সি এবং ১৯১৫ সালে মিশ্র গণিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম, এস-সি, পাশ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞানে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এর পাঁচ বছর বাদে, ১৯২১ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডার হন। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে এখানে তিনি নানান গবেষণা ব্রতী হঁন। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। গবেষণার ফলস্বরূপ, ১৯২৪ সালে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "বোস-সংখ্যায়ন" প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা-পত্র বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যে সকল প্রাথমিক কণা বোসের সংখ্যায়ন মেনে চলে তাঁদের বলা হয় "বোসন"। যাই হোক ১৯২৬ সালে তিনি ইউরোপে যান এবং ১৯২৭ সালে স্বদেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য তিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ পদে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত থাকেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। একই বছরে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করেন। এই পদে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি থাকেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সত্যেন্দ্র নাথ বসুর তিরোধান ঘটে।

বিজ্ঞানী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বোস আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নাম চিরকাল এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে। তিনি দেশের জনমানসে বিজ্ঞান-চেতনার প্রকৃত উন্মেষের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞানই দেশের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি ও জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনে সক্ষম। সেজন্য তিনি ক্লাশে বাংলা ভাষাতেই পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতেন। ১৯৪৮ সালে তিনি "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মুখপত্র "জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি বেহালা বাজাতেও খুব ভালবাসলেন।

............পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজা...

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৪—)

রাশিয়ান বিজ্ঞানী কাপিতজা প্রথম তরল হাইড্রোজেন বিহীন বিশুদ্ধ তরল হিলিয়াম প্রস্তুত করেন। তিনি 'রুদ্ধতাপ সম্প্রসারণ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বিশুদ্ধ তরল হিলিয়াম তৈরি করেন। এছাড়া হিলিয়াম গ্যাসকে যখন তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন তার মধ্যে পাওয়া যায় দু ধরণের তরল হিলিয়াম। একটা হিলিয়াম—১ এবং অন্যটা হিলিয়াম—২। সামান্য তাপ মাত্রার পরিবর্তনে (2·9°A) হিলিয়াম—১, হিলিয়াম—২য়ে পরিবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে ১৯৩৮ সালে কাপিতজা প্রমাণ করেন যে, সাধারণত কোন তরল কৈশিক নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাধা পায় ; কিন্তু হিলিয়াম—২-এর ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটে না ; বরং বলা চলে প্রায় বাধাহীন অবস্থায় হিলিয়াম—২ কৈশিক নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই ধর্মের জন্যই হিলিয়াম—২-এর নাম দেওয়া হয় "সুপার ফ্লুইড লিকুইড"। তাঁর এই আবিষ্কার পরে "লো-এনার্জি কম্পিউটার" ও "কনট্রোল সিসটেম" তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের প্রভূতভাবে সাহায্য করে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী কাপিতজা, যাঁর পুরো নাম পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজা, ১৮৯৪ সালের ২৬শে জুন, রাশিয়ার ক্রনস্টাডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন জার সেনা বাহিনীর জেনারেল। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিজ্ঞানের ওপর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেজন্য পরে বিজ্ঞান নিয়ে তিনি পেট্রোগ্রাদ পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা শেষ করে ওই ইনস্টিটিউটেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

কিন্তু কাপিতজার সৃজনমূলক মন এই অধ্যাপনা কাজে সন্তুষ্ট থাকল না। তিনি চাইলেন, গবেষণা করে বিজ্ঞান ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধিশালী করতে। অল্প বয়স থেকেই তিনি চুম্বকতত্ত্বের ওপর গবেষণা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এর জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজে বিশ্ববিখ্যাত স্যার রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা করতে মনস্থির করেন। সে সময় লেনিনগ্রামে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। দুর্ভিক্ষের শিকার হয় তাঁর স্ত্রী, এক সন্তান। এই ঘটনায় তিনি খুবই মর্মাহত হন। শোকের প্রভাব কাটাবার জন্য তিনি নিজেকে আরো বেশী

করে বিজ্ঞান সাধনায় ডুবিয়ে দেন এবং ১৯২১ সালে কাপিতজা পেট্রোগ্রাদ থেকে চলে আসেন কেমব্রিজে ; সরাসরি রাদারফোর্ডের কাছে।

অল্পকালের মধ্যেই রাদারফোর্ড তাঁর প্রতিভার সম্বন্ধে সম্যক অবগত হলেন। এই সময় তাঁর চৌম্বক-বিষয়ক গবেষণার ফলে প্রকাশ পায়। ফলে তিনি বিজ্ঞানীমহলে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে সালে রাদারফোর্ড তাঁকে ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারের চৌম্বক গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালকের পদে নিযুক্ত করেন। পরের বছরই তিনি ট্রিনিটি কলেজের "ফেলো" হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্যপদে মনোনীত হন।

কেমব্রিজে থাকাকলীন অবস্থায় তিনি নানারকম গবেবণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সময় প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন চুম্বক তৈরি করে তিনি কারিগরী ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এছাড়া কুড়ি জন পারমাণ-বিক বিজ্ঞানীকে নিয়ে কেমব্রিজে তিনি এক সংঘ তৈরি করেন। প্রত্যেক সপ্তাহে এই সংঘের এক আলোচনা সভা বসতেন এবং পারমাণবিক গবেষণার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা চলতো। পরে এই সংঘের নাম দেওয়া হয় "কাপিতজা ক্লাব"। কারণ কাপিতজাই ছিলেন এই সংঘের অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া সমগ্র ইউরোপকে অশান্ত করে তুলল। তার রেশ কাপিতজার জীবনেও এক পরিবর্তন এনে দিল। ১৯৩৪ সালে যথারীতি আগের বারগুলোর মতই তিনি সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞানী সভায় যোগ দিতে গেলেন। কিন্তু ফেরার পথে বাদ সাধলেন সোভিয়েত সরকার। বাধা দিলেন স্বয়ং স্তালিন। স্তালিনের মতে, রাশিয়া এখন জার্মান আক্রমণের অপেক্ষায় দিন গুণছে। এরকম বিপদের দিনে কাপিতজার উচিৎ দেশের স্বার্থে কাজ করা। এরপর সঠিক কি হয়েছিল তা আর জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে এরপর তিনি আর রাশিয়া থেকে কেমব্রিজে ফিরে আসতে পারেন না।

পরের দিকে তিনি এক ধরণের টারবাইন আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে কম খরচে বাতাসকে তরল করা সম্ভব হয়। সে সঙ্গে তরল অক্সিজেনও, তাঁর এই আবিষ্কার সোভিয়েত দেশের ইস্পাত শিল্পে প্রভূত কার্যকরী হয়।

১৯৫৫ সালে মস্কোর খবরে জানা যায় যে, কৃত্রিম উপগ্রহ বিষয়ক প্রকল্পের দায়িত্বের ভার কাপিতজার ওপরে ন্যস্ত। কিন্তু ঠিক কি ধরণের দায়িত্ব তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বই "রকেটস, মিসাইল এ্যাণ্ড মেন ইন স্পেস"-এ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক ডঃ উইলি লে উল্লেখ

করেন, মস্কোয় কাপিতজার পরিচালনায় রকেটের জ্বালানী বিষয়ে গবেষণার এক বৃহৎ প্রকল্প চালু করা হয়।

অবশেষে ১৯৭৮ সালে "লো-টেম্পারেচার ফিজিক্সে" গবেষণার জন্য তাঁকে জগতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সম্মান, নোবেল প্রাইজ প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বেশ কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানীর মন্তব্য ঃ "ডঃ কাপিতজার এই সম্মান বহুদিন আগেই পাওয়া উচিৎ ছিল। কারণ যে কাজের জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হলো, তা তিনি শেষ করেছেন প্রায় চার দশক আগে।"

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁর নাম দিয়েছেন "সোভিয়েত বিজ্ঞানের ডন কুইক-জোট"। কারণ অনাড়ম্বর তাঁর জীবন আর বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তায় ডন কুইকজোটের মতই তিনি বহুমুখী।

..........ড্যানিস গাবর..........

(খৃষ্টাব্দ ১৯০০—)

সিনেমা, টেলিভিশন-এর কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। আমরা সবাই তা দেখেছিও। কিন্তু এর মধ্যে ফুটে ওঠা ছবিগুলো সবই দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ এই ছবিগুলোর দুটো মাত্রা। কিন্তু এমন যদি হয় যে ছবিগুলো ত্রিমাত্রিক। অর্থাৎ ছবিগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ তিনটেই থাকে। তাহলে তখন মনে হবে যে আমরা যেন সম্পূর্ণ বাস্তব পরিবেশেই বসে আছি। যা কিছু ঘটেছে তা একান্তই বাস্তব অভিজ্ঞতা। এমন ধারণা ১৯৪৮ সালের আগে পর্যন্তও ছিল সুদূর পরাহত। কিন্তু ১৯৪৮ সালে প্রথম তত্ত্বের দিক দিয়ে ত্রিমাত্রিক ছবি সম্পর্কে অধ্যাপক ড্যানিস গাবর প্রথম সরব হয়ে ওঠেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎই এই ধারণাটা তাঁর মাথায় খেলে যায়। তিনি দেখেন যে ইলেকট্রন মাইক্রোস-কোপের মধ্যে গবেষণাকালে নানান অসুবিধে হয়! কারণ মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে যে ছবি ফুটে ওঠে তা হল দ্বিমাত্রিক। এই ছবির দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাপীয় অবস্থা, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান ইত্যাদি পাওয়া যায় না। মোট কথা এমন একটা ছবি দরকার যার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, বস্তুটা গোল না চ্যাপ্টা, আশপাশের আর অন্য বস্তুর থেকে তার কতটা দূরত্ব,

সেটা কি আর অন্যগুলোর সামনে না পেছনে ইত্যাদি। অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ খালি চোখে দেখলে যেমনটা মনে হবে ছবিতে তার ভাবটা যেন পুরোপুরি ফুটে ওঠে। সাধারণ ক্যামেরায় যা সম্ভবপর নয়।

এ সম্বন্ধে তিনি একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। এর জন্য আলোকের দুটো মৌলিক নিয়মের সাহায্য নেন। একটা হল "ইন্টারফারেন্স" অর্থাৎ একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটো আলোক-রশ্মির দুটো তরঙ্গ যদি সমদশা সম্পন্ন অবস্থায় সমগতিভিত্তিক অবস্থায় কোন বস্তুকণার ওপর এসে পড়ে, তা হলে তরঙ্গ দুটো মিলিত হয়ে ওই জায়গাটা আরো উজ্জ্বলতর করে তুলবে। আর যদি এর ঠিক বিপরীতটা ঘটে তাহলে জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা হল ডিফ্র্যাকশন অর্থাৎ আলোক-রশ্মি কোন সূক্ষ্ম বাধা অতিক্রম করার সময় আংশিক পাশ বরাবর বেঁকে যায়। এই দুটো নিয়মের সাহায্যে গাবর তাঁর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠনের পদ্ধতিটি তত্ত্বগত ভাবে খাড়া করলেন। যার নাম রাখা হলো হলোগ্রাফি এবং যে ফিল্মের ওপর বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রোথিত করা হলো তাকে বলা হলো হলোগ্রাম। যার অর্থ পরিপূর্ণ সংকেত গ্রাহক। সংকেত বলতে এখানে অবশ্যই মুখ্যত আলোর সংকেতের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব তৈরি হলেও তাকে তখনই কাজে লাগাতে পারলেন না। কারণ তাঁর এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে হলে যে আলো চাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হতে হবে এবং সেই তরঙ্গ সমান তালে কম্পিত হবে। সাধারণ আলোর সাহায্যে এটা এটা সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ আলো অর্থাৎ সাদা আলো বিভিন্ন বর্ণের আলোকের এক মিশ্রণ। তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক পৃথক পৃথক।

ফলে তাঁর আবিষ্কারের বাস্তব সাফল্য লাভের জন্য তাঁকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৬১ সালে পদার্থ বিজ্ঞানের আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার—"লেসার" আবিষ্কৃত হয়। লেসারের সাহায্যে বিশুদ্ধ আলোক-রশ্মি তৈরি করা সম্ভব হয়। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক সমান। ওই বছরই মিচিগানের কয়েকজন বিজ্ঞানী লেসার রশ্মির সাহায্যে নিখুঁত হলোগ্রাম তৈরি করতে সমর্থ হন।

হলোগ্রাম তৈরির পদ্ধতিটি নিম্নরূপ : ধরা যাক 'ক' একটা লেসার যন্ত্র। লেসার থেকে রশ্মি 'খ' গিয়ে পড়ল একটা বস্তুর ওপর যার হলোগ্রাম তৈরি করা হবে। বস্তুটার গায়ে ওই রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়বে ফটোগ্রাফিক প্লেট 'গ'-এর ওপর একই সময়ে লেসার রশ্মি 'ঘ'-কে একটা আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত করে 'গ' প্লেটটার ওপর নিক্ষেপ করা হল। প্লেটের ওপর বস্তুর এবং আয়নার থেকে প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পর মিলিত হয়ে যে ইন্টারফারেন্স সৃষ্টি

করবে সেটা লিপিবদ্ধ হবে ঐ ফটোগ্রাফিক প্লেটে এটাকে পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রস্ফুটিত করা হয়। এরই নাম হলোগ্রাম।

হলোগ্রামের ছবি পুনরুদ্ধার পদ্ধতিতেও সেই লেসার রশ্মির সাহায্য নেওয়া হয়। এবারে সেই একই লেসার রশ্মি, প্লেটটার যে দিকে হলোগ্রাম করা হয়েছে, তার বিপরীত দিক থেকে নিক্ষেপ করা হয়। হলোগ্রামে ডিফ্রাকশন ঘটবে। ফলে প্লেটটার হলোগ্রাম করা দিকে থাকা দর্শকের চোখে পড়লেই সে বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বটি দেখতে পাবে।

এই পদ্ধতিতে আরও একটা সুবিধে আছে। সাধারণ ছবির ফিল্মের একটু অংশ ছিঁড়ে ফেললে ফিল্মটা যেমন অকেজো হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না। হলোগ্রামের কিছু অংশ যদি নষ্টও হয়ে যায়, তা হলেও দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে লেসার রশ্মি নিক্ষেপ করে পুরো ছবিটাকেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। গবেষকদের কাছে এটাও বড় একটা লাভ। সম্প্রতি বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একাধিক লেসার রশ্মির সাহায্যে এই একই পদ্ধতিতে রঙীন ত্রিমাত্রিক ছবিও তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে হলোগ্রাম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে সিনেমার ছবি তোলার ব্যাপারেও অভিনব ক্যামেরার দরকার হয় না, লেন্স লাগে না। অথচ এখনকারের চেয়ে আরো বেশী জীবন্ত। ১৯৬১ পর অধ্যাপক গাবর লেসার রশ্মির সাহায্যে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেন। হলোগ্রাফিক-পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তার সংস্কারের জন্যে ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

অধ্যাপক ড্যানিশ গাবরের জন্ম ১৯০০ সালে বুদাপেস্টে। মুখ্যত হাঙ্গেরির অধিবাসী হলেও পরে বৃটেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তবে প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় তিনি রেখে যান। তিনিই তাঁর ছেলেকে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগান।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে গাবর প্রথমে বুদাপেস্টের টেকনিক্যাল ইউনি-ভার্সিটিতে প্রবেশ করেন। পরে সেখান থেকে বার্লিনের চ্যারলটেনবাগের "Technische Hochule"-এ এখান থেকেই তিনি "Electric Engineering"-এ প্রথমে ডিপ্লোমা এবং পরে ডক্টরেট লাভ করেন।

বার্লিন তখন তরুণ বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র। সেখানকার বিজ্ঞান জগতে তখন ভাস্বর হয়ে রয়েছেন আইনস্টাইন, প্ল্যাংক, শ্রডিঞ্জার, ফন লাউয়ে প্রমুখ। গাবর এঁদের প্রত্যেকের সংস্পর্শেই এসেছিলেন।

এরপর আসে ১৯৩৩ সাল। নাৎসিদের অত্যাচারে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজে তখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ শুরু হয়ে গেছে। ফলে গাবর চলে গেলেন হাঙ্গেরীতে। পরের বছর সেখান থেকে বৃটেনে এসে বৃটিশ টমাস হিউসটন কোম্পানীর রাগাবি কেন্দ্রে গবেষক ইঞ্জিনীয়ারের কাজ গ্রহণ করেন। এখানে প্রথম দিকে তিনি গ্যাসের 'তড়িৎ-মোক্ষণের ওপর গবেষণা করেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে শুরু করেন ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ এবং হলোগ্রাফির ওপর গবেষণা।

১৯৩৬ সালে রাগবিতে কাজ করার সময় কুমারী মারজোরি লুইসে বাটলারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। মধুর স্বভাবের এই মানুষটি দেশবিদেশের সম্মানও পেয়েছেন অনেক। যেমন হাঙ্গেরির সায়েন্স এ্যাকাডেমির অবৈতনিক সদস্য, টমাস ইয়ং মেডেল লাভ, জেনোয়ার ক্রিস্টোফারো কলম্বো পুরস্কার, রয়্যাল সোসাইটির রামফোর্ড মেডেল, ফ্র্যাঙ্কলিন সোসাইটির মাইকেলসন মেডেল, কমান্ডার অফ দি অরডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পর্কে গাবর শঙ্কিত। তার ধারণা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা ক্রমে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সীমিত করে তুলবে। যখন কলকব্জা মানুষের বেশীর ভাগ কাজই সেরে দেবে তখন তার অবসরও নিশ্চয় বাড়বে। তাঁর প্রশ্ন, অনাবিল সেই অবসর মুহূর্তগুলো মানুষ কীভাবে কাটাবে, সেটাই আজ বড় রকমের সমস্যা। এ ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের এখনও প্রস্তুত করে নিতে পারিনি। বিপদ এখানেই। বিভিন্ন বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালের মানবিক সমস্যাবলী নিয়ে রচিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। নাম "Innovation, Scientific, Technologicaland Social.'

এনরিকো ফার্মি

(খ্রীষ্টাব্দ ১৯০১—১৯৫৪)

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর. শিকাগোর অধ্যাপক আর্থার কম্পটন, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস কোনাণ্টকে টেলিফোনে এক সাংকেতিক বার্তা দেন : "The Italian Navigator has reached the New World." সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের বিজ্ঞান ইতিহাসে এক নতুন বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা হয়। কারণ সাংকেতিক ভাষায় প্রেরিত এই বার্তার প্রকৃত অর্থ : এনরিকো ফার্মি এবং তাঁর পদার্থবিদের দল এক নিয়ন্ত্রিত শৃংখল-বিক্রিয়ার উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেছেন। ফলে এক সম্ভাবনা এবং ভয়াবহতা নিয়ে পারমাণবিক যুগ বাস্তবে রূপায়িত হল।

তবে এই সাফল্য লাভ করতে গিয়ে "Italian Navigator", এনরিকো ফার্মিকে এক দীর্ঘ, দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। এনরিকো ফার্মি ১৯০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর রোমে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিজ্ঞান ও গণিতের ওপর আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

হাই স্কুল থেকে পাশ করে তিনি পিসার বিখ্যাত "Reale Scuola Normale Superiore"-তে প্রবেশের নিমিত্ত এক প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন। এই পরীক্ষায় তারের কম্পনের ওপর এক বিস্ময়কর প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের যুক্তি, ব্যাখ্যার প্রতিভায় পরীক্ষক অধ্যাপককে মুগ্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে ভর্তি হয়ে যান। পিসাতে তাঁর উন্নতির দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর এক অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মায়। তাঁর প্রতিভার কথা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালের মধ্যেই তিনি অব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। তাঁর আবিষ্কৃত "ফার্মির সংখ্যায়ন" দ্বারা বাস্তব গ্যাসের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিমাপ সম্ভব হয় ; এছাড়া এর সাহায্যে ধাতুর তড়িতিক ও তাপীয় পরিবহনের ঘটনাগুলোকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে "পোপ" বলে সম্বোধন করত। কারণ ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে পোপ যেমন অভ্রান্ত, সেরকম ফার্মিও "কোয়ান্টাম থিওরীর" ক্ষেত্রে অভ্রান্ত। এই সময় ১৯৩০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এক আমন্ত্রণ পেয়ে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য যান।

এই সময় তিনি মৌলের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতের সাহায্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনের দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হন। বিভিন্ন মৌলের ওপর নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে এক নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল (পারমাণবিক সংখ্যা ৯৩) উৎপাদন করেন। এই ক্ষেত্রের গবেষণা ফার্মিকে অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি প্রদান করে।

ইটালীতেও তখন আস্তে আস্তে শাসকবর্গের ইহুদী-বিদ্বেষ গড়ে উঠছে। ফার্মির স্ত্রী লরা একজন ইহুদী ছিলেন। সেজন্য ফার্মি স্ত্রীর প্রতি কোনরকম অত্যাচার হওয়ার আগেই ইটালী ত্যাগ করে আমেরিকা যাবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু শাসকবর্গের চোখ এড়িয়ে আমেরিকা পালন অসম্ভব। এই সময় সৌভাগ্য ক্রমে এক সুযোগ পেয়ে যান। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারের জন্য তাঁকে ষ্টকহোল্মে যেতে হয় এবং সেখান থেকে তিনি ও তাঁর পরিবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান।

নোবেল প্রাইজ—যে কোন বিজ্ঞানীরই স্বপ্ন। কিন্তু ফার্মির জন্য ভবিষ্যতে আরও বিরাট কিছু অপেক্ষা করেছিল। ফার্মির আগে পর্যন্ত যদি পারমাণবিক যুগের ঊষাকাল, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ফার্মির পরবর্তী আবিষ্কারের এই যুগের সূর্যোদয়।

১৯৩৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্রতী থাকার কালে তিনি জার্মান বিজ্ঞানী লিস মেইটনারের ইউরেনিয়াম বিভাজনের আবিষ্কারের সংবাদ অবগত হন। এই আবিষ্কারের অনুপ্রাণিত হয়ে ফার্মি স্বয়ংক্রিয় শৃংখল বিক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তাঁর যুক্তিতে একটা নিউট্রন দ্বারা একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হয়; এই বিভাজনের ফলে অর্থাৎ এই ফিসনে দুটো নিউট্রন পাওয়া যাবে; আবার এই দুটো নিউট্রন দ্বারা অন্য ইউরেনিয়াম দুটো পরমাণু বিভাজন করা যাবে; ফলে মোট চারটে নিউট্রন পাওয়া যাবে; এই ভাবে পরে আটটা, ষোলটা পাওয়া যাবে এবং যতক্ষণ না সমস্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিক্রিয়া চলতে থাকবে।

এই সময় পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আইনস্টাইনের সহযোগীতায়, পার্ল হারবারে বোমা পড়ার ঠিক আগের দিন। ১৯৪১ সালের ৬ই ডিসেম্বর, ফার্মি ও তাঁর এক সহকারী লিও জিলার্ড, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে এক বৈঠকে এই ধারণার কথা রুজভেল্টকে প্রকাশ

করেন ; তখন প্রেসিডেণ্ট সরকারী ভাবে পারমাণবিক শক্তি গবেষণার অনুমোদন করেন এবং এ সম্বন্ধে সর্বদিক থেকে তাঁকে সাহায্য করা হয়। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ম্যানহাট্টান প্রকল্পের অন্তর্গত, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাগ ফিল্ডের পশ্চিমদিকের স্টেডিয়ামের নীচে এক ঘরে প্রথম "শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে কিছুকাল পরেই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়ে।

অ্যাটম বোমার প্রস্তুতির সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য এনরিকো ফার্মি "কংগ্রেসনাল মেডেল অফ মেরিট" লাভ করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে "দি পাইওনীয়ার হু ওয়্যাজ দি ফার্ষ্ট ম্যান ইন অল দি ওয়ার্ল্ড টু অ্যাচিভ এ ন্যুক্লিয়ার চেইন রিএ্যাকশন" হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানে বিজ্ঞানীদের জন্য "এনরিকো ফার্মি পুরস্কার প্রচলিত হয়।

............আবদাস সালাম ....

(খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৬—)

খবরটা স্টকহোম থেকে প্রচারিত হয় সোমবার, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৯। সংবাদে বলা হয়, পদার্থ বিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্য রয়াল সুইডিস এ্যাকাডেমি অফ সায়ান্সেস এ বছর তিনজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এই তিন বিজ্ঞানী হলেন অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ, অধ্যাপক শেলডন এল গ্ল্যাশো এবং পাকিস্তানের অধ্যাপক আবদাস সালাম। নোবেল কমিটির মন্তব্য: "পরমাণুর কেন্দ্রে যে "উইক ফোর্স" বা দুর্বল বল সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় তার চরিত্র যে তড়িৎ-চৌম্বক বলেরই মত—সালাম ভিনবার্গ ও গ্ল্যাশো সেটাই বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের তত্ত্বে। পদার্থ বিজ্ঞানে যে চারটে মৌলিক ক্ষেত্রের কথা বলে হয়ে থাকে তাদের একীকৃত করার ব্যাপারে এই তত্ব এক বলিষ্ঠতম পদক্ষেপ। এই কাজটার জন্য আইনস্টাইন দীর্ঘ তিরিশ বছর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি।"

নোবেল কমিটির বক্তব্য, বিচারকমণ্ডলীর এবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল "নিউট্রাল কারেণ্ট" বা নিরপেক্ষপ্রবাহের ওপর। ১৯৬০ এর দশকে এই

"নিউট্রাল কারেণ্টের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণ করেন সালাম এবং ভিনবার্গ।

এখন এই "নিউট্রাল কারেণ্ট কী? ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী ?

পদার্থ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুকণা থেকে শুরু করে গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি, রূপান্তর এবং কার্যকরেণের মূলে রয়েছে চার রকম মৌলিক বল বা শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ, উইকফোর্স বা দুর্বল বল, ইলেকটেট্রাম্যাগনেটিক বা তড়িৎ-চৌম্বক বল এবং স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বল।

এদের মধ্যে দুটো বল, মাধ্যাকর্ষণ ও তড়িত চৌম্বক বলের সঙ্গেই আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ নক্ষত্র, ধূমকেতু থেকে শুরু করে সমুদ্রের বুকে জোয়ার ভাঁটা, "বৃন্তচ্যুত ফলের পতন" এর সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করে মাধ্যাকর্ষণ বল। আর বিদ্যুত ও চৌম্বক শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দরুণ এক ধরণের বলের সৃষ্টি হয়। এই বলকেই বলা হয় তড়িৎ চৌম্বক বল। যেমন কোন পরিবাহী ধাতব তারের সান্নিধ্যে যদি একটা চুম্বককে আন্দোলিত করা যায়, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে তারটার মধ্যে বিদ্যুতশক্তি ধরা পড়ছে। বেতার তরঙ্গ অথবা আলোক সৃষ্টির পেছনে এই বলটাই কাজ করে।

স্টং ফোর্স বা প্রবল বল এদের থেকে স্বতন্ত্র। এই বলের অস্তিত্ব কেবলমাত্র পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ধরা পড়ে। তড়িত-চৌম্বক বলের তুলনায় এর ক্ষমতা প্রায় এক হাজার গুণ বেশী। প্রবল বলের প্রভাবে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন কণাগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আটকে থাকে। আর উইক ফোর্স বা দুর্বল বলের ভূমিকা ভিন্ন ধরণের। এই বলটার প্রতিক্রিয়ার দরুণ মৌলকণা কিছুটা শক্তি ক্ষরণ করে স্থায়ী বা স্থিতিশীল মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়।

কোন বলের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষেত্রের কথাও এসে পড়ে। ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কোন গণ্ডী বা অঞ্চলকে, যার মধ্যে কোন বলের প্রভাব থাকে। যেমন মাধ্যাকর্ষণ বলের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এবং অনুরূপভাবে প্রবল দুর্বল এবং তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নাম করা যেতে পারে। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মৌলকণা পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই চারটে ক্ষেত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে আসছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য এমন একটা তত্ত্ব দাঁড় করানো, যে তত্ত্ব ১৯৬৩ সালে সালাম এবং ভিনবার্গ একক ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়া এবং দুর্বল প্রতিক্রিয়া একই বল সূত্রের

দুটো পৃথক দিক। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গোড়ার দিকে বিতর্ক সৃষ্টি করলেও পরে উট্রেখট গবেষণাগারের গেরহার্ড টি হুফট এবং নিউইয়র্কের স্টোনিব্রুক গবেষণাগারের বেঞ্জামিন ডব্লু. লী দেখালেন ওই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য।

এই তত্ত্বে বলা হলো : দুর্বল প্রতিক্রিয়ার সময় মৌলকণা থেকে শক্তির যে ক্ষরণ ঘটে (বিটা রশ্মি হিসেবে ; আসলে এই বিটা রশ্মি ইলেকট্রন কণা), একমাত্র চার্জ কারেন্টের মাধ্যমেই তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে আরও এক ধরণের প্রবাহ প্রকট হতে পারে, যাকে বলা যায় 'নিউট্রাল কারেন্ট'।

দুর্বল প্রতিক্রিয়া তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছিলো চার্জড কারেন্টের উদ্ভব হওয়াটাও দুর্বল প্রতিক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যটি তড়িত চৌম্বক প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে। তাঁরা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছেন, তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়া এবং দুর্বল প্রতিক্রিয়া যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অধ্যাপক সালাম একবার মন্তব্য করেন : এতদিন ছিলো চারটে বল। মাধ্যাকর্ষণ বল, প্রবল বল, দুর্বল ও তড়িৎ-চৌম্বক বল এবার থেকে দাঁড়াল তিনটে বল। মাধ্যাকর্ষণ, প্রবল বল এবং দুর্বল ও তড়িত-চৌম্বক মিলিয়ে একটা বল।

এই নতুন বলের কি নামকরণ করবেন এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব : 'জানি না, নাম একটা হবে নিশ্চয়।'

............কেনেথ সি. উইলসন..

(খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৬—)

আশাতীত খবরই বলতে হয়। স্টকহোম থেকে সুইডিশ এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের কাছ থেকে খবরটি পেয়ে বিস্মিতই হয়েছিলেন ডাঃ কেনেথ সি. উইলসন। খবরে বলা হয়, ১৯৮২ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন মাত্র একজন। নিউইয়র্কের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ কেনেথ সি. উইলসন। নোবেল কমিটির সচিব অধ্যাপক বেট নাগেল, যিনি নিজেও একজন পদার্থ বিজ্ঞানী, তাঁর বক্তব্য : "উইলসনকে আমরা কোপার্নিকাসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত

সমকালীন জ্ঞানকে যেমন নির্ভরযোগ্য যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অর্থবহ করে তুলেছিলেন কোপারনিকাস, উইলসনও ঠিক তাই করেছেন। পদার্থের বিভিন্ন দশা সম্পর্কিত বহুজ্ঞাত তথ্য এবং তত্বাবলী তাঁর গবেষণায় অনেক বেশী অর্থবহ হয়ে উঠেছে।"

উইলসন বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রের ওপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান সে দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। একথা সর্বজনবিদিত, পদার্থমাত্রই সাধারণত তিনটে অবস্থায় বিরাজ করতে পারে—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। সাধারণত নিম্ন তাপমাত্রায় জল কঠিন অবস্থায় বিরাজ করে। তাপমাত্রা বাড়ালে জল তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেই তরল জলই রূপান্তরিত হয় বাষ্পে। পদার্থের অবস্থায় এ ধরণের পরিবর্তনের মূলে মুখ্যত কাজ করে চাপ এবং তাপ, আবার এমন অবস্থাও সৃষ্টি করা যায় যেক্ষেত্রে জল একই সঙ্গে তরল ও বাষ্পীয় অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ ধরণের অবস্থা বা 'দশার' নাম দিয়েছেন 'সংকট দশা' বা 'Critical State'। এসব ব্যাপার নিয়ে তাত্বিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী—ভ্যান ডার ওয়ালস, অ্যান্ড্রুজ, ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ।

পরবর্তীকালে পদার্থ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা গেল। জানা-গেল পদার্থ অণুর সমষ্টি সৃষ্টি হল পারমাণবিক তত্ব। জানা গেল পরমাণু অখণ্ডনীয় কণা নয়। আবিষ্কৃত হল—ঋণাত্মক তড়িতধর্মী ইলেকট্রন ধনাত্মক তড়িতধর্মী প্রোটন, তড়িৎ নিরপেক্ষ নিউট্রন। পরিচয় হল নিউট্রন ও প্রোটন কণা সম্বলিত পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন কণাগুলো অবিরত পরিক্রমণ করে। এ সম্বন্ধে আরো জানা গেলো যে, নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি পরিক্রমণরত ইলেকট্রন গুলোর ওপর নিউক্লিয়াসের টান অনেক বেশী। তুলনায় নিউক্লিয়াসের দূরবর্তী অঞ্চলের ইলেকট্রন গুলোর ওপর নিউক্লিয়াসের টান অনেক কম। যে সব ইলেকট্রন পরমাণুর বাইরের তলে অবস্থান করে—তাদের বলা হয় "Surface Electron" বা তলীয় ইলেকট্রন"। উত্তাপ অথবা অন্যান্য বিকিরণের প্রভাবে এই সব ইলেকট্রন সহজেই পরমাণুর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পরিবর্তিত হয়ে পরমাণুর গুণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। পারমাণবিক কণার তড়িত ও চৌম্বক ধর্মের ওপরও নির্ভর করে পদার্থের গুণগত অবস্থা। কোন বস্তু যখন কেলাস গঠন করে তখন কিভাবে সজ্জিত হয় তার

পরমাণু ? কিভাবে সজ্জিত থাকে কেলাসের অভ্যন্তরে ইলেকট্রন কণার সমাহার ?

আবিষ্কৃত হল দুই শ্রেণীর পারমাণবিক কণা—হ্যাড্রনস এবং লেপটনস্। হ্যাড্রনসের মধ্যে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন। এই সব কণা 'প্রবল পারমাণবিক বল' বা "strong force" এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। হ্যাড্রনস আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'বেরিওন্স' এবং 'মেসন্স'। প্রোটন এবং নিউট্রন বেরিওনসের মধ্যে পড়ে। মেসন্স গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে 'পাইওন' এবং 'কেওন' কণা। লেপটনস শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ইলেকট্রনের হাল্কা কণা, যারা 'প্রবল বল'-এ প্রভাবিত হয় না হয় 'দুর্বল বল' এ। তৈরী হল নতুন তত্ত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পারমাণবিক কণা যাদের দিয়ে তৈরি, তাদের বলা হল 'কোয়ার্ক'। তাবৎ বেরিয়ন কণা তৈরি, হয় হয় তিনটে কোয়ার্কের সমন্বয়ে। তাবৎ মেসন কণা তৈরী হয় একটা কোয়ার্ক এবং একটা অ্যান্টি কোয়ার্কের সমবায়ে।

উইলসনের কৃতিত্ব, কোয়াণ্টাম মেকানিকস, স্ট্যাসটিকাল মেকানিকস, আধুনিকতম চৌম্বক তত্ব এবং কণা তত্বের সমনয়ে তিনি একাধিক তত্ব দাঁড় করিয়ে পদার্থের অবস্থা, অবস্থাগত পরিবর্তন এবং এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তরের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থন হয়েছেন। কোন অবস্থায় পরমাণুর অভ্যন্তরে কোন পারমাণবিক কণা কিভাবে আচরণ করে তাঁর তত্ব সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে।

উইলসনের বয়স এখন ৪৬। গত কয়েক বছর করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জড়িত রয়েছেন। এছাড়া তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাটমিক' ও 'সলিড স্টেট' ফিজিকস গবেষণাগারের সদস্য। ১৯৫৬ সালে তিনি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। এর পাঁচ বছর পর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ডক্টরেট করেন। ১৯৬২-৬৩ সালে জেনেভায় ইউরোপীয়ান অরগ্যানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ-এ ফেড ফাউণ্ডেশন ফেলো এবং পরে এসে যোগ দেন করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে "Critical phenomena" ছাড়াও কণা পদার্থবিজ্ঞানেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেন।

গণিত শাস্ত্র

আইনস্টাইন
আর্কিমিডিস
ইউক্লিড
গস
জীনস
ডেসকার্টেস
নিউটন
পাস্কাল
ল্যাপলাস

জীব বিদ্যা

অগাসিজ
অ্যারিস্টোটল
কুভিয়ার
ডারউইন
পাস্তুর
ভাইসম্যান
মরগ্যান
মেণ্ডেল
লামার্ক
লিউয়েনহক
লিননেইয়াস
স্প্যালানজানি,

জ্যোতিবিদ্যা

কেপলার
কোপারনিকাস
গ্যালিলিও
জীনস
টলেমী
ব্রাহে
ল্যাপলাস
হাইজেনস

পদার্থ বিজ্ঞান

আইনস্টাইন
আর্কিমিডিস
অ্যাভোগ্যাড্রো
অ্যাম্পিয়ার
অ্যারিস্টোটল
উইলসন
এডিসন
ওয়াট
ওহম
কম্পটন
কাপিতজা
কুরী
চ্যাডউইক
জগদীশ চন্দ্র
জীনস
জুল
টরিসেলি
ডি ফরেস্ট
ডেভি
থমসন
দা ভিন্সি
নিউটন
প্ল্যাঙ্ক
বোর
ভোল্টা
মাইকেলসন
মিটনার
মিলিকান
মেঘনাদ সাহা
মোসলে
ম্যাক্সওয়েল
রণ্টজেন
রমন
র‍্যাদারফোর্ড

কেলভিন
ক্যাভেণ্ডিস
গস
গাবর
গে-লুসাক
গ্যালিলিও
ফার্মি
ফ্যারাডে
বয়েল
বুনসেন
বেকন
বেকারেল
রামফোর্ড
সত্যেন্দ্র নাথ
সালাম
হুক
হেনরী
হাইজেনস

ভূ-বিদ্যা

অগাসিজ
কুভিয়ার
লাইয়েল
হামবোল্ট

ভেষজ বিজ্ঞান ও শারীর বৃত্ত

আইকম্যান
কখ
ক্যারেল
গ্যালেন
জেনার
পাভলভ
পাস্তুর
প্যারাসেলসাস
ফ্লেমিং
বারনার্ড
ব্যান্টিং
ভারচো
ভেসালিয়াস
ম্যালপিজি
লিস্টার
সেমেলওয়েস
হার্ভে
হিপোক্রেটিস

রসায়ন বিজ্ঞান

ওয়াট
উলার
কুরী
ক্যাভেণ্ডিস
গে-লুসাক
ডালটন
ডেভি
নোবেল
পাস্তুর
প্রিস্টলি
প্যারাসেলসাস
ফ্যারাডে
বার্জেলিয়াস
বুনসেন
বেকন
বেকারেল
বোর
মেণ্ডেলিভ
মোসলে
র‍্যাদারফোর্ড
ল্যাঙমুর
ল্যাভসিয়ার
শীলে